প্রশাসন সমীক্ষা

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre

৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৯৬

সম্পাদনা পর্ষদ

সভাপতি ঃ এ, জেড, এম, শামসুল আলম
রেকটর
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সদস্য ঃ ডঃ মোহাম্মদ ইকরামুল আহসান
সদস্য, পরিচালন পর্ষদ
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মুহাম্মদ আব্দুস সোবহান
সদস্য, *পরিচালন পর্ষদ*
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

ডঃ এম, আনিসুজ্জামান
সদস্য, পরিচালন পর্ষদ
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মোহাম্মদ সফিউর রহমান
সদস্য, পরিচালন পর্ষদ
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

হীরালাল বালা
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মোঃ আব্দুস সালাম
উপ-পরিচালক
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মোঃ আব্দুল মতিন
গ্রন্থাগারিক
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

মোল্লা মোশাররফ হোসেন
সহঃ প্রকাশনা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

সম্পাদক ঃ মজনু-নুল-হক
পরিচালক
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র

প্রশাসন সমীক্ষা

৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, কার্তিক, ১৩৯৬

বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

প্রশাসন সমীক্ষা, ৩য় বর্ষ ২য় সংখ্যা, কার্তিক ১৩৯৬
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র কর্তৃক সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত
© ১৩৯৭ বাং

পিএটিসি : প্রকা – ৩০/বাজা–৪/৯০
পিএটিসি গ্রন্থাগার : ০৫০·৩৫

প্রকাশনায় ঃ
মোল্লা মোশাররফ হোসেন
সহঃ প্রকাশনা কর্মকর্তা
বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র
সাভার, ঢাকা

মুদ্রণে ঃ
মেসার্স গণমুদ্রণ লিমিটেড
গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ট্রাস্টের একটি প্রকল্প
শহীদ রফিক–জব্বার মহাসড়ক
নয়ারহাট, ঢাকা–১৩৫০।

বিনিময় ঃ
বিশ টাকা মাত্র

সূচীপত্র

১। ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর আলোকে দাবী আদায় ঃ একটি সমীক্ষা — ১
এম, সি, বর্ম্মন

২। বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ঃ একটি সমীক্ষা — ১৭
মোঃ বদিউজ্জামান

৩। দুর্নীতি ও উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গ — ৪৯
মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

৪। বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা — ৬৩
মোহাম্মদ সফিউর রহমান

৫। উপজেলা প্রশাসনে কর্ম পরিবীক্ষণ পদ্ধতি — ৮১
Job Monitoring System in Upazila Administration
সিরাজুল ইসলাম

৬। বাংলাদেশের বাণিজ্য কাঠামো ও বাণিজ্য নীতি ঃ সামগ্রিক পর্যালোচনা — ১০১
এস, এম, আলী আক্কাস

৭। পুস্তক সমালোচনা — ১২৫
ডঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ ১৯৭৬-এর আলোকে দাবী আদায়ঃ একটি সমীক্ষা

—এম, সি, বর্ম্মন

ভূমিকা

ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ, ১৯৭৬ এর উপর আলোকপাত করার পূর্বে মানুষ, ভূমি ও উৎপাদন সম্পর্কে কিছুটা ধারণা লাভ করা প্রয়োজন। মানুষ ও ভূমির সম্পর্ক অত্যন্ত মধুর ও নিবিড়। জন্ম হতে আমৃত্যু মানুষ ভূমির সহিত ওৎপ্রোতভাবে জড়িত বিধায় মানুষকে ভূমি ভিত্তিক জীব বলে অনেকে উল্লেখ করে থাকেন। প্রখ্যাত মনীষী টমাস্ কার্লাইল বলেছেন, ভূমি আমাদের সকলের মাতা। দেশমাতৃকার সেবায় নিয়োজিত বাঙালী কৃষকদের জীবন চিত্র কবি অংকন করার চেষ্টা করেছেন এইভাবেঃ

"ওই যে দাঁড়ায়ে নতশির যুব সবে–
ম্লান মুখে লেখা শুধু শত শতাব্দীর বেদনার করুণ কাহিনী .... বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা — সম্মুখেতে কঠোর সংসার বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্রকার অন্ধকার।"

রাজার রাজ্যের উৎপত্তি স্থলও ভূমি ভিত্তিক। তাই ভূমির উপর হতে আহরিত সম্পদে তার ধনভাণ্ডার পরিপূর্ণ হতো। বর্তমানে ভূমিতে উৎপাদন সর্বপ্রধান উপাদান হিসেবে পরিগণিত। ভূমি হতে নগদ অর্থ দ্বারা কেবল যে প্রশাসনের খরচ মিটানো হয় তা নয় বরং এ থেকে বিনিয়োগ করা হয় প্রবৃদ্ধির ও জাতীয় আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। সেজন্য ভূমি ব্যবস্থাপনার উপর একটি দেশের বর্তমান, ভবিষ্যৎ অর্থনৈতিক ও অন্যান্য ব্যবস্থা বহুলাংশে নির্ভর করে। বাংলাদেশের ক্ষেত্রেও এই উক্তি সমানভাবে প্রযোজ্য।

ভূমি রাজস্ব

ভূমির রাজস্ব প্রথা ভারতবর্ষে মোগল আমলে এবং তার পূর্বেও প্রচলিত ছিল। ঐতিহাসিকভাবে শেরশাহ-এর আমলে উৎপাদিত ফসলের $\frac{১}{৩}$ অংশ রাজস্ব হিসেবে প্রদানের নিয়ম ছিল। সম্রাট আকবরের আমলে উত্তম, মধ্যম ও নিকৃষ্ট ফসল হিসেবে প্রতি বিঘায় উৎপাদিত ফসলের $\frac{১}{৩}$ সরকারের রাজস্ব হিসেবে আদায় করা হতো। বৃটিশ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী ১৭৯৩ সালে লর্ড কর্নওয়ালিসের আমলে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের মাধ্যমে ভূমি রাজস্বের অব্যবস্থা দূর করে নির্দিষ্ট অর্থে খাজনা প্রদানের ব্যবস্থা প্রচলন করেন। এই ব্যবস্থার পূর্বে ওয়ারেন হেষ্টিংস ১৭৭২ সালে কালেক্টর নামে ইংরেজ কর্মচারীদের হস্তে রাজস্ব আদায়ের ভার ন্যস্ত করেন। পরবর্তীকালে ১৯৫০ সনে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত উচ্ছেদ করে সরকার সমস্ত জমির সকল প্রকার খাজনা আদায় শুরু করেন। ফলে প্রকৃত চাষীরাই সরকারের অধীনে প্রত্যক্ষ প্রজাতে পরিণত হয়। সকল রায়তকে (মালিক

নামে অভিহিত) হস্তান্তর ও উত্তরাধিকারযোগ্য স্থায়ী অধিকার দিয়ে নিজের ইচ্ছামত জমি ব্যবহারের সুযোগ প্রদান করা হয়। জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইনে ১৯৫০ এর ২১ নং ধারায় নিম্নরূপে বর্ণিত আছে যে, "All lands, of which a rent receiver, a cultivator raiyat, a cultivating under-raiyat or a non agricultural tenant retains possession shall be held on payment of such fair and equitable rent as may be determined under the provisions of this Act." এর ফলে জমির মালিকানা অক্ষুন্ন রাখার জন্য মালিককে তার নৈতিক দায়িত্ব হিসেবে নির্দিষ্ট পরিমাণে সরকারের নিকট রাজস্ব প্রদান করা আবশ্যক শর্তে পরিণত হয়। এই আইনের বিধান অনুযায়ী কৃষি জমির ক্ষেত্রে উৎপন্ন ফসলের মূল্যের এক দশমাংশ রাজস্ব হিসেবে কার্যকর করার ক্ষমতা সরকারকে প্রদান করা হয়। পরবর্তীকালে অবশ্য ভূমি রাজস্বের অতিরিক্ত আরও কিছু কর ভূমি মালিকের উপর ধার্য করা হয়। সেগুলো হচ্ছেঃ – (১) ফাইনান্স অর্ডিন্যান্স (৩য়) ১৯৫৮ অনুযায়ী ধার্য উন্নয়ন এবং ত্রাণ কর, (২) বুনিয়াদী গণতন্ত্র আদেশ ১৯৫৯ অনুযায়ী ধার্য স্থানীয় সংস্থা কর এবং ৩য় ফাইন্যান্স এ্যাক্ট ১৯৬৭ অনুযায়ী আরোপিত অতিরিক্ত উন্নয়ন ও ত্রাণ কর। উল্লেখ্য, ১৯৫০ সালে জমিদারী উচ্ছেদের সময় খাজনার সংগে বিভিন্ন সরকারী আবওয়ার সেস ইত্যাদি যুক্ত করা হয়। ১৯৫০–৫৯ সালে খাজনার উপর ২৫% হারে উন্নয়ন ও সাহায্য কর নামক এক কর বিদ্যমান ছিল। এভাবে দেখা যায় যে প্রাক্–স্বাধীনতা আমলে (১৯৭১ এর পূর্বে) প্রতি একর কৃষি জমির উপর ৩.৭৫ ভূমি রাজস্ব এবং ২.০২ পয়সা অন্যান্য কর, একুনে ৬.৭২ পয়সা ধার্য ছিল। দেশ স্বাধীনের পর ১৯৭২ সালে সরকার পি, ও ৯৬/৭২ সালে এক অধ্যাদেশের বলে ২৫ বিঘা পর্যন্ত সম্পত্তির খাজনা মওকুফ করেন যা ষ্টেট এ্যাকুইজিশন এ্যাক্ট ১৫১ সি ধারায় বিস্তারিতভাবে লিপিবদ্ধ রয়েছে। কিন্তু জমির মালিকগণকে অন্যান্য কর প্রদান করতে হতো। ১৯৭৪ সনের ফাইন্যান্স এক্ট এর আওতায় ভূমি মালিকগণের উপর প্রাথমিক শিক্ষা সেস ধার্য করা হয়।

ভূমি উন্নয়ন কর

১৯৭৬ সালে ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ অনুযায়ী খাজনা, শিক্ষা কর, স্থানীয় কর, উন্নয়ন ও সাহায্য কর রহিত করে ভূমি উন্নয়ন করের প্রবর্তন করা হয়। পরবর্তীকালে ১৯৮২ সালের ১৫ নং অধ্যাদেশ আংশিক সংশোধন করা হয়। সংশোধিতভাবে এর ৩নং ধারা নিম্নরূপঃ –

Description of Land	Rates of Tax
(a) Agricultural land - If the total land held by a family or body for the whole year or for more than six months is -	
(i) not more than 2.00 acre	Three paisa per decimal subject to a minimum of one taka.

(ii)	more than 2.00 acres but does not exceed 5.00 acres.	Six taka for 2.00 acres plus fifteen paisa per decimal for the land in excess of 2.00 acres.
(iii)	more than 5.00 acres but does not exceed 10.00 acress	Fifty-one taka for 5.00 acres plus thirty six paisa per decimal for the land in excess of 10.00 acres.
(iv)	more than 10.00 acress but does not exceed 15.00 acres.	Two hundred thirty-one taka for 10.00 acres plus sixty paisa per decimal for land in excess of ten acres.
v)	more than 15.00 acres but does not exceed 25.00 acres.	Five hundred thirty one taka for 15.00 acres plus ninty-five paisa per decimal for the land in excess of 15.00 acres.
(vi)	more than 25.00 acres	Fourteen hundred eighty-one taka for 25.00 acres plus one taka and forty five paisa per decimal for the land in excess of 25.00 acres
(b)	Non agricultural land :	
(i)	if any area within the police -station mentioned in the schedule to this ordinance.	Sixty taka per decimal, if the land is used for commercial or indus- trial purposes. Twelve taka per decimal, if the land is used for residential or other purposes. or Such amount as is equal to the rent of or land revenue and land taxes payable in respect of such land immediately before the commencement of this ordinance, whichever is higher.
(ii)	if any area within the municipalities at the district head quarter.	Ten taka per decimal, if the land is used for commercial or industrial purposes. Four taka per decimal, if the

	land is used for residential or other purposes.
(iii) in any other area	Eight taka per decimal, if the land is used for residential purposes ;
	Three taka per decimal, if the land is used for residential purposes or other purposes ;
	Such amount or as is equal to the total amount of the land or land revenue and land taxes payable in respect of such land immediately before the commencement of this ordinance, whichever is higher.

SCHEDULE

District	Police Station
Dhaka	Mirpur, Mohammadpur, Lalbag, Kotwali, Sutrapur, Ramna, Dhanmondi, Tejgoan, Cantonment, Demra, Motijheel Gulshan, Tongi, Keranigonj, Joydebpur, Narayangonj, Bandar, Fatulla, Shiddirganj.
Chittagong	Kotwali, Pachlaish, Doublemooring, Port, Police Station (Sitakunda, Hathazari and Rangunia).
Khulna	Kotwali, Daulatpur and Fultalla.

এই অধ্যাদেশের অধীনে প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী ভূমি রাজস্বের দাবী নির্ধারণের জন্য রাজস্ব অফিসারকে ক্ষমতা ও দায়িত্ব প্রদান করা হয়। এই দাবীর তালিকা সর্ব সাধারণেও প্রকাশ করার ব্যবস্থা রাখা হয়। এতে কোন আপত্তি থাকলে তা যথাযথভাবে নিষ্পত্তির পর দাবীর তালিকা প্রকাশের বিধান করা হয়। এই দাবীর প্রতিলিপি সরকারের নিকট দাখিল করার নির্দেশ দেয়া হয়। এর ফলে ক্রম-উচ্চ স্তরবিশিষ্ট ভূমি কর প্রবর্তনের সূত্রপাত ঘটে।

১৯৭৬ সনের ৪২ নং অধ্যাদেশে যা ১৯৮২ সনের ১৫ নং অধ্যাদেশ বলে সংশোধন করা হয়েছিল তা ১৯৮৭ সনের বিলের বিধানমতে পুনরায় সংশোধন করা হয়। ফলে কৃষি জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার পূর্বের ৬ ধাপের স্থলে নিম্নলিখিত ৪ ধাপ অনুযায়ী নির্ধারণ ও আদায়যোগ্য করা হয় :

ধাপের ক্রমিক	জমির পরিমাণ	করের হার
১ম	.০১ একর থেকে ২.০০ একর পর্যন্ত	প্রতি শতাংশে .০৩ (তিন) পয়সা হারে সর্বনিম্ন ১.০০ টাকা।
২য়	২.০১ ,, ,, ৫.০০ ,, ,,	প্রতি শতাংশ .০৩ পয়সা হারে
৩য়	৫.০১ ,, ,, ১০.০০ ,, ,,	,, ,, .৫০ ,, ,,
৪র্থ	১০.০০ একরের উর্দ্ধে	,, ,, ২.০০ ,, ,,

উপরোক্ত নিয়মে কর নির্ধারণে দুই একর পর্যন্ত মালিকগণের ক্ষেত্রে করের হার অপরিবর্তিত রয়েছে। সাবেক ৬ ধাপের অন্তর্ভূক্ত ১ম, ২য়, ৩য় ধাপের জমির পরিমাণ যথাক্রমে (ক) .০১ একর হইতে ২.০০ একর (খ) ২.০১ হইতে ৫.০০ একর এবং (গ) ৫.০১ একর হইতে ১০.০০ একর অপরিবর্তিত থাকায় বর্তমান ৪ ধাপ বিশিষ্ট কর পদ্ধতির ১ম, ২য় ও ৩য় ধাপের অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছে। সাবেক ৪র্থ ও ৫ম এবং ৬ষ্ঠ ধাপে সমন্বিত করে বর্তমানে একটি মাত্র অর্থাৎ ৪র্থ ধাপের আওতায় আনা হয়েছে এবং প্রতি শতাংশের জন্য টাঃ ২.০০ হারে কর পুন:নির্ধারণ করা হয়েছে।

১৯৮৫ সালে ভূমি প্রশাসন ও ভূমি সংস্থার মন্ত্রণালয় অকৃষি জমি ও চা বাগানের জমির করের হার নিম্নরূপে প্রবর্তন করেন ঃ –

থানা/উপজেলা/পৌরসভা এলাকার নাম	ব্যবহার অনুসারে এলাকাভূক্ত প্রতিশতক অকৃষি জমির পুন:নির্ধারিত করের হার (টাকা)	
	শিল্প/বাণিজ্য কাজে ব্যবহৃত জমির করের হার (টাকা)	আবাসিক অথবা অন্য কাজে ব্যবহৃত জমির করের হার (টাকা)
১। (ক) ঢাকার কোতওয়ালী, মীরপুর, মোহাম্মদপুর, সুত্রাপুর, রমনা, ধানমণ্ডি, তেঁজগাঁও, ক্যান্টনমেন্ট, ডেমরা, মতিঝিল, গুলশান, টংগী, কেরানীগঞ্জ, জয়দেবপুর, নারায়নগঞ্জ, বন্দর, ফতুল্লা, সিদ্দিরগঞ্জ ও লালবাগ থানা/উপজেলা এলাকা।	১০০.০০	২০.০০
(খ) চট্টগ্রামের কোতওয়ালী, পাঁচলাইশ, ডবলমুড়িং, সীতাকুণ্ড, বন্দর, হাটহাজারী, রাংগুনিয়া থানা/ উপজেলা এলাকা।		
(গ) খুলনার কোতওয়ালী, দৌলতপুর ও ফুলতলা থানা/উপজেলা এলাকা।		
২। পুরাতন জেলা সদরের পৌরসভা এলাকা।	২০.০০	৬.০০
৩। উপরে উল্লেখিত থানা/উপজেলা/ পৌরসভার বহির্ভূত অন্য যে কোন এলাকা।	১৫.০০	৫.০০

চা–বাগানের অধীন জমির ভূমি উন্নয়ন করের হার শতাংশ প্রতি ১.১০ টাকা ধার্য করা হয়েছে। উল্লেখ্য, চিংড়ি চাষের উপযোগী খাসজমি বন্দোবস্তের জন্য একর প্রতি ১৫০০.০০টাকা সেলামী ধার্য করা হয়েছে।

হাল সন নাগাদ সংশোধিত ভূমি উন্নয়ন করের হার পরিশিষ্ট–'ক'তে প্রদান করা হলো।

সঠিক দাবী নির্ধারণ

সঠিক কর নিরূপণ (দাবী নির্ধারণের জন্য প্রত্যেক জমির মালিক/পরিবার সংস্থার প্রধানের নিকট হতে জমির বিবরণী দাখিল করার বিধান আইনে রয়েছে। স্বামী, স্ত্রী, পুত্র, অবিবাহিতা কন্যা, পুত্রের স্ত্রী, পুত্রের পুত্র, পুত্রের অবিবাহিত কন্যা একই পরিবারভূক্ত বলে গণ্য করা হয়। তাদের ভিন্ন ভিন্ন নামে জমি থাকলে তা একই পরিবারের জমি বলে গণ্য হয়।

জমির বিবরণী দাখিল সংক্রান্ত আদেশ সরকারী নির্দেশে স্থগিত রাখা হয়েছে। সেজন্য অনুশাসন প্রদান করা হয়েছে যে, তহশিলদারগণ প্রত্যেক মালিক/পরিবার/সংস্থার জন্য প্রথমে মৌজাওয়ারী ও পরে তহশীলওয়ারী একটি সাময়িক কর নির্ধারণ তালিকা প্রণয়ন করবেন। এই তালিকা প্রণয়নের জন্য তহশীলে রক্ষিত ১ ও ২ নং রেজিষ্টার,পি, ও, ৯৬/৭২ এবং পি, ৯৮/৭২ মোতাবেক ইতিপূর্বে দাখিলকৃত জমির বিবরণ ও অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কাগজপত্র পর্যালোচনা করবে। এইভাবে মৌজাওয়ারী মালিক পরিবার/সংস্থার জমির বিবরণ প্রণীত হওয়ার পর একটি তহশীলওয়ারী তালিকা পৃথকভাবে তৈরী করতে হবে। উপজেলা রাজস্ব অফিসার এটি পরীক্ষা–নিরীক্ষা করে প্রত্যেক মালিক পরিবার/সংস্থার মোট জমির পরিমান অনুসারে প্রযোজ্য করে ধাপ নির্ধারণ পূর্বক প্রাথমিক দাবীর বিবরণী তৈরী করবেন। বিধি মোতাবেক কোন আপত্তি বা আপীল থাকলে তা যথারীতি নিষ্পত্তির পর চূড়ান্ত হওয়া সাপেক্ষে তার ভিত্তিতে কর আদায় করা হবে। চূড়ান্ত দাবীর বিবরণী প্রকাশের পর পূর্বে আদায়কৃত কর সমন্বয় করে চূড়ান্ত দাখিলা দিতে হবে।

আইন ও বিধিমালায় বিশদ অনুশাসন বর্তমান থাকা সত্ত্বেও এই দেশের অধিকাংশ ভূমি মালিকই জানেন না কোন একটি নির্দিষ্ট বৎসরে মালিকানাধীন দখলীয় জমির মোট করের পরিমান কত হবে। ভূমি উন্নয়ন কর যখন চূড়ান্ত করা হচ্ছে, তখন প্রাথমিকভাবে নির্ধারিত করের বিরুদ্ধে আপত্তি/আপীল দাখিল করতে হবে এই সম্পর্কে ভূমি মালিকগণকে কখনো অবহিত করা হয় না। ভূমি মালিকগণ স্ব–উদ্যোগে সংশ্লিষ্ট তহশীলে কর প্রদান করতে পূর্বের প্রচলিত রেজিষ্টার, রিটার্ন, দাখিলা ইত্যাদি ব্যবহারের ফলে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অশিক্ষিত, অর্ধশিক্ষিত, এমনকি শিক্ষিত ভূমি মালিকগণ বিভ্রান্তির আবর্তে নিমজ্জিত হয়ে প্রকৃত করের হার অবহিত হতে পারবেন না। রাজস্ব প্রশাসনের সংগে জড়িত কর্মচারীদের প্রশিক্ষণের অভাবে, কর্মে উদাসীনতা এবং সরকারের নির্দেশিত বিধানাবলী যথাযথ প্রয়োগ না করায় ভূমি উন্নয়ন কর আইন জনগণের নিকট সঠিকভাবে পূরণযোগ্য হয়ে উঠেনি। ফলে বর্তমান কর পদ্ধতিকে অযথা সন্দেহজনকভাবে জটিল, রহস্যময় ও দুঃসাধ্য কার্যক্রম বলে পরিগণিত করা হচ্ছে।

ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ জারীর পর বৎসরের শুরুতে কখনো সঠিকভাবে দাবী নিরূপণ করা বা আদায়ের পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়নি। প্রতি বৎসর জেলা / উপজেলা হতে কর আদায়ের শতকরা হার ১০০ ভাগ বা তার উপরে দেখানো হলেও নতুন বৎসরের দাবীতে নিয়মিত ভাবে বিপুল পরিমান কর বকেয়া দেখানো হচ্ছে। ২ নং রেজিষ্টার অনুসারে ঢাকা জেলার কোতওয়ালী সহকারী কমিশনার (ভূমি) কোতয়ালী সার্কেলের ভূমি উন্নয়ন করের দাবী ও আদায় নিম্নরূপে ব্যক্ত করেন ঃ—

অর্থ বছর	দাবী	আদায়
১৯৮৮–৮৯	৯,৬১,৮৫,৬১২	২,৪৪,৪৬,৬৮৪
১৯৮৯–৯০	৯,১৩,৫১,৩৭৮	৬৬,০৭,৩২০ (১৫–০২–৯০)

এই প্রসংগে স্মর্তব্য যে ১৯৮৮–৮৯ অর্থ বৎসরের সরকারী/আধা–সরকারী প্রতিষ্ঠানের নিকট হতে ১২,২৯,৯৩৫·০০ ভূমি উন্নয়ন কর হিসেবে আদায় করা হয়েছে। যদিও ঐ বৎসর ঐ সমস্ত প্রতিষ্ঠানের নিকট ভূমি উন্নয়ন কর হিসেবে আদায়যোগ্য টাকার পরিমাণ ছিল ৪,২৭,৩৫,৩৩০·০০ টাকা। এখানে বলার অবকাশ রাখে না যে, বাংলাদেশ রেলওয়ের নিকট চলতি অর্থ বৎসরসহ ভূমি উন্নয়ন কর হিসেবে ১,৮৩,৭৪,৩০৫·০০ টাকা পাওনা রয়েছে। এতদ্ব্যতীত হাল সন পর্যন্ত ঢাকা মিউনিসিপ্যাল কর্পোরেশনের নিকট ৮৯,০৭,৬২৭·০০ টাকা, স্যার সলিমুল্লাহ্ মেডিকেল কলেজের নিকট ৩,৭৩,৭২৭·০০ টাকা, মহা–পরিচালক, ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব এডুকেশন এ্যাণ্ড রিসার্চ (নিয়েয়ার) এর নিকট ১,২২,২২০·০০ টাকা, মহা–পরিচালক, বাংলাদেশ রাইফেলস, পিলখানা ঢাকা এর নিকট ৪১,৬০,২৮২·০০ টাকা ভূমি উন্নয়ন কর হিসেবে আদায়যোগ্য রয়েছে। গণপূর্ত বিভাগের নিকট ১,৯০,২৩,২৪১·০০ টাকা ভূমি উন্নয়ন কর হিসেবে বকেয়া রয়েছে। এ ছাড়াও বাংলাদেশ বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণাগার এর নিকট পাওনা রয়েছে ৯,২২,২২০·০০ টাকা, ইডেন মহিলা কলেজের নিকট ৭৬২,২২৪·০০ টাকা, ঢাকা কলেজের নিকট ২,৬০,৭০৮·০০ টাকা, আজিমপুর কলোনীর নিকট ৮,৯৩,৭৩২·০০ টাকা, ওয়ার্কাস হাউজিং এ্যাণ্ড সেটেলমেন্ট ডিপার্টমেন্ট এর নিকট ৩,৬৬,৭৬৫·০০ টাকা, উইমেন্স স্পোর্টস ক্লাব, ঢাকা এর নিকট ১,১২,৫৫৯·০০ টাকা। এসমস্ত সংস্থার নিকট পাওনা কর উসুলের পদক্ষেপ নিলেও তারা "বাজেট বরাদ্দ নেই" অজুহাত দিয়ে থাকেন।

ভূমি উন্নয়ন কর আদায়

১৯৫০ সালের জমিদারী দখল ও প্রজাস্বত্ব আইন জারীর পূর্বে চাষীদের কাছে জমিদারদের বার্ষিক রাজস্ব চাহিদা ছিল ৪ কোটি ৪৩ লক্ষ টাকা। অন্যপক্ষে জমিদারদের নিকট সরকারের পাওনার পরিমাণ ছিল ৯২ লক্ষ ৪০ হাজার টাকা।

এক হিসেবে দেখা যায়, চাষীদের নিকট হতে সরাসরি খাজনা উসুল করতে সরকারের বার্ষিক খরচ ছিল ১ কোটি ২৪ লক্ষ টাকা, অর্থাৎ এই আইন প্রবর্তনের ফলে সরকারের কোষাগারে অধিকতর পরিমাণে অর্থ জমার সম্ভাবনা বর্তমান ছিল। ১৯৮৫ সালের পর সরকার কর্তৃক

আদায়কৃত ভূমি রাজস্ব দ্রুত বৃদ্ধি পায় এবং ১৯৭০ সালে এর পরিমাণ দাঁড়ায় ১৮ কোটি ৫০ লক্ষ টাকায়। স্বাধীনতার পর ভূমি রাজস্ব খাতে আদায়ের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ—

সাল	আদায়ের পরিমাণ
১৯৭২–৭৩	২ কোটি ৭০ লক্ষ
১৯৭৩–৭৪	৫ কোটি ৫০ লক্ষ
১৯৭৪–৭৫	৮ কোটি ৭০ লক্ষ
১৯৭৫–৭৬	১৬ কোটি ৬০ লক্ষ
১৯৭৬–৭৭	১৬ কোটি ৮০ লক্ষ
১৯৭৭–৭৮	১৯ কোটি ৩০ লক্ষ
১৯৭৮–৭৯	১৯ কোটি ১০ লক্ষ
১৯৭৯–৮০	২০ কোটি ৯০ লক্ষ
১৯৮০–৮১	২৮ কোটি ৯০ লক্ষ
১৯৮১–৮২	৩১ কোটি ২০ লক্ষ

(সূত্র ঃ বি, আই, ডি, এস, রিসার্চ রিপোর্ট নং-৪২)

১৯৮২ সনে ভূমি প্রশাসন বোর্ড স্থাপনের পর ভূমি প্রশাসনের মাঠ পর্যায়ের কাজে তদারকী এবং ভূমি রাজস্ব আদায়ের ভার এই বোর্ডের উপর ন্যস্ত হয়। এই সময়ে ভূমি উন্নয়ন করের দাবী ও আদায়ের পরিমাণ নিম্নরূপ ঃ-

সন	দাবী	আদায়
১৯৮২–৮৩	২৪,৮৪,৬৮,৪৯৬	২২,১৩,৫০,০০৩
১৯৮৩–৮৪	৩৬,৮৩,৪২,৫০০	৩০.৮৬,১১,২০৫
১৯৮৪–৮৫	৪৯,৯৯,৪২,৮৬২	৪২,৭২,১৬,৩৪০
১৯৮৫–৮৬	৫৪,৯০,৬৫,৮৬৬	৫৪,৭২,৩২,৬৮৬
১৯৮৬–৮৭	৭৭,১৪,৩৫,১১৫	৬৬,৪৮,৮১,০৪৩
১৯৮৭–৮৮	৯৮,০৬.০৯,৫১৩	৮১,৮৬,৪৩,২৭১
১৯৮৮–৮৯	১৫৮,৩৩,৩১,৫৩৫ (৬১ টি জেলা)	৯২,৭৭,০৭,০২৪
১৯৮৯–৯০	২১৩,৫৩,৪৭,২৩৫ (৬১ টি জেলা)	৮,১২,৩৭,৩৫৫ (৩১–০১–৯০ পর্যন্ত)

(সূত্র : সংশ্লিষ্ট নথি পত্রাদি হইতে সংগৃহীত)

ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা

ভূমির উন্নয়ন কর আদায়ের দায়িত্ব মূলতঃ জেলা প্রশাসক তথা কালেক্টরের। অতিরিক্ত জেলা প্রশাসন (রাজস্ব) তাঁকে এই কাজে সহযোগিতা করে থাকেন। তিনি কালেক্টরের কাজ সমাধা করার জন্য ক্ষমতাবান। উপজেলা পর্যায়ে ছিলেন উপজেলা রাজস্ব অফিসার, বর্তমানে তাঁদের স্থলে ৩০৩ জন সহকারী কমিশনার (ভূমি) কে নিযুক্ত করা হয়েছে। তাঁর নীচে রয়েছেন তহশীলদারগণ। বাস্তবে এই তহশীলদারগণই ভূমি উন্নয়ন করের দাবীর পরিমাণ নির্ধারণ ও তা আদায়ের মাঠ পর্যায়ের কর্মী। জমিদারী দখলের সময়ে জমিদারগণের নিযুক্ত তহশীলদারগণ সরকারী পদে নিয়োজিত হন। জনসেবক হিসেবে তহশীলদারগণের কোন ভাবমূর্তি ছিল না। প্রজা সাধারণকে শোষণের হাতিয়ার স্বরূপ জমিদারগণ তহশীলদারদিগকে ব্যবহার করতেন। সরকারী চাকরিতে বহাল হওয়ার পর তাঁদের সেই মনোভাবের তেমন কোন পরিবর্তন হয় নি।

ভূমি খাজনা আদায়কারীরা কৃষকের উপর কি ধরনের নির্যাতন চালাতো বদরুদ্দিন উমর তাঁর কয়েকটি উদাহরণ উল্লেখ করেছেন : এইগুলো ১৯৭০ সনের ঘটনা ঃ –

(ক) গাইবান্ধা মহকুমার বাদিয়াখালীর কালীর বাজার গ্রাম থেকে এলাকার সার্কেল অফিসার খাজনার দায়ে অতর্কিতে জনৈক গরীব চাষীর গরু নিয়ে যায়। এই খবর দাবাগ্নির মতো ছড়িয়ে পড়লে জনমনে দারুণ ক্ষোভের সঞ্চার হয় এবং ৬/৭ শত লোক তহশীল অফিসের সামনে প্রচণ্ড বিক্ষোভ প্রদর্শন করে।

(খ) ফরিদপুর জেলার ভেদরগঞ্জ থানার অন্তর্গত ছয়গাঁও এবং কনেশ্বর ইউনিয়নের তহশীল অফিস বিশেষ করে গরীব কৃষকদের উপর অত্যাচারের অত্যতম কেন্দ্র ... তহশীলদার, মহাজন ও গ্রামের টাউটরা গরীব কৃষকের উপর জুলুম করছে। জোতদার টাউটের দল খাজনার দায়ে জমি খণ্ড দখলের জন্য তহশীলদারদের সাথে মিলে ষড়যন্ত্র করছে। উপরি ছাড়া তহশীল অফিসে খাজনা নেয়া হচ্ছে না। দাগ নম্বর, খতিয়ান নম্বরের জটিলতা বা মারপ্যাচ দেখিয়ে সরল কৃষকদের খাজনার নামে হয়রানি করা হচ্ছে। শুধু তাই নয়, ক্রোকী পরওয়ানা জারী করে তাদের শেষ সম্বল থালা, ঘটিবাটি এমনকি চাষের বলদ লাংগল নিয়ে যাচ্ছে। কেহ কেহ বহু কষ্টে টাকা যোগাড় করলেও উপরি না দিলে মালপত্র ফেরৎ দেয়া হচ্ছে না।

(গ) কুষ্টিয়া জেলার চিতুলিয়া ইউনিয়ন কাউন্সিলের চেয়ারম্যান এবং লক্ষ্মীধর গ্রামের মেম্বারের নির্দেশে দফাদার ও চৌকিদার উক্ত গ্রামে প্রবেশ করে দুর্ভিক্ষ কবলিত জনগণের মধ্যে সদলবলে এক দুর্ধর্ষ ক্রোকী জেহাদ চালায়। কৃষকের ঘরে হামলা দিয়ে তারা যা পায় তাই ছিনিয়ে নিয়ে চলে যায়। রাজু নামক জনৈক ব্যক্তির তরকারী রান্নার কড়াই, কাহার আলীর খড়, গেদা মণ্ডলের কোদাল, কুদ্দুস আলীর বালতি, বাদশা মিয়ার বাটি, তরন ফকিরের চামচ ও গ্লাস ক্রোক করা হয়।

(ঘ) নোয়াখালী জেলার সেনবাগ থানায় তহশীলদারদের অত্যাচারে সেখানকার গরীব ও ভূমিহীন কৃষকদের অবস্থা দুর্বিসহ হয়ে উঠেছে। খাজনা আদায়ের নামে গরীব কৃষকের গরু, ছাগল, থালা, ঘটি-বাটি পর্যন্ত ঐ দুর্নীতিবাজ তহশীলদাররা ছিনিয়ে নিচ্ছে। অনেক সময় ঐ শয়তান তহশীলদাররা কৃষকদের নানা রকম ভয় দেখিয়ে ঘুষও আদায় করে থাকে।

জনৈক লেখকের মতে জামিদারী উচ্ছেদের পর্যায়ে কৃষকদের অবস্থার বরং কিছুটা অবনতি ঘটে। ১৯৫০ এর দিকে প্রজাদের উপর জমিদারের নিয়ন্ত্রণ অনেক খানি শিথিল হয়ে পড়ে। শ্রেণী হিসেবে জমিদারদের সহিষ্ণুতা এবং জমিদারী প্রথার বিরুদ্ধে কৃষকদের আন্দোলনই এই পরিবর্তনের মূল কারণ ছিল। রাষ্ট্র জমিদারের স্থান দখল করায় সরকারী কর্মচারীগণ খাজনা আদায়ের ভার গ্রহণ করে। এই পরিপ্রেক্ষিতে বদরুদ্দিন উমর আরও বলেন যে, যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঘুষ, বডি ওয়ারেন্ট, সম্পত্তি ক্রোক ইত্যাদির মাধ্যমে তারা বকেয়া খাজনার দায়গ্রস্থ কৃষকের উপর যে নির্যাতন শুরু করে, তার সাথে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে সৃষ্ট শোষণের কোন মৌলিক পার্থক্য নেই। উপরন্তু জমিদারী প্রথা উচ্ছেদের ঠিক পূর্ববর্তী পর্যায়ে জমিদারী নির্যাতনের শৈথিল্যের তুলনায় এই নির্যাতনের মাত্রা এবং ব্যাপকতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়।

বৈধ আদায়ের ক্ষেত্রেও তহশীলদারগণ নানা প্রকার হয়রানীমূলক আচরণ করে থাকে। প্রজাগণ সাধারণতঃ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতে আগ্রহী। ভূমি মালিকানা প্রতিষ্ঠিত করতে এবং তা অব্যাহত রাখাতে কর পরিশোধের দাখিলা একটি অন্যতম দলিল। কিন্তু কর পরিশোধ করতে গেলে তহশীলদার বিভিন্ন প্রকার বাহানা তুলে থাকে। তহশীল সাধারণতঃ কোন গঞ্জে বা বাজারে অবস্থিত। তহশীলদার প্রায়ই তহশীলে অনুপস্থিত থাকে। হাট/বাজারের দিন এসে কিছু কর আদায় করে। এই আদায়কৃত অর্থ যথা সময়ে সরকারী কোষাগারে জমা প্রদান না করে নিজের তহবিলে রাখে এবং তা দ্বারা রাখি মালের ব্যবসা করে। নিম্ন পদস্থ কর্মচারী হওয়া সত্বেও তাদের দৌরাত্ম্য কতটুকু প্রাক্তন ভূমি সচিব (জনাব এম, মোকাম্মেল হক) বিগত ২২-০৮-৮৯ইং তারিখে বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রের ক্লাশরুমে তা বর্ণনা করেছেন। তিনি অকপটে স্বীকার করেছেন যে তিনি ব্যক্তিগত ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য প্রকৃত করের দ্বিগুন পরিমাণ অর্থ প্রদান করেন এবং এ ব্যাপারে কোন প্রশ্ন তোলা হতে নিজেকে বিরত রাখেন।

ক্ষুদ্র এবং প্রান্তিক ভূমি মালিকগণ ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধের জন্য বিশেষ আগ্রহী, একথা পূর্বেই বলা হয়েছে। করের পরিমাণ সম্বন্ধে তাঁদের ক্ষেত্রে বিশেষ কারচুপি লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু বড় বড় জোতদারগণ তহশীল কর্মচারীদের যোগসাজসে অন্যের নামে জমি হস্তান্তরিত দেখিয়ে সর্বোচ্চ সিলিং এর অতিরিক্ত জমি নিজ দখলে রাখে এবং অনেক ক্ষেত্রে নিম্নধাপের কর পরিশোধ করে। এমনকি একই উপজেলা/ তহশীলের অন্তর্গত ভূমির জন্য একাধিক পর্চা তৈরী করে নিম্নতর ধাপের কর পরিশোধের ব্যবস্থা করে।

এই ব্যাপারে সরকার কর্তৃক প্রয়োজনীয় প্রতিকারমূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করা হচ্ছে বলে প্রকাশ। তহশীলের পরিবর্তে প্রতি ইউনিয়নে ভূমি অফিস স্থাপনের পরিকল্পনা রয়েছে। শিক্ষিত উপযুক্ত ব্যক্তিকে এই অফিসের কর্মকর্তার পদে নিয়োগ করা হবে এবং তাঁদের যথোপযুক্ত প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হবে। ফলে পরিস্থিতির উন্নতি হবে বলে আশা করা যায়।

সরকারী/আধা-সরকারী সংস্থার নিকট পাওনা কর

কালেক্টরের খাস খতিয়ানভূক্ত জমি ব্যতিরেকে সকল জমির উপর ভূমি উন্নয়ন কর ধার্য রয়েছে। বিভিন্ন সরকারী ও বেসরকারী সংস্থা এবং স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠানের নিকট ভূমি উন্নয়ন করের দাবীর পরিমাণ মোট দাবীর শতকরা ৩০ ভাগের মত। কিন্তু এই সকল সংস্থা কর পরিশোধ করছে না বিধায় উল্লেখযোগ্য পরিমাণ দাবী অনাদায় থেকে যাচ্ছে। প্রত্যেক সংস্থা তাঁদের দখলীয় ভূমির খাতে নির্দিষ্ট সময়ে ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করেন তজ্জন্য প্রতি বৎসর অন্যান্য খাতের বরাদ্দের সাথে ভূমি উন্নয়ন কর খাতেও বরাদ্দ নিশ্চিত করার ব্যবস্থা করবেন।

এই সকল সংস্থা কর্তৃক ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ না করার পক্ষে বাজেট বরাদ্দ নাই এই যুক্তি দেখানো হয়ে থাকে। কিন্তু কোন প্রতিষ্ঠানের প্রকৃত ব্যয় বাজেটে প্রতিফলন না করানো একটি ভ্রান্তিমূলক অবস্থা। কাঠামোগত সাযুজ্য বিধানের জন্য এটি পরিহার করা একান্ত কর্তব্য। বিভিন্ন সরকারী/বেসরকারী সংস্থা বিদ্যুৎ বিল, টেলিফোন বিল ইত্যাদি পরিশোধ করে থাকে। এমতাবস্থায় তাঁরা ভূমি উন্নয়ন কর পরিশোধ করতেও বিধি মোতাবেক বাধ্য।

সঠিক দাবী নির্ধারনের জন্য প্রশাসনিক ব্যবস্থা

সুষ্ঠু প্রশাসনিক ব্যবস্থা গ্রহণ করলে ভূমি উন্নয়ন করের দাবী যে উল্লেখযোগ্য পরিমাণে বৃদ্ধি পাবে, তা পুনরুক্তি করা বাহুল্য মাত্র। ঢাকা জেলা প্রশাসন ১৯৮৮ সনের আগষ্ট-সেপ্টেম্বর মাসে ভূমি ব্যবস্থাপনা সংক্রান্ত একটি বিশেষ কর্মকাণ্ড গ্রহণ করে। একে জাগরণী কর্মকাণ্ড নামে অভিহিত করা হয়। প্রতিটি হোল্ডিং সরেজমিনে তদন্ত করে কৃষি/আবাসিক/শিল্প/বাণিজ্য প্রভৃতি জমির ব্যবহার অনুযায়ী ভূমি উন্নয়ন করের দাবী নিরূপণ করা এই কর্মকাণ্ডের একটি অন্যতম লক্ষ্য ছিল। ঢাকা জেলার ভূমি উন্নয়ন করের পূর্ববর্তী এবং জাগরণী কর্মকাণ্ডের ফলে পুণঃনির্ধারিত দাবীর পরিমাণ নিম্নে দেখানো হলো ঃ-

সন	দাবী (টাকায়)
১৯৮৩-৮৪	২,৫৮,১৭,৩০০.০০
১৯৮৪-৮৫	২,৭১,০৩,১০০.০০
১৯৮৫-৮৬	১১,৬৮,৩২,০০০.০০
১৯৮৬-৮৭	১৩,৪৩,০৩,৩০০.০০
১৯৮৭-৮৮	৮,১১,৪৭,১০০.০০
১৯৮৮-৮৯	৩৪,৪৪,৪০,৫০০.০০

(সূত্র ঃ ভূমি পরিক্রমা শীর্ষক পুস্তিকা)

এইরূপ বিশেষ কর্মসূচী সারা দেশে গ্রহণ করা হলে ভূমি উন্নয়ন করের দাবী যে বর্তমানের চাইতে ২০০% হতে ৩০০% বৃদ্ধি পাবে তাতে কোন সন্দেহ থাকতে পারে না। ভূমি সচিব তাঁর প্রভাষনে এইরূপ আশাবাদ ব্যক্ত করছেন।

পশ্চিমবঙ্গে ভূমি রাজস্বের হার

অবিভক্ত বঙ্গদেশের অংশ হিসেবে ১৯৪৭ সনের ১৪ই আগষ্ট পর্যন্ত বাংলাদেশ এবং পশ্চিমবঙ্গের একই ভূমি ব্যবস্থাপনা এবং খাজনা আদায়ের প্রথা বিরাজমান ছিল। বর্তমানে পশ্চিমবঙ্গে এবং তার অধীন প্রণীত বিধিমালা অনুযায়ী ভূমি রাজস্ব ধার্য এবং আদায় করা হয়। চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত প্রবর্তনের কাল হতে দীর্ঘদিন যাবৎ প্রচলিত ব্যবস্থা এই আইনের বলে সম্পূর্ণভাবে পরিবর্তন করা হয়। এতে রায়তের প্রতিটি হোল্ডিং এর বাজার মূল্যের উপর নিম্ন বর্ণিত হারে ভূমি রাজস্ব ধার্য করা হয়ে থাকে ঃ

১।	হোল্ডিং এর মূল্য ৫,০০০ রূপী পর্যন্ত	শূন্য
২।	পরবর্তী ১,০০০ রূপী পর্যন্ত	প্রতি রূপীতে দুই পয়সা
৩।	পরবর্তী ১,০০০ রূপী পর্যন্ত	প্রতি রূপীতে তিন পয়সা
৪।	পরবর্তী ১,০০০ রূপী পর্যন্ত	প্রতি রূপীতে চার পয়সা
৫।	পরবর্তী ১,০০০ রূপী পর্যন্ত	প্রতি রূপীতে পাঁচ পয়সা
৬।	পরবর্তী যে কোন অঙ্ক পর্যন্ত	প্রতি রূপীতে আট পয়সা

এই ব্যবস্থায় এক ফসলী কিংবা দো/তিন ফসলী জমি, সেচ সুবিধা বঞ্চিত কিংবা সেচ সুবিধা প্রাপ্ত জমির মধ্যে কোন পার্থক্য করা হয় নি। কারণ শ্রেণীভেদে হোল্ডিং এর বাজার দর ভিন্ন হবে এবং তদনুযায়ী ভূমি রাজস্ব স্থির করা হয়।

ভূমি কর সম্বন্ধে ইসলামের বিধান

ইসলামে ভূমি এবং কৃষি পণ্যের উপরে যে করের বিধান রয়েছে তা হলো (১) খারাজ এবং (২) ওশর। জমি ব্যবহারের অধিকার লাভ এবং তা অব্যাহত রাখার জন্য খারাজ প্রদান করতে হয়। একে ভূমি করের সমার্থক বলা যায়।

অন্য দিকে ওশর আদায়ের কারণ কৃষি হতে ফসল উৎপাদন জনিত লাভ।

খারাজ এবং ওশর একত্রে ধার্য হওয়া অবৈধ মনে করা হয় না। বর্তমানে আদায়যোগ্য ভূমি উন্নয়ন কর অভিন্ন হারে সুষম পর্যায়ে খারাজ আখ্যায়িত করা যেতে পারে। আর কৃষি আয়করের পরিবর্তে ধার্য করা যেতে পারে ওশর। কৃষি আয়কর আদায় করা সহজসাধ্য ব্যাপার নহে। সম্পন্ন কৃষকদের মধ্যে এই কর ফাঁকি দেবার প্রবনতা রয়েছে।

কিন্তু ওশর প্রদান ধর্মীয় বিধানমতে অবশ্য করণীয় বলে তা আদায় করা তুলনামূলকভাবে সহজ। একটি স্বাভাবিক বৎসরে বাংলাদেশে দেড় কোটি টন খাদ্য শষ্য উৎপন্ন হয়। জনগণের এক বড় অংশ ভূমিহীন ও গরীব কৃষক। মোট জমির অর্ধেক পরিমাণ স্বচ্ছল কৃষকের হাতে। কাজেই বাংলাদেশে উৎপাদিত খাদ্য শস্যের অন্ততঃ অর্ধেক অর্থাৎ ৭৫ লক্ষ টন উৎপাদন করেন স্বচ্ছল কৃষকগণ এবং তাদের প্রত্যেকের উৎপাদন এর পরিমান নিসাব এর অতিরিক্ত হয়ে থাকে, যাতে

ওশর আদায়যোগ্য। যদি এই ৭৫ লক্ষ টনের উপর অর্ধ ওশর (৫%) আদায় করা হয়, তবে ওশরের পরিমান হবে ৩ লক্ষ ৭৫ হাজার টন যার মূল্য প্রায় ২২৫ কোটি টাকা। অন্যদিকে পাট, চা, রবি শস্য, তামাক ও অন্যান্য ফসল, যেগুলোর ওশর পরিমান হবে আনুমানিক ৫০০ কোটি টাকা। প্রকৃতপক্ষে অনেক জমির ফসল হতে পূর্ণ ওশর অর্থাৎ ১০% আদায়যোগ্য হতে পারে এবং সেই ক্ষেত্রে ওশর এর পরিমাণ আরো বৃদ্ধি পাবে। এখানে উল্লেখ করা যায় যে, খারাজ সকল মালিকের নিকট হতে আদায়যোগ্য, কিন্তু ওশর কেবলমাত্র মুসলমান মালিকই আদায় করতে বাধ্য।

উপসংহার

বিশ্ব ব্যাংকের পরামর্শের আলোকেই ধাপ বিশিষ্ট ভূমি উন্নয়ন কর নির্ধারণ করা হয়। ভূমি তথা কৃষি খাত হতে সংগৃহীত আয় দেশের উন্নয়নে বিনিয়োগ করাই এই প্রক্রিয়ার উদ্দেশ্য। মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা যারা ভূমি ব্যবস্থাপনায় নিয়োজিত তাঁরা প্রচলিত ধাপ অনুসারে ভূমি উন্নয়ন কর আদায়ে বহুবিধ অসুবিধার সম্মুখীন হওয়ায় কৃষি ভূমির জন্য ঢালাওভাবে একটি গ্রহণযোগ্য করের হার নির্ধারণের ব্যাপারে সরকারের নিকট সুপারিশ করেছেন এবং তা সরকারের বিবেচনাধীন। তাই ভূমি উন্নয়ন কর যা অন্য কোন কর পুণঃনির্ধারনে ও আদায়ে এবং তা থেকে সরকারী ব্যয় মিটানো ও বিনিয়োগের ক্ষেত্রে এই বিষয়টি সম্যকভাবে গুরুত্ব সহকারে পর্যালোচনা করা সরকার তথা উচ্চ পদস্থ কর্মকর্তা এবং সচেতন নাগরিকদের বিশেষ কর্তব্য ও দায়িত্ব।

পরিশিষ্ট ক

হাল নাগাদ সংশোধিত ভূমি উন্নয়ন কর অধ্যাদেশ ১৯৭৬ এর বিধান মোতাবেক আরোপিত ভূমি উন্নয়ন করের হার

(ক) কৃষি জমির ক্ষেত্রে

সংশ্লিষ্ট উপজেলায় মালিক পরিবার/ সংস্থার মোট জমির পরিমান ঃ	করের হার
(১) .০১ একর হইতে ২.০০ একর পর্যন্ত	প্রতি শতাংশের জন্য .০৩ টাকা সর্বনিম্ন ১.০০ টাকা।
(২) ২.০১ একর হইতে ৫.০০ একর পর্যন্ত	প্রতি শতাংশের জন্য .৩০ টাকা
(৩) ৫.০১ একর হইতে ১০.০০ একর পর্যন্ত	প্রতি শতাংশের জন্য .৫০ টাকা
(৪) ১০.০০ একর এর উর্ধে	প্রতি শতাংশের জন্য ২.০০ টাকা
(ক১) চা, কপি ও রাবার চাষের জন্য	প্রতি শতাংশের জন্য ১.১০ টাকা

(খ) অকৃষি জমির ক্ষেত্রে –

জমির অবস্থান	শিল্প/বাণিজ্য কাজে ব্যবহৃত প্রতি শতাংশের জন্য	আবাসিক/ অন্যকাজে ব্যবহৃত প্রতি শতাংশের জন্য
(১) ঢাকা, নারায়ণগঞ্জ ও গাজীপুর জেলার কোতওয়ালী, মীরপুর, মোহাম্মদপুর, সুত্রাপুর, রমনা, ধানমণ্ডি, তেজগাও, ক্যান্টনমেন্ট, ডেমরা, মতিঝিল, গুলশান, টঙ্গী, কেরাণীগঞ্জ, জয়দেবপুর, ফতুল্লা, সিদ্দিরগঞ্জ, লালবাগ, বন্দর থানা এলাকায়	৬০.০০	১২.০০
(২) চট্টগ্রাম জেলার পাঁচলাইশ, ডবলমুড়িং বন্দর ও সীতাকুণ্ড থানায়	৬০.০০	১২.০০
(৩) খুলনা জেলার কোতওয়ালী, দৌলতপুর ও ফুলতলা থানায়	৬০.০০	৪.০০
(৪) জেলা সদরের পৌর এলাকায়	১০.০০	৩.০০
(৫) উপরোক্ত স্থান ব্যতীত অন্য এলাকায় অবস্থিত হইলে	৮.০০	৩.০০

গ্রন্থপঞ্জী

১। ভূমি প্রশাসন বোর্ড : ভূমি প্রশাসন ম্যানুয়েল

২। ডঃ কামাল সিদ্দিকী ও অন্যান্য : Land reforms & land Management in Bangladesh and West Bangal.

৩। বদরুদ্দীন উমর : বাংলাদেশের কৃষক আন্দোলন।

৪। শাহ আবদুল হান্নান : ইসলামী অর্থনীতিতে সরকারের ভূমিকা।

৫। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার : ভূমি সংস্কার কমিটির প্রতিবেদন।

6. Bangladesh Institute of Development Studies. : Agricultural Taxation in Bangladesh

বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ঃ একটি সমীক্ষা

—মোঃ বদিউজ্জামান

ভূমিকা

বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ রয়েছে যে, ''রাষ্ট্র সংশ্লিষ্ট এলাকার প্রতিনিধিগণ সমন্বয়ে গঠিত স্থানীয় শাসন সংক্রান্ত প্রতিষ্ঠানসমূহকে উৎসাহ দান করবেন।'' এ লক্ষ্য অর্জনের জন্য বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার প্রথম হতেই নতুন আঙ্গিকে প্রশাসনকে ঢেলে সাজাবার এবং স্থানীয় সরকার সংস্থাসমূহকে আরো গতিশীল করার প্রয়াস চলে আসছে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের জন্য বিভিন্ন সময় বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে।

বাংলাদেশ এখন কোন উপনিবেশ নয়, একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র। উপনিবেশিক শাসন ব্যবস্থায় বিদেশী প্রভুদের তুষ্ট করাই প্রশাসনের মুখ্য লক্ষ্য থাকে কিন্তু স্বাধীন সার্বভৌম গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রে প্রশাসনের মূল উদ্দেশ্য থাকে জনগণের কল্যাণ সাধন। যেহেতু প্রশাসন জনগণের জন্য সুতরাং জনগণের স্বার্থ রক্ষার জন্য প্রশাসনকে জনগণের কাছাকাছি নেয়ার বিভিন্ন পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছে বাংলাদেশে। এ কার্যক্রম কতটুকু ফলপ্রসূ হয়েছে এবং যাদের স্বার্থে প্রচেষ্টা চালানো হয়েছে তারা কতটুকু উপকৃত বা লাভবান হয়েছে বা তাদের অবস্থার তথা সমাজের কি পরিবর্তন সাধিত হয়েছে তা পর্যালোচনা করা এ প্রবন্ধের লক্ষ্য। বর্তমান সরকারের আমলে যে কয়টি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে তার মধ্যে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য, আলোচিত এবং সমালোচিত বিষয় হচ্ছে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ। বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় ক্ষমতা বণ্টন (DEVOLUTION) পদ্ধতিতে সৃষ্ট উপজেলা পদ্ধতিকে বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার বিশ্লেষণ করাও প্রবন্ধের আর একটি লক্ষ্য।

প্রাথমিক পর্যায়ে এ লেখায় প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের তাত্ত্বিক দিক আলোচনা করা হবে। এ লেখার লক্ষ্যসমূহ মনে রেখেই বাংলাদেশ প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ বিশেষ করে উপজেলা পদ্ধতি পত্তন, গোড়ার কথা এবং এর বিভিন্ন দিক সম্পর্কে একটি পর্যালোচনা করা হবে। অবশ্য প্রাসংগিকভাবে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের অন্যান্য দিকগুলোও আলোচনায় থাকবে তবে তা গভীরভাবে পর্যালোচনা করা সম্ভব নয় এ স্বল্প পরিসরে।। উপসংহারসহ উপজেলা পদ্ধতির উপর কয়েকটি সুপারিশ থাকবে।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ঃ একটি তাত্ত্বিক ধারণা

বর্তমানে বিকেন্দ্রীকরণের এক বিশ্বজনীন আবেদন রয়েছে যদিও বিভিন্ন দেশে বিভিন্নরূপে এ প্রক্রিয়া চলছে। প্রত্যেক ধরনের সরকারই বিকেন্দ্রীকরণের প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একবার ভাবে। কোন দেশের ভৌগোলিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও জাতিগত দিক বিবেচনা করে ঐ দেশের বিকেন্দ্রীকরণ নীতি নির্ধারণ করা হয়ে থাকে তারা তাদের মত গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করে থাকেন। আবার একই প্রক্রিয়াকে অন্যেরা হয়তো আমলাতন্ত্রের মাধ্যমে প্রতিষ্ঠিত করতে চান।

আধুনিক বিশ্বে প্রশাসনের একটি উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য হচ্ছে প্রত্যেক নাগরিক ও সরকারী কর্মকর্তাদের মধ্যে সুসম্পর্ক প্রতিষ্ঠা করা। প্রত্যেক ব্যক্তিকে উন্নততর দৈনন্দিন জীবন যাপনের জন্য বিভিন্ন সরকারী প্রশাসন যন্ত্রের সংগে যোগাযোগ করতে হয়, প্রশাসনের স্বার্থে সরকারী বিভিন্ন এজেন্সীসমূহ, বিভিন্ন ব্যক্তি, পরিবার এবং ব্যক্তিমালিকানাধীন প্রতিষ্ঠানের কাছে যেতে হয়। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় যে, সরকারের এমন কতগুলো কাজ যেমন–রাজস্ব আদায় আইন শৃংখলা বিধান, ভূমি নিবন্ধন, কৃষকদের মধ্যে ঋণ বিতরণ, ইত্যাদি বিভিন্ন ধরনের কাজ কর্ম আছে যা রাজধানী হতে সমাধান করা কোন ক্রমেই সম্ভব নয়। আবার অনেক সময় দেখা যায়, দেশে রাজনৈতিক পরিবর্তনের সাথে সাথে নতুন করে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির কথা বলা হয়ে থাকে যা মূলতঃ রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মধ্যে সমতা আনয়নে সহায়তা করে। কিন্তু সরকারী কাঠামোর অংশ হিসেবে বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসন ও পরিকল্পনা প্রণয়ন তখনই টিকে থাকতে পারে যখন উন্নয়ন হয় এর ভিত্তি। রাজনৈতিক ও সরকার পরিবর্তন হলেও বিশেষ রাজনৈতিক শক্তির স্বার্থে সম্পর্ক থাকার কারণে একে পরিবর্তন করা যায় না। এ জন্য হয়তো বিভিন্ন অনুন্নত দেশের অনভিজ্ঞ সরকারগুলো কেন্দ্রে দৃঢ় ক্ষমতা সম্পন্ন সরকারের তুলনায় বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার বিরুদ্ধাচরণ করে। দেখা যায় শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকারের আমলেই শক্তিশালী স্থানীয় সরকারের/জনগণের অংশ গ্রহণ ও সম্পদের আহরণ সম্ভব। অনুন্নত দেশগুলোতে নেতৃবৃন্দের মধ্যে মতানৈক্যের কারণে সরকার সাধারণতঃ দুর্বল হয় এবং ক্ষমতা হারানোর ভয়ে বিকেন্দ্রীকরণকে পূর্ণভাবে বিকশিত হতে দেয়া হয় না। বিভিন্ন প্রতিষ্ঠান ও পন্থার মাধ্যমে একটি জাতি যত বেশী রাজনৈতিক সমস্যা সমাধান করার ক্ষমতা অর্জন করে ততবেশী সেখানে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার উন্নতি সাধন সম্ভব হয়। এক দলীয় সরকারের প্রশাসন যন্ত্র ও রাজনৈতিক দলের মধ্যে মত পার্থক্য কম থাকায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহকে মজবুত ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত করতে পারে বটে কিন্তু ঐক্যমত সম্পন্ন বহু দলভিত্তিক স্থিতিশীল নিরবচ্ছিন্ন রাষ্ট্র শাসন ব্যবস্থা যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের ভীতি ডিঙিয়ে যেতে পারে তখন শক্তিশালী স্থানীয় প্রতিষ্ঠানগুলোর মাধ্যমে জনগণের অংশগ্রহণকে রাজনৈতিক ক্রিয়া কর্মের অখণ্ড অংশ হিসেবে ধরে নিতে পারে। আমলাতন্ত্রের বৈরী সুলভ দৃষ্টিভংগি এতে অনেকটা অতিক্রান্ত হবে। উন্নয়নশীল দেশে এ অবস্থা আনয়ন সময় সাপেক্ষ, কিন্তু এটাই প্রকৃত বিকেন্দ্রীকরণের পথকে সুগম করতে পারে।

ধারণা ও পদ্ধতি হিসেবে জেমস ডব্লিউ কেসলার বিকেন্দ্রীকরণকে একটি জটিল বিষয় বলে মনে করেন। এ জটিলতাকে বোঝার জন্য কেসলার চার দৃষ্টিকোণ থেকে বিকেন্দ্রীকরণকে দেখার চেষ্টা করেন–মতবাদ হিসেবে বিকেন্দ্রীকরণ, একটি রাজনৈতিক প্রক্রিয়া হিসেবে, একটি প্রশাসনিক

সমস্যা হিসেবে এবং সরকারী কর্মচারী ও জনপ্রতিনিধি সহকারে প্রতিষ্ঠিত একটি প্রশাসনিক প্রক্রিয়া হিসেবে।[২] ডায়না কনিয়ার্স মনে করেন "বিশ্লেষণমূলক সমস্যাদি বিকেন্দ্রীকরণের ধারণাকে ঘিরে থাকার ফলে বিকেন্দ্রীকরণের উপর কোন আলোচনা যে কোন সময় এলোমেলো হয়ে যেতে পারে[৩]" কনিয়ার্স ডি, এ রণ্ডিনেলী প্রদত্ত সংজ্ঞা গ্রহণ করেছেন। রণ্ডিনেলীর মতে "পরিকল্পনা প্রণয়ন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ এবং গণকার্যক্রমের ব্যবস্থাপনার ক্ষমতা জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে হস্তান্তর করাকে বিকেন্দ্রীকরণ বলে।"[৪] কনিয়ার্স মনে করেন বর্তমানে বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিশেষ করে অনুন্নত দেশগুলোর প্রসংগে ব্যবহৃত বিকেন্দ্রীকরণ শব্দটির সংগে এ সংজ্ঞা সংগতিপূর্ণ, তবে জাতীয় ও সরকারী পর্যায় থেকে বিভিন্ন আঞ্চলিক, স্থানীয় ও বেসরকারী এবং আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানে ক্ষমতা হস্তান্তরের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ বহুবিধ সাংগঠনিক পরিবর্তনের সংগে যুক্ত হয়ে অনেক রূপ ধারণ করতে পারে।[৫]

বিকেন্দ্রীকরণের ধরণ ঃ যেহেতু বিভিন্ন পরিস্থিতিতে বিকেন্দ্রীকরণ বিভিন্ন রূপে প্রতিভাত হয় তাই সঠিকভাবে একে শ্রেণীভূক্ত করা অনেক সময় সম্ভব হয় না। তবে বিকেন্দ্রীকরণকে শ্রেণী বিন্যাস করতে কনিয়ার্স এর মতে নিম্নলিখিত বিষয়গুলো মনে রাখতে হবে ঃ

(ক) যে ব্যবহারিক কার্যক্রমের উপর ভিত্তি করে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে ;
(খ) প্রতিটি ব্যবহারিক কার্যক্রমের উপর হস্তান্তরিত ক্ষমতার প্রকৃত ধরণ ;
(গ) যে পর্যায় স্তর এবং এলাকায় এরূপ ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে ;
(ঘ) এরূপ ক্ষমতা প্রতিটি পর্যায়, স্তর এবং এলাকায় অবস্থিত যে সব ব্যক্তি, সংস্থা ও প্রতিষ্ঠানে হস্তান্তরিত হয়েছে,
(ঙ) যে সব আইনগত ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার মাধ্যমে এ ক্ষমতা হস্তান্তরিত হয়েছে।[৬]

রণ্ডিনেলী এবং অন্যান্যরা অবশ্য গুরুত্বপূর্ণ বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াগুলোর মধ্যে পার্থক্য দেখাবার জন্য চার ধরনের বিকেন্দ্রীকরণের স্বীকৃতি দিয়েছেন– যেমন বিকেন্দ্রীকরণ, প্রতিনিধি প্রেরণ (delegation), ক্ষমতা বণ্টন (devolution) এবং ব্যক্তিগতকরণ। কোন কোন সরকার চারটি পদ্ধতিকে একই সময়ে বা কোন সরকার বিভিন্ন সময়ে এ পদ্ধতি অনুসরণ করেছেন। কেসলার অবশ্য বিকেন্দ্রীকরণের ধরনের উপর আস্থাশীল নন। তবে তিনি বিকেন্দ্রীকরণ বুঝাতে ক্ষমতা বণ্টন (devolution) ও বিপুঞ্জিভূতকরণ (deconcentration) ব্যবহার করেছেন। কেউ কেউ বিকেন্দ্রীকরণকে আবার এভাবেও ভাগ করেছেন যেমন ঃ বিপুঞ্জিভূতকরণ, প্রতিনিধি প্রেরণ, ক্ষমতা বণ্টন, ব্যক্তিগতকরণ, এগুলো কোন না কোন ভাবে জনগণের অংশগ্রহণ, স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান এবং সম্পদ আহরণে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে প্রভাব বিস্তার করে। অধুনা সর্বশেষ যে যুক্তি প্রদর্শন করা হয় তা হলো উন্নয়নশীল দেশগুলোতে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার ধরণ হিসেবে ক্ষমতা বণ্টন, বিপুঞ্জিভূতকরণ, প্রতিনিধি প্রেরণ ও ব্যক্তিগতকরণ দ্বারা বিকেন্দ্রীকরনের মূল উদ্দেশ্য প্রকাশ করতে পারে না। রণ্ডিনেলী মনে করেন বিকেন্দ্রীকরণ মূলতঃ রাজনৈতিক সিদ্ধান্তের উপরই নির্ভর করে এবং এর বাস্তবায়ন ও সেখানকার রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। প্রশ্ন আসতে পারে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়া তাহলে কিভাবে বাস্তবায়িত হয়। এ ক্ষেত্রে কনিয়ার্স মনে করেন জাতীয় পর্যায় থেকে স্থানীয় পর্যায়ে আনুষ্ঠানিক এবং অনানুষ্ঠানিক উভয়

প্রথাতেই ক্ষমতা বিকেন্দ্রীকরণ হতে পারে। এক্ষেত্রে একটি পার্থক্য লক্ষ্য করতে হবে যে, কোন্ ক্ষমতা আইনের মাধ্যমে' বিকেন্দ্রীকরণ করা হচ্ছে আর কোন্ ক্ষমতা প্রাতিষ্ঠানিক হস্তান্তরের মাধ্যমে বিকেন্দ্রীকরণ করা হচ্ছে। অবশ্য উভয় ক্ষেত্রে প্রকৃত ধরনের অনেক গুরুত্বপূর্ণ তারতম্য আছে। [৭]

বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ধরন এবং এর বাস্তবরূপ

প্রত্যেক দেশেই সরকারের কাঠামো প্রায়শঃই পরিবর্তিত হয়। এ পরিবর্তন কখনো প্রশাসনিক সংস্থারও পুনর্গঠনের মাধ্যমে দ্রুতগতিতে আবার কখনো সামাজিক, প্রশাসনকি ও রাজনৈতিক শক্তিসমূহের মধ্যে আলাপ আলোচনার মাধ্যমে হয়ে থাকে। উন্নয়নশীল দেশগুলোতে এ পরিবর্তনের ফলাফল যতবেশী চোখে পড়ে উন্নত দেশে তত নয় কারণ উন্নয়নশীল দেশে সরকারই সধারণতঃ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করে। [৮] বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের যতগুলো পদক্ষেপ নেয়া হয়েছে সবকটিতেই মূলতঃ বিভিন্ন সরকার মূখ্য ভূমিকা পালন করে। যেহেতু বাংলাদেশকে একটি উন্নয়নশীল দেশ হিসেবে গণ্য করা হয় অথবা যদি অনুন্নত দেশ বলেও আখ্যায়িত করা হয় তবুও এখানে বিকেন্দ্রীকরণের সব পদক্ষেপই সকলের নজরে পড়ে। এ প্রক্রিয়া বৃটিশ আমল থেকেই, এমনকি আরো আগে থেকেই চলে আসছে। যেহেতু বাংলাদেশে স্থানীয় সরকারের ক্রমবিকাশ ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট আলোচনা করা হবে তাই এখানে মতবাদের আলোকে বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণ পদ্ধতিসমূহ কতটুকু বাস্তবায়িত হচ্ছে তার কিছু ধারণা দেয়ার প্রচেষ্টা চালানো হবে।

আমরা দেখেছি বিকেন্দ্রীকরণ সাধারণতঃ চার পদ্ধতিতে সম্পাদন করা যায় ঃ যেমন Deconcentration বা বিপুঞ্জিভূতকরণ, Delegation বা প্রতিনিধিত্ব প্রক্রিয়া ও Devolution বা ক্ষমতা অর্পন এবং Privatisation or Transfer of functions from public to non-government organizations বা ব্যক্তিগতকরণ অথবা সরকার হতে বেসরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে কার্য বন্টন। কোন কোন দেশে এর দু'একটি পদ্ধতি অনুসরণ করে আবার কোন কোন দেশে সবকটি পদ্ধতির প্রতিফলন দেখতে পাওয়া যায়। বাংলাদেশ শেষোক্ত দলেরই একটি। অর্থাৎ এখানে চারটি পদ্ধতিরই প্রতিফলন ঘটেছে। বাংলাদেশে কেন্দ্র শাসিত পদ্ধতির সরকার বর্তমান। তাই কেন্দ্র হতেই সব আদেশ নির্দেশ জারী হয়ে বাস্তবায়িত হওয়ার কথা, কিন্তু প্রশাসনের সুবিধার জন্য কাজের ভার সরকারের মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা / কর্মচারীদের দ্বারাই পালন করতে হয়। যদিও নীতি নির্ধারণের ক্ষেত্রে এ সমস্ত মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাদের স্বাধীনতা মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তা দ্বারা বিপুঞ্জিভূতকরণ প্রক্রিয়া বহুলাংশে সাধিত হয়।

স্বাধীনতার পূর্বে বাংলাদেশে মোট ১৯টি জেলা ছিল। বাংলাদেশ সৃষ্টির পর পর্যায় ক্রমে প্রথমে ২১টিতে এবং পরে ৬৪টি জেলা সৃষ্টি করা হয়। জেলা প্রশাসক জেলার প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা হিসেবে কেন্দ্রীয় সরকারের প্রতিনিধিত্ব করছেন। কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তারাও জেলায় নিজ নিজ বিভাগীয় দায়িত্ব পালন করছেন। জেলা প্রশাসক প্রধানতঃ সকল বিভাগের সমন্বয়কারী হিসেবে কাজ করেন। অবশ্য জেলা প্রশাসকের এ দায়িত্ব পালন সম্পর্কে

বর্তমানে বহু আলোচনা সমালোচনা আছে যা পরবর্তীতে আলোচনা করা হবে। এখানে উল্লেখ্য, মাঠ পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ কেন্দ্রীয় সরকারের নীতি লংঘন না করে স্থানীয় পর্যায়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও পরিকল্পনা প্রণয়ন বাস্তবায়ন করতে পারেন।

বাংলাদেশ সরকারের বিভিন্ন মন্ত্রণালয়াধীন বিভিন্ন কর্মকাণ্ড আর একটি পদ্ধতিতে সম্পাদিত হয় যা প্রতিনিধিত্ব প্রক্রিয়া নামে লোক প্রশাসন ভাষায় অবহিত। এ প্রক্রিয়া আবার দু'ধরনের হয় ঃ স্বায়ত্তশাসিত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থার মাধ্যমে প্রতিনিধিত্ব এবং মন্ত্রণালয় বা বিভাগের কর্তকর্তাদের মধ্যে পদমর্যাদা অনুযায়ী কর্ম সম্পাদন করার ক্ষমতা প্রদান করা।

বাংলাদেশে অধিকাংশ মন্ত্রণালয়ের অধীনেই এক বা একাধিক স্বায়ত্ত বা আধা-স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা ও দপ্তর আছে। এ সব সংস্থার প্রায় সকলের নিজস্ব নিয়ম কানুন ও কর্ম পদ্ধতি আছে। সরকারের মূলনীতির সংগে সংগতি রেখে তারা নিজস্ব পরিকল্পনা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়ন করতে পারে। এ সমস্ত স্বায়ত্তশাসিত সংস্থাগুলো কেন্দ্রীয় সরকারকেই মূলতঃ প্রতিনিধিত্ব করছে। অন্যদিকে কাজের সুবিধার জন্য মন্ত্রণালয় বা বিভাগগুলো তাদের কর্মকর্তাদের মধ্যে দায়িত্ব ভাগ করে দেন কাজে গতিশীলতা আনয়ন করার জন্য। সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণ তাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের ক্ষেত্রে মন্ত্রণালয়ের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করেন। এ ছাড়া কোন কোন মন্ত্রণালয় তার কিছু কিছু ক্ষমতা কাজের সুবিধার্থে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট মন্ত্রণালয়কেও ব্যবহার করার জন্য দিয়ে থাকে।

বিকেন্দ্রীকরণের তৃতীয় পদ্ধতি হচ্ছে ক্ষমতা হস্তান্তর / অর্পন বা Devolution। স্থানীয় পর্যায়ে সম্পাদন করা যায় এমন কতকগুলি কার্যভার ও ক্ষমতা কেন্দ্রীয় সরকার এ পদ্ধতির মাধ্যমে স্থানীয় সরকারের কাছে অর্পন করে থাকে। এর কয়েকটি বৈশিষ্ট্য হচ্ছে ঃ (১) স্থানীয় সংস্থাগুলো স্বায়ত্বশাসিত ও স্বাধীন, যার উপর কেন্দ্রীয় সরকারের সরাসরি কোন নিয়ন্ত্রণ নেই; (২) এ ধরনের স্থানীয় সরকারগুলোর ভৌগোলিক সীমারেখা আছে যার মধ্যে তারা তাদের কর্তৃত্ব বজায় রাখে; (৩) স্থানীয় সরকারগুলো আইনসিদ্ধ সংস্থার মর্যাদা সম্পন্ন এবং নিজেরাই সম্পদ আহরনের ক্ষমতা রাখে; (৪) এ পদ্ধতি দ্বারা স্থানীয় সরকারকে একটি প্রাতিষ্ঠানিক রূপ দেয়া যা হতে স্থানীয় জনগণ উপকৃত হয়, এবং (৫) এ প্রক্রিয়া দ্বারা স্থানীয় সরকার ও কেন্দ্রীয় সরকারের মধ্যে এক যোগসূত্র, সৃষ্টি হয়। বাংলাদেশে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের তৃতীয় পদ্ধতি অর্থাৎ ক্ষমতা অর্পন প্রক্রিয়া অনুসরণ করে উপজেলা পদ্ধতি চালু করা হয়। ক্ষমতা বন্টন প্রক্রিয়ার বৈশিষ্ট্যগুলো কিভাবে উপজেলা পদ্ধতিতে রূপ নিয়েছে নিম্নে তা বিস্তারিতভাবে আলোচিত হয়েছে।

বিকেন্দ্রীকরণের ৪র্থ পদ্ধতি হচ্ছে ব্যক্তিগতকরণ বা বেসরকারী সংস্থার নিকট কার্য ক্ষমতা হস্তান্তরকরণ অর্থাৎ Privatisation or transfer of functions from government to NGOs. পৃথিবীর অনেক দেশের মত বাংলাদেশেও অনেক দায়িত্ব বেসরকারী সংস্থার মাধ্যমে সম্পাদিত হয়ে থাকে যা জনসাধারণের স্বার্থেই করা হয়। এ সকল সংস্থাগুলো সাধারনতঃ সেবা কেন্দ্রিক কার্যাদি সম্পাদন করে থাকে।

সরকারী সংস্থার পাশাপাশি বাংলাদেশে গত দু'দশক ধরে বেসরকারী সংস্থাসমূহ গ্রামের দরিদ্র জনগণের সেবায় নিয়োজিত আছে। স্বাধীনতার পর এ সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে যায়। সরকারের নিকট রেজিষ্ট্রিকৃত বেসরকারী সংস্থার সংখ্যা ৮০০০ এর বেশী। এর মধ্যে আবার প্রায় ২০০

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

প্রতিষ্ঠান বিদেশী উৎস থেকে সাহায্য পায়। যুদ্ধোত্তর বাংলাদেশে দারিদ্র্যের ব্যাপকতার ফলেই মূলতঃ বেসরকারী সংস্থার সংখ্যা বৃদ্ধি পায়। বাংলাদেশে সাধারণতঃ ৫ ধরনের বেসরকারী সংস্থা আছে যেমন ঃ (১) দাতা সংস্থা, উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের জন্য এধরনের সংস্থা দেশীয় ও আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থাগুলোকে সাহায্য দিয়ে থাকে, যেমন— অক্সফাম ; (২) কিছু আন্তর্জাতিক বেসরকারী সংস্থা আছে যারা বাংলাদেশে সরাসরি উন্নয়নমূলক কাজে অংশ গ্রহণ করে, যেমন—কেয়ার, হভী, এম সি সি, ইত্যাদি ; (৩) দেশীয় বেসরকারী সংস্থা যারা দেশের বিভিন্ন অংশে পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম সংগঠিত করছে ; এদের মধ্যে আছে 'ব্রাক', 'গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র', 'প্রশিকা','নিজেরা করি', ইত্যাদি ; (৪) কিছু বেসরকারী সংস্থা আছে যারা স্বল্প এলাকায় তাদের কর্মকাণ্ড পরিচালনা করে, এবং (৫) কিছু বেসরকারী সংস্থা আছে যারা অন্যান্য বেসরকারী সংস্থাকে সহযোগিতা করে থাকে, যেমন বাংলাদেশ উন্নয়ন সমিতি বা এডাব, স্বেচ্ছামূলক স্বাস্থ্য সেবা সমিতি। প্রশাসনের সুবিধার জন্য এবং অর্থনৈতিক কারণে অনেক কল-কারখানা যা পূর্বে রাষ্ট্রায়ত্ত ছিল তা অধুনা বিরাষ্ট্রীয়করণ করা হচ্ছে। এ সমস্ত শিল্প বা কল-কারখানার দায়-দায়িত্ব বেসরকারী পর্যায়ে দেয়া হচ্ছে যাকে লোক প্রশাসনের ভাষায় ব্যক্তিগতকরণ পদ্ধতি বা Privatization বলা হয়ে থাকে।

উপরোক্ত আলোচনা হতে প্রতীয়মান হয় যে বিকেন্দ্রীকরণের বিভিন্ন পদ্ধতি বাংলাদেশে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অনুসৃত হচ্ছে।

বাংলাদেশে সরকারী ব্যবস্থা বিকেন্দ্রীকরণের ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট

লিটল রিপাবলিক ঃ পাক-বাংলা-ভারত উপমহাদেশে স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানের ধারণা একেবারে নতুন নয়। ইতিহাস হতে দেখা যায় মৌর্য যুগে আরো প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় সরকারের অস্তিত্ব ছিল। গ্রাম্য প্রশাসন পদ্ধতির একটি পরিষ্কার বাংলা পওয়া যায় 'ধর্মসূত্রে' এবং কৌটিল্যের 'অর্থশাস্ত্রে'। একটি গ্রাম একটি পঞ্চায়েতের অধীন ছিল যার প্রধান ছিল 'গ্রাম স্বামী' বা 'গ্রামীন' পঞ্চায়েতে ৫ জন সদস্য ছিল। তাঁদের দায়িত্ব ছিল শত্রুর হাত হতে গ্রাম এবং জনগণের বিষয় সম্পত্তি রক্ষা করা। এর একটি গঠনতন্ত্র ছিল। পঞ্চায়েত ফৌজদারী মামলা নিষ্পত্তি করতো এবং গ্রামের যোগাযোগ ব্যবস্থা, কৃষি উন্নয়ন, গ্রামের শ্রীবৃদ্ধিকরণ প্রভৃতি কার্যাদিও দেখাশুনা করতো।[৮] উপমহাদেশের বিভিন্ন এলাকায় এ ধরনের স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বহু রাজনৈতিক উত্থান পতন দেখেছে কিন্তু এদের অনেকগুলো বহুদিন পর্যন্ত নিজ নিজ এলাকায় নিজেদের স্বকীয়তা বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছে। এ প্রতিষ্ঠানগুলো এতই কার্যকরী ছিল যে ইংরেজ লেখক স্যার চার্লস মেটকাফ (১৮১১-১৮১৯) এদেরকে 'লিটল রিপাবলিক' নামে অভিহিত করেছিলেন।

ইংরেজ আমল ঃ বর্তমানে স্থানীয় সরকার যে অবস্থায় আছে তার ইতিহাস খোঁজ করতে হলে আমাদেরকে এ উপমহাদেশে বৃটিশ প্রশসন পদ্ধতির দিকে ফিরে যেতে হয়। বর্তমান বাংলাদেশ ইংরেজ উপনিবেশ যুগে 'বাংলা প্রদেশ' নামে ছিল। অনেকে আছেন যারা বর্তমানে আমাদের দুর্ভাগ্যের জন্য ইংরেজকে দায়ী করেন। কিন্তু নিরপেক্ষ বিচারে দেখলে দেখা যাবে ইংরেজরা এদেশে শুধু একটি সহজ শিক্ষা পদ্ধতি, একটি সুন্দর বিচার পদ্ধতিই চালু করে যায়নি সংগে সংগে

প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার পদ্ধতির ধারণাও চালু করেছিল। বেংগল লোকাল সেলফ গভঃ এক্ট ১৮৮৫ (দি বেংগল এক্ট ৩, ১৮৮৫) এর মাধ্যমে কয়েকটি গ্রাম নিয়ে একটি ইউনিয়ন অর্থাৎ ইউনিয়ন বোর্ড গঠন করা হয়। একই ভাবে জেলা বোর্ডও গঠন করা হয়। মহকুমা পর্যায়েও এ ধরনের সংস্থা গঠন করার প্রচেষ্টা চালানো হয় কিন্তু তা গঠন করা সম্ভব হয়নি। তৎকালীন ভাইসরয় লর্ড রিপনের উদ্যোগেই মূলতঃ এ আইন পাশ করা হয়। এ সকল স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলোর মূল দায়িত্ব ছিল শিক্ষা ব্যবস্থা (প্রাথমিক হতে মাধ্যমিক), হাসপাতাল ও দাতব্য চিকিৎসা ব্যবস্থা দেখাশুনা করা, পূর্ত কর্মসূচী, বিশ্রামাগার, স্বাস্থ্য ও পরিস্কার পরিচ্ছন্নতা ইত্যাদির উন্নয়ন সাধন ও রক্ষণাবেক্ষণ করা। স্থানীয় সরকার ব্যবস্থায় ১৯২০ এর দিকে দু'টি উল্লেখযোগ্য পদক্ষেপ নেয়া হয়। প্রথমতঃ এক বা একাধিক থানা নিয়ে সার্কেল গঠন করা হয় এবং দ্বিতীয়তঃ ইউনিয়ন ও জেলা বোর্ড সমূহকে সম্পূর্ণভাবে প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানে পরিণত করা হয়। এর পূর্ব পর্যন্ত অন্ততঃ জেলা বোর্ডে জেলা ম্যাজিস্ট্রেট এর প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাজ করতেন। এদেশীয়দেরকে মূলতঃ প্রতিনিধিত্বমূলক সরকার পরিচালনায় প্রশিক্ষণ দেয়ার জন্য এ ব্যবস্থা চালু করা হয়েছিল।

পৌর সভার গোড়ার কথা–পল্লী এলাকায় স্থানীয় সরকারের তথা প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থার উন্নয়নের সাথে সাথে শহর এলাকায় প্রতিনিধিত্বমূলক সংস্থা সৃষ্টি করা হচ্ছিল। পলাশীর যুদ্ধে জয়ের পূর্বেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যখন এদেশে ব্যবসা করছিল তখন হতেই এর কর্মচারীদেরকে শহর এলাকায় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সমিতি গঠন করার জন্য উৎসাহ দিত। এগুলো তখন 'সাদা শহর' নামে পরিচিত ছিল। ১৮৪২ খৃঃ সর্ব প্রথম ১০ নং আইনের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে টাউন কমিটি করার ব্যবস্থা করা হয়। ১৮৫০ সনে ১৬ নং আইন পাশ করা হয় যার দ্বারা এ অঞ্চলে প্রথম মিউনিসিপ্যাল কমিটি গঠন করা হয়। এভাবে ১৮৫৬ খৃঃ নাসিরাবাদ, ১৮৬১ খৃ শেরপুর, ১৮৬৪ খৃঃ ঢাকা ও চট্টগ্রাম এবং ১৮৬৮ খৃঃ ব্রাহ্মণবাড়ীয়া পৌরসভা গঠন করা হয়। ১৮৯০ খৃঃ পর্যন্ত সকল পৌরসভায় সরকারী কর্মকর্তাগণই প্রধান হিসেবে কাজ করতেন। ১৮৯০ সনে নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ পৌরসভার দায়িত্ব গ্রহণ করেন। ১৯৩২ সনে বেংগল মিউনিসিপ্যাল এক্ট পাশ করা হয় যা দ্বারা ১৯৬০ সন পর্যন্ত পৌরসভাগুলো পরিচালিত হত। ১৯৬০ সনে পৌর প্রশাসন অর্ডিনেন্স জারী করা হয়। এ আইন দ্বারা পুনঃ সরকারী কর্মকর্তাকে নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নিয়োগ করা হয়। বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পৌরসভাগুলোতে প্রশাসক নিয়োগ করা হয়।

১৯৭৩ সনে বাংলাদেশে প্রথম পৌরসভার নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। ১৯৮৩ সনে এ দেশে পৌর প্রশাসনে আর এক নতুন ধারা সৃষ্টি করা হয়। চারটি বিভাগীয় শহরের পৌরসভাগুলোকে পর্যায়ক্রমে পৌর কর্পোরেশনে রূপান্তরিত করা হয়। [৯] বাংলাদেশে বর্তমানে পৌরসভা / পৌর কর্পোরেশনের সংখ্যা নিম্নরূপ [১৩] ঃ-

প্রকার ভেদ	সংখ্যা	সংশ্লিষ্ট আইন
১. পৌরসভা		পৌরসভা অর্ডিনেন্স ১৯৭৭
ক) ১ম শ্রেণী	১২	ঐ
খ) ২য় শ্রেণী	৩০	ঐ
গ) ৩য় শ্রেণী	৪২	ঐ
২। পৌর কর্পোরেশন		
ক) ঢাকা পৌর কর্পোরেশন		ঢাকা পৌর কর্পোরেশন অর্ডিনেন্স '৮৩
খ) চট্টগ্রাম ঐ		চট্টগ্রাম ঐ '৮২
গ) খুলনা ঐ		খুলনা ঐ '৮৫
ঘ) রাজশাহী ঐ		রাজশাহী ঐ '৮৭

দেখা যায় পল্লী এলাকার সাথে সাথে শহর অঞ্চলেও ক্ষমতা বন্টন প্রক্রিয়া চলতে থাকে। কোন সময় এটি সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রনে যায় আবার কখনো নির্বাচিত প্রতিনিধিগণ কর্তৃক পরিচালিত হয়। ১৯৮৪ সনের এক আদেশ বলে পৌরসভাগুলোকে স্থানীয় সরকারী কর্মকর্তাদের নিয়ন্ত্রণের হাত হতে সরিয়ে নেয়া হয়। পৌর এলাকায় উন্নয়ন সাধনসহ বিভিন্ন কর্মকাণ্ড পৌর কর্তৃপক্ষকে দেখতে হয়। সরকার হতে অনুদান এবং স্থানীয়ভাবে কর আদায়ের মাধ্যমে এর সম্পদ আহরন করা হয়। সরকারী নীতির মধ্যে থেকে নিজেরাই বিভিন্ন উন্নয়ন ও সেবামূলক কাজ করে থাকে।

পাকিস্তান আমল ঃ ১৯৪৭ সালে দেশ বিভাগের পরও বৃটিশ যুগে স্থানীয় সরকার পদ্ধতি যেভাবে চলতো তাতে বিকেন্দ্রীকরণ নীতির বিপুঞ্জিভূতকরণ ও ক্ষমতা বন্টন প্রক্রিয়ার বিষয়াবলী পাওয়া যায়। দেশ বিভাগের সময় তৎকালীন পূর্ব বাংলায় (যা বর্তমানে বাংলাদেশ) নিম্নোল্লিখিত স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানগুলো ছিল ঃ

১। জেলা বোর্ড ১৫টি (প্রত্যেক জেলায় একটি)
২। ইউনিয়ন বোর্ড – ৩৫৮১
৩। মিউনিসিপ্যাল বোর্ড – ৪৩

১৯৫৮ সনে তৎকালীন পাকিস্তানে জেনারেল মোঃ আইউব খান ক্ষমতায় আসার পর স্থানীয় সরকার গঠন পদ্ধতি পুনরায় ১৯২০ সনের নিয়ম অনুযায়ী প্রবর্তন করেন অর্থাৎ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও কালেক্টর পরবর্তীতে ডেপুটি কমিশনার জেলা বোর্ডের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব গ্রহণ করেন। এ সময়ের মধ্যে একটি গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা ঘটে স্থানীয় সরকারের ক্রমবিকাশে। 'কুমিল্লা পদ্ধতি'কে

অনুসরণ করে থানা কাউন্সিল গঠন করা হয় যা ইতিপূর্বে কখনো ছিল না। মহকুমা প্রশাসককে এর চেয়ারম্যান নিযুক্ত করা হয়। সীমিত আকারে এ কাউন্সিল পরিকল্পনা প্রণয়ন ও বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারতো। জেলা পরিষদ এবং ইউনিয়ন পরিষদের মত থানা কাউন্সিল কোন ট্যাক্স আদায় করতে পারতো না। প্রেসিডেন্ট আইউব খান কর্তৃক প্রবর্তিত 'মৌলিক গণতন্ত্রে' ৪টি স্তর ছিল ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল ও বিভাগীয় কাউন্সিল। মৌলিক গণতন্ত্রে একটি কাঠামোর চিত্র ৪·১ এ দেখান হলো। ১৯৬৯ সনে প্রবল আন্দোলনের মুখে আইউব খান ক্ষমতা হতে সরে দাঁড়ান এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁর প্রবর্তিত মৌলিক গণতন্ত্রেরও অবলুপ্তি ঘটে।

চিত্র ৪·১

১৯৬২ সনে তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে মৌলিক গণতন্ত্রের কাঠামো

বিভাগীয় কাউন্সিল –৪

চেয়ারম্যান	সদস্য	কমিশনার
সরকারী কর্মকর্তা ৫০% বা কম		বেসরকারী সদস্য ৫% বা তার বেশী

জেলা কাউন্সিল –১৭

চেয়ারম্যান	সদস্য	ডেপুটি কমিশনার কর্তৃক
ভাইস চেয়ারম্যান		নির্বাচিত সদস্যগণ
সরকারী কর্মকর্তা ৫০% বা কম		নির্বাচিত সদস্য
		৫০% বা বেশী

থানা কাউন্সিল –৩৯৬

চেয়ারম্যান	সদস্য	মহকুমা প্রশাসক
ভাইস চেয়ারম্যান		সার্কেল অফিসার
সরকারী কর্মকর্তা		টাউন কমিটি ও ইউ, সি'র নির্বাচিত
৫০% বা কম		চেয়ারম্যানগণ ৫০% বা বেশী

ইউনিয়ন কাউন্সিল – ৪০৩২

চেয়ারম্যান— নির্বাচিত
সদস্য – নির্বাচিত

সূত্র ঃ প্রশাসনিক পুর্নগঠন/ সংস্কার কমিটির (১৯৮২) রিপোর্ট হতে।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

বাংলাদেশ আমল ঃ ১৯৭১ সনে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ইউনিয়ন থানা ও জেলায় স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠানসমূহ বলবৎ রাখার সিদ্ধান্ত নেয় এবং গৃহীত সংবিধানেও স্থানীয় সরকারের কথা বিশেষভাবে বলা হয়। কিন্তু বাস্তবে থানা ও জেলা পর্যায়ে এর অস্তিত্ব সরকারী দলিল দস্তাবেজের মধ্যে সীমিত হয়ে যায়।

১৯৭৫ সনে দেশে সংবিধানে সংশোধন ঘটিয়ে প্রশাসনে এক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন আনার চেষ্টা করা হয়। সকল মহকুমাকে জেলা ঘোষণা করা হয় এবং প্রত্যেক জেলায় একজন করে জেলা গভর্ণর নিযুক্ত করা হয়। জেলা গভর্ণরদের মধ্যে বেশীর ভাগই ছিলেন সংসদ সদস্য, রাজনীতিবিদ এবং কিছু সংখ্যক সরকারী কর্মকর্তা। কিন্তু এ পদ্ধতি পরীক্ষিত হয়নি। ১৯৭৫ সনের ১৫ই আগষ্ট এক অভ্যুত্থানের মাধ্যমে পট পরিবর্তন হয় এবং গভর্ণর পদ্ধতি বাতিল করা হয়। অভ্যুত্থানের পর জেনারেল জিয়াউর রহমান ক্ষমতায় আসেন এবং থানা ও জেলা পরিষদ পুনঃ চালু করেন। এ সময় গ্রাম পর্যায়ে প্রতিনিধিমূলক প্রতিষ্ঠান হিসেবে 'গ্রাম সরকার' গঠন, করা হয় যার সদস্যগণ মনোনীত ছিলেন। ১৯৮১ সনে জেঃ জিয়াউর রহমানকে হত্যা করা হয়। কিন্তু স্থানীয় সরকার পদ্ধতির কোন পরিবর্তন করা হয়নি। ১৯৮২ সনের ২৪ শে মার্চ জেঃ এরশাদ অভ্যুত্থানের মাধ্যমে ক্ষমতায় আসেন এবং স্থানীয় সরকার পদ্ধতিতে এক যুগান্তকারী পরিবর্তন আনেন। দেশে ক্ষমতা বন্টন ও প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের এক ব্যাপক কর্মসূচীর সূচনা করা হয়। তৎকালীন উপ-প্রধান সামরিক আইন প্রশাসক রিয়ার এডমিরাল এম, এ খানের নেতৃত্বে গঠন করা হয় The Committee for Administrative Reorganization & Reforms, যেটির অনুসন্ধেয় বিষয় ছিল ঃ

(১) জনগণের সেবায় নিয়োজিত বেসামরিক প্রশাসনের গঠন প্রকৃতি পর্যালোচনা ও ত্রুটিসমূহ চিহ্নিত করা;

(২) ক্ষমতা বন্টন পদ্ধতির আলোকে এমন একটি কার্যকর প্রশাসনিক ব্যবস্থার সুপারিশ করা যাতে প্রশাসনকে জনগণের দোর গোড়ায় নিয়ে যাওয়া যায়।[১০] তবে এ কমিটির কার্যকারিতা সম্পর্কে কিছু বলার পূর্বে ইতিপূর্বে প্রশাসনিক পুনর্গঠনের জন্য পূর্ববর্তী সরকার কি পদক্ষেপ নিয়েছিল তা সংক্ষেপে দেখা যেতে পারে। ১৯৭১ সনের ১৬ই ডিসেম্বর বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর পরই প্রশাসনের পুনর্গঠন অনিবার্য কারণে প্রয়োজন হয়ে পড়ে। এতদিন পর্যন্ত এটি ছিল একটি প্রদেশ এবং সচিবালয় ও অন্যান্য অফিসের কর্মপদ্ধতি প্রাদেশিক ধাঁচের ছিল। কেন্দ্রীয় সরকারের কিছু কিছু অফিস ছিল। একটি সার্বভৌম দেশের জন্য যে ধরনের প্রশাসনিক কাঠামো দরকার তা ছিল না। অন্যদিকে তখন যুদ্ধ বিধ্বস্ত বাংলাদেশে ত্রাণ ও পুনর্বাসনসহ বিভিন্ন সমস্যাদি অতি জরুরী ছিল। এ সমস্ত অসুবিধাদি দূরীকরণের জন্য সুপারিশমালা পেশ করার জন্য তৎকালীন চা বোর্ডের চেয়ারম্যান জনাব মাহবুবুজ্জামান-এর নেতৃত্বে বেসামরিক প্রশাসন পুনরুদ্ধার কমিটি গঠন করা হয়। যদিও এটি একটি অন্তর্বর্তী কমিটি ছিল, তবুও সরকার এর রিপোর্ট গ্রহণ করে এবং জাতীয় সচিবালয় পুনর্গঠন করে। দ্বিতীয়তঃ বিভাগ, জেলা, মহকুমা ও থানা পর্যায়ে বেসামরিক প্রশাসন উন্নয়নের সুপারিশ গ্রহণ করে। ১৯৭২ সনের ১৫ই মার্চ রাষ্ট্রীয় নীতিমালার সাথে সংগতি রেখে প্রশাসনকে পুনর্গঠনের লক্ষ্যে একটি ব্যাপক সুপারিশমালা পেশ করার জন্য গঠন করা হয় 'চাকুরী ও প্রশাসনিক পুনর্গঠন কমিটি' যার নেতৃত্বে ছিলেন তৎকালীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের

উপাচার্য জনাব মুজাফফর আহমদ চৌধুরী। এ কমিটি প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণসহ স্থানীয় সরকার গঠন, চাকুরীর ব্যবস্থাসহ বিভিন্ন বিষয়ে একটি বিস্তারিত রিপোর্ট পেশ করে। বিভিন্ন বিষয়ের মধ্যে একটি নির্বাচিত স্থানীয় সরকারের কাছে অধিক ক্ষমতা বন্টনের জন্য সুপারিশ করেন এবং জাতীয় ও স্থানীয় সরকারসমূহের কাজের সুবিধার জন্য সুনির্দিষ্ট সীমারেখাও সুপারিশ করেন। চৌধুরী কমিটি কাজের সুবিধার্থে মহকুমা প্রশাসন উঠিয়ে দেয়ার এবং পর্যায়ক্রমে সব মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর করারও সুপারিশ করেন। শাসনতন্ত্রের ঘোষণার সঙ্গে সঙ্গতি রেখে চৌধুরী কমিটি নির্বাহী বিভাগ হতে বিচার বিভাগকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক করার জন্য সুপারিশ করেন। এ ছাড়াও এ কমিটি জেলা পর্যায়ে জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করার জন্য বলেন এবং সব উন্নয়নমূলক কাজ জেলা পরিষদের মাধ্যমে (যেখানে নির্বাচিত সদস্যরা থাকবেন) করার জন্য বলা হয়। থানা প্রশাসন সম্পর্কে চৌধুরী কমিটি মন্তব্য করেন যে, 'বাংলাদেশে প্রশাসনের মূল কেন্দ্র বিন্দু হওয়া উচিত থানা '। জেলা পরিষদের মত এখানে নির্বাচিত সদস্যগণের দায়িত্ব নেয়া উচিৎ এবং উন্নয়নমূলক কার্যাদি জাতীয় সরকারের কাছে না রেখে থানা পারিষদের কাছে হস্তান্তর করা উচিৎ। যে বিষয়গুলো হস্তান্তর করা যায় সেগুলো হলো ঃ কৃষি, পল্লী উন্নয়ণ কৌশল, পশুসম্পদ, স্বাস্থ্য, শিক্ষা ও সামাজিক শিক্ষা, শিল্প (কুটির), সমবায়, মৎস্য, পল্লী পূর্ত কর্মসূচী ও পরিবার পরিকল্পনা।

বিকেন্দ্রীকৃত প্রশাসনিক ব্যবস্থা ও উপজেলা পদ্ধতি

প্রশাসন বিকেন্দ্রীকরণের জন্য এদেশে বৃটিশ আমল হতেই বিভিন্নভাবে চেষ্টা চালানো হয়, যদিও অনেক সময় দেখা যায় এর পেছনে রাজনৈতিক বিভিন্ন কারণ কাজ করে। বাংলাদেশ সৃষ্টি হওয়ার পর প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের মূল সুপারিশ পাওয়া যায় চৌধুরী কমিটির রিপোর্টে। সেখানে নির্বাচিত পরিষদের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা হয়েছে, বিশেষ করে জেলা পরিষদকে শক্তিশালী করার কথা বলা হয়েছে। এতে আরো বলা হয়েছে 'বাংলাদেশে প্রশাসনের মূল কেন্দ্রবিন্দু হওয়া উচিৎ থানা' এবং কি কি বিষয়ের উপর থানা পরিষদের কর্তৃত্ব থাকবে তাও সুপারিশমালায় বলা হয়েছে।

প্রশাসনিক অসামঞ্জস্যতা

এডমিরাল খান কমিটি তাঁদেরকে দেয় শর্ত মোতাবেক ব্যাপক বিষয়াদির পরীক্ষা নিরীক্ষা করেন। এ সময় তাঁরা ইতিপূর্বে বিভিন্ন সময়ে গঠিত বিভিন্ন কমিটির রিপোর্ট পরীক্ষাসহ দেশের বিভিন্ন অঞ্চল পরিদর্শন করেন এবং সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিবর্গ ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে আলোচনা করেন। প্রশাসনিক ক্ষেত্রে কমিটি যে অসামঞ্জস্যতা দেখেন তা নিম্নরূপ ঃ

- ক) সরকারী চাকুরীতে নিয়োগ, পদোন্নতি ও প্রশিক্ষণের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে ব্যাপক পার্থক্য ;
- খ) তদবীরের উপর ভিত্তি করে প্রায়ই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয় ;
- গ) সরকারী কাজের বিভাজন ও সরকারী সিদ্ধান্তের জটিলতা সাধারণ মানুষের পক্ষে বুঝে উঠা কষ্টসাধ্য ব্যাপার

ঘ) সঠিক ও সামঞ্জস্যপূর্ণ জনকল্যাণমুখী নীতি নির্ধারণের জন্য স্থায়ী রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার অভাব ;
ঙ) সঠিক রাজনৈতিক নির্দেশনার অভাবে দূর্বল স্থানীয় সরকার আরো দূর্বলতর হয়েছে ;
চ) বিভিন্ন পর্যায়ে প্রচলিত প্রশাসনিক ও প্রতিনিধিত্বমূলক প্রতিষ্ঠানগুলোকে দূর্বল করা হয়েছে ;
ছ) সমসাময়িক রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান সৃষ্টি করে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত করা হয়েছে;
জ) স্থানীয় পর্যায়ে ক্ষমতা বন্টনে রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের অনীহা।

কমিটির সুপারিশমালা

বিভিন্ন বিষয়াদি পর্যালোচনার পর কমিটি যে রিপোর্ট পেশ করেন তার উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলো হলো ঃ

ক) ইউনিয়ন, থানা ও জেলা পর্যায়ে নির্বাচিত পরিষদ থাকবে ;
খ) ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানগণ থানা পরিষদের সদস্য থাকবেন এবং একই ভাবে থানা পরিষদের চেয়ারম্যানগণ জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান থাকবেন।
গ) উল্লিখিত পর্যায়ের সরকারী কর্মকর্তাগণ সংশ্লিষ্ট পর্যায়ের পরিষদের সভায় যোগদান করবেন ও আলোচনায় অংশগ্রহণ করবেন ;
ঘ) প্রত্যেক পরিষদকে কর্মকর্তা দ্বারা সমর্থন দিতে হবে ;
ঙ) প্রত্যেক কর্মকর্তা যাতে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের কাছে তার কাজের জন্য দায়ী থাকতে পারেন তার ব্যবস্থা করতে হবে ;
চ) একটি নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে নিয়ামক বিষয়াদিও যাতে স্থানীয় পরিষদের নিয়ন্ত্রনে আসে তার ব্যবস্থা করতে হবে ;
ছ) গ্রাম্য আদালতের ফলপ্রসূতা আরো জোরদার করতে হবে ;
জ) সব মহকুমাকে জেলায় রূপান্তর ও সব বিভাগের অবলুপ্তি করতে হবে ;
ঝ) থানা পর্যায়ের সব কমিটি বাদ দিয়ে যখন প্রয়োজন তখন ভিত্তিতে কমিটি গঠন করা যেতে পারে ;
ঞ) জেলা ও থানা পরিষদগুলো পুলিশসহ নিয়ামক বিষয়াদি যাতে দেখতে পারে তার ব্যবস্থা করতে হবে ;
ট) জেলা থানায় সুবিধাদি সৃষ্টি না হওয়া পর্যন্ত মহকুমা সদরে ম্যাজিস্ট্রেসি চালানো যেতে পারে। এ ছাড়াও কমিটি মনে করে যে প্রশাসনের মূল কেন্দ্র হওয়া উচিৎ থানা। কমিটি দৃঢ়ভাবে মত প্রকাশ করে যে ক্ষমতা অর্পনকে অর্থবহ করতে হলে অবশ্যই নির্বাচিত প্রতিনিধি থাকতে হবে এবং সত্যিকার অর্থে দারিদ্র্য বিমোচন করতে হলে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রতিনিধিত্বের মাধ্যমে গণঅংশায়ন নিশ্চিত করতে হবে। তা ছাড়াও কমিটির মতে যেটা প্রয়োজন হবে তা হলো সত্যিকারভাবে গ্রামের মানুষকে সেবা করবে এ ধরনের মনোভাবাপন্ন কর্মচারী।

লক্ষ্যনীয় যে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ বিষয়ে চৌধুরী কমিটির দৃষ্টিভঙ্গির সাথে এডমিরাল খান কমিটির দৃষ্টিভঙ্গির তেমন একটা পার্থক্য দেখা যায় না। উভয় কমিটিই প্রশাসনের মূল কেন্দ্রবিন্দু

থানাই হওয়া উচিৎ বলে চিহ্নিত করে। এডমিরাল খান কমিটির মতামতের উপর ভিত্তি করে প্রশাসনকে জনগণের কাছাকাছি নিয়ে যাওয়ার লক্ষ্যে সরকার বেশ কয়েকটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন, যার মধ্যে বেশী জোর দেয়া হয়েছেঃ

(১) ক্ষমতা অর্পন প্রক্রিয়ায় যতবেশী সম্ভব কেন্দ্রীয় সরকারের দায়িত্বসমূহ স্থানীয় সংস্থাসমূহকে কার্যকরভাবে পালন করার সুযোগ দিতে হবে। এবং

(২) কেন্দ্রীয় সরকার কর্তৃক সংরক্ষিত বিষয়াদির বেলায় নিম্ন পর্যায়ে কর্মকর্তাদের আরো বেশী ক্ষমতা দিতে হবে।

এ প্রেক্ষিতে মাঠ পর্যায়ের প্রশাসনের উপর সরকার দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন। আগে মাঠ পর্যায়ে ৪ স্তর বিশিষ্ট প্রশাসন ব্যবস্থা ছিল যেমন ৪টি বিভাগ ২২টি জেলা, ৭১ টি মহকুমা এবং ৪৯৫টি থানা। এ ছাড়া ইউনিয়ন পর্যায়ে ইউনিয়ন পরিষদ ছিল। নিম্নে প্রশাসনের বিভিন্ন স্তর এবং পাশাপাশি উক্ত পর্যায়ে প্রতিনিধিত্বকারী সংস্থার রূপ দেখানো হলোঃ

চিত্র ৫·১
১৯৮২ সনের পূর্বে প্রশাসনিক স্তর

রাজধানী	সচিবালয় বিভাগীয় সদর দপ্তরসমূহ
বিভাগ	বিভাগীয় কমিশনার বিভাগীয় পর্যায়ের দপ্তরসমূহ
জেলা	জেলা প্রশাসক জেলা পর্যায়ের দপ্তরসমূহ জেলা পরিষদ
মহকুমা	মহকুমা প্রশাসক মহকুমা পর্যায়ের দপ্তরসমূহ
থানা	সহকারী কমিশনার থানা পর্যায়ের দপ্তরসমূহ থানা পরিষদ
ইউনিয়ন	ইউনিয়ন পর্যায়ের কর্মকর্তাগণ ইউনিয়ন পরিষদ

সূত্রঃ Report of the Committee for Adiministrative Reorganisation & Reforms পৃঃ ৫৬

LIBRARY

প্রশাসনের স্তর কমানোর লক্ষ্যে সরকার মহকুমাকে বাদ দিয়ে প্রায় সকল মহকুমাকে জেলায় উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিছু কিছু মহকুমাকে পার্শ্ববর্তী জেলার সঙ্গে এবং কিছু থানাকে পার্শ্ববর্তী থানার সঙ্গে একীভূত করা হয়। এভাবে ৬৪টি মহকুমাকে জেলা এবং ৪৬০টি থানাকে উপজেলা হিসেবে সৃষ্টি করা হয়। প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ায় এভাবে সৃষ্টি হলো উপজেলা যাকে প্রশাসনের কেন্দ্রবিন্দু হিসেবে ধরা হয়।

জেলা পরিষদ

উপজেলা প্রশাসন সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনার পূর্বে নব সৃষ্ট জেলা পরিষদ সম্পর্কে কিছু বলা যেতে পারে। বাংলাদেশে ১৯৭৬ সনের পর যদিও জেলা প্রশাসককে চেয়ারম্যান করে এবং অন্যান্য সরকারী কর্মকর্তা সমন্বয়ে জেলা পরিষদের কাজ চালানো হচ্ছিল, ১৯৮২ সনে পট পরিবর্তনের পর জেলা পরিষদের অস্তিত্ব নামে মাত্রই ছিল। এ সময় এর কোন ভূমিকা ছিল না। এডমিরাল খান কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী সরকার জেলা পরিষদ গঠনকল্পে ১৯৮৬ সনে ৩য় সংসদে একটি বিল আনয়ন করেন, কিন্তু বিরোধী দলের আপত্তির জন্য তা কার্যকর করা হয়নি। তবে ৪র্থ সংসদে জেলা পরিষদ বিল পাশ করা হয় যা ১৯৮৮ সনের ২৯ নং আইন হিসেবে পরিচিত। উক্ত আইনের ৪ নং ধারা মোতাবেক জেলা পরিষদের গঠন প্রক্রিয়ায় ৪ ধরনের সদস্যের কথা বলা হয়েছে যেমন ঃ (ক) প্রতিনিধি সদস্য, (খ) মনোনীত সদস্য, (গ) মহিলা সদস্য এবং (ঘ) কর্মকর্তা সদস্য। সরকার কর্তৃক জেলা পরিষদের চেয়ারম্যান মনোনীত করার বিধান রাখা হয়েছে! ইতোমধ্যে ৬৪টি জেলায় চেয়ারম্যান নিয়োগ করা হয়েছে এবং ১২ই অক্টোবর ১৯৮৮ হতে তাঁরা দায়িত্ব পালন আরম্ভ করেন। এর ফলে জেলা পর্যায়ে ক্ষমতা বন্টনের আর একটা দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

উপজেলা পর্যায়ে প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে শুধু যে কেন্দ্রীয় সরকার ও স্থানীয় সরকারের কর্মকর্তাদের উপর বেশী ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব অর্পন করা হয়েছে তা নয় বরং উপজেলা পর্যায়ে ঃ

(১) আরো অফিস সৃষ্টি করা হয়েছে;
(২) কর্মকর্তাদের মর্যাদা উন্নত করা হয়েছে;
(৩) উপজেলা পর্যায়ে ভৌত সুবিধাদির উন্নয়ন ত্বরান্বিত করা হয়েছে; এবং
(৪) উপজেলায় সরাসরিভাবে অধিক তহবিল দেয়া হচ্ছে।

১৯৮২ সনের ২৩ শে অক্টোবর সরকার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন তা হচ্ছে থানা গুলোকে উন্নীত করে উপজেলা সৃষ্টি করা। এ সিদ্ধান্তই হচ্ছে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়ার ধারনা ও কার্যকরিতার আসল ভিত্তি। স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা প্রশাসন পুনর্গঠন) অধ্যাদেশ ১৯৮২ উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের আইনগত কাঠামোর নির্দেশনা দেয়।

সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত বিষয়সমূহ

১৯৮২ সনের ২৩ শে অক্টোবর উপজেলা পর্যায়ে সরকারের কার্যাবলীকে দু'ভাগে বিভক্ত করা হয়, একটি সংরক্ষিত ও অপরটি হস্তান্তরিত তালিকা। ১৩টি বিষয়কে সংরক্ষিত ও ১০টিকে

হস্তান্তরিত বিষয় হিসেবে তালিকাভূক্ত করা হয়। কি কি বিষয় কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সংরক্ষিত রাখা হয়েছে এবং কি কি বিষয় হস্তান্তর করা হয়েছে তার একটা তালিকা নিম্নে দেয়া হলো ঃ

সংরক্ষিত বিষয়াদি	**হস্তান্তরিত বিষয়াদি**
১। আইন, শৃঙ্খলা সংরক্ষন ;	১। কৃষি ও কৃষি সম্প্রসারণ, বীজ, সার ইত্যাদি সরবরাহ ও সেচ ;
২। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ;	২। প্রাথমিক শিক্ষা ;
৩। আয়কর, আবগারী শুল্ক, ভূমি উন্নয়ন কর ইত্যাদির ন্যায় কেন্দ্রীয় রাজস্ব আয়ের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ;	৩। উপজেলা স্বাস্থ্য কেন্দ্রসহ স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা দাতব্য চিকিৎসা ও জন্ম নিয়ন্ত্রনের সব কার্যাদি ;
৪। প্রয়োজনীয় সরবরাহের সংরক্ষণ ;	৪। পল্লী পানি সরবরাহ ও স্বাস্থ্য রক্ষা কর্মসূচী ;
৫। বৃহদাকারের শিল্প কারখানা ;	৫। পল্লী পূর্ত কর্মসূচী
৬। একাধিক জেলার সঙ্গে সংযুক্ত বৃহদাকারের সেচ প্রকল্প ;	৬। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ;
৭। খনি ও খনিজ সম্পদের উন্নয়ন ;	৭। ভি জি এফ এবং আই জি এফ সহ ত্রান কার্যাদি ;
৮। বিদ্যুৎ সরবরাহ ;	৮। সমবায় ও সমবায় ভিত্তিক পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচী ;
৯। কারিগরি শিক্ষা ও প্রাথমিক পর্যায়ের উপরের সব শিক্ষা ;	৯। মৎস্য উন্নয়ন ;
১০। আধুনিক জেলা হাসপাতাল ও মেডিক্যাল কলেজের সহিত সংযুক্ত হাসপাতালসমূহ ;	১০। পশুসম্পদ উন্নয়ন ;
১১। আন্তঃ জেলা ও আন্তঃ উপজেলা যোগাযোগ ব্যবস্থা ;	
১২। বন্যা নিয়ন্ত্রন ও পানি সম্পদের উন্নয়ন ;	
১৩। জাতীয় পরিসংখ্যান ;	

উপরোক্ত তালিকা হতে দেখা যায় স্থানীয় উন্নয়নমূলক কার্যাদি উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করা হয়েছে এবং বৃহদাকারের জাতীয় উন্নয়নমূলক কাজ ও নিয়ন্ত্রনমূলক কার্যাদি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে রেখে দেয়া হয়। এ উপজেলা প্রশাসনের কাঠামো চিত্র ৫.২ –তে প্রদর্শিত হলো।

চিত্র ৫.২

উপজেলা প্রশাসনিক কাঠামো

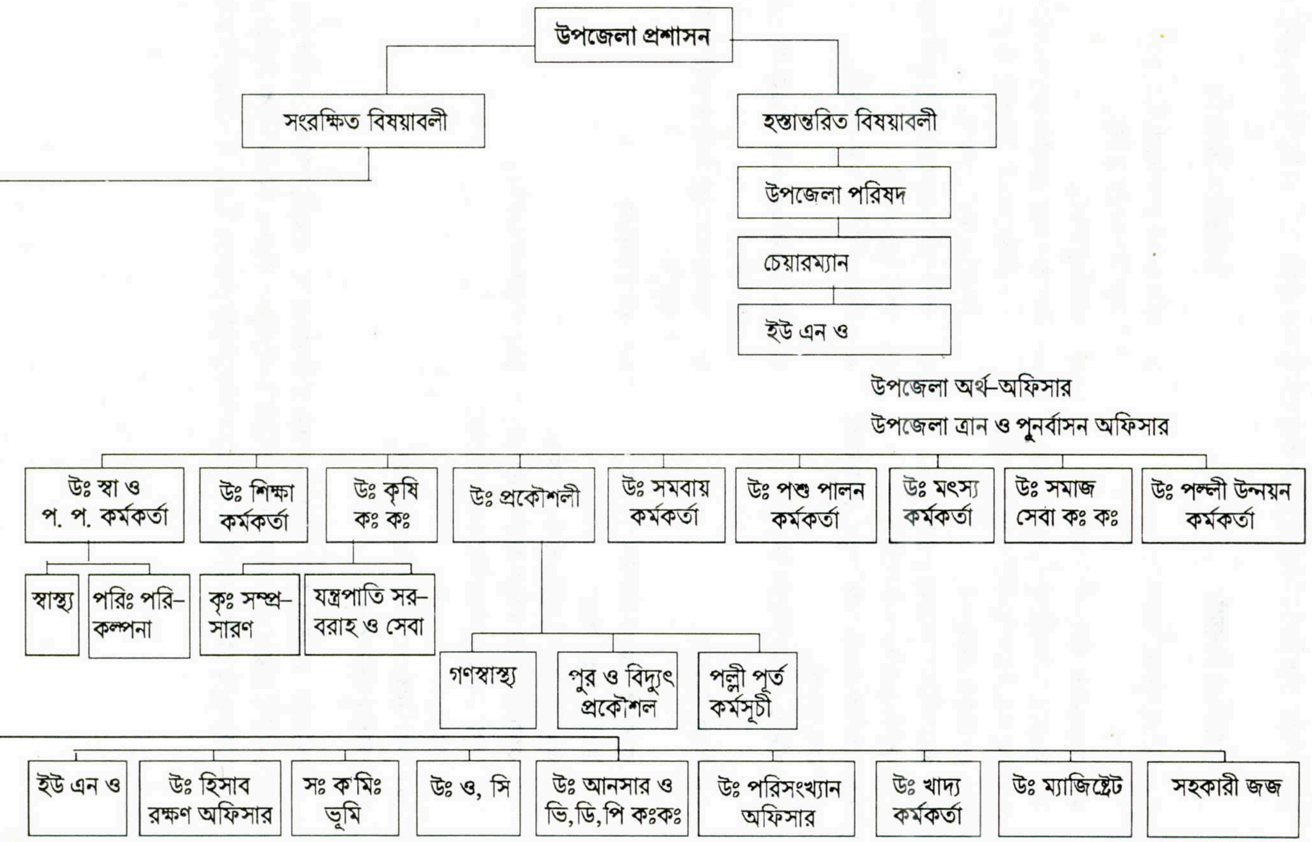

সূত্র ঃ ফয়েজ উল্লাহ ঃ Development of Local Govt. in Bangladesh

বিকেন্দ্রীকৃত সংস্থার কর্মকর্তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি ও আদালত সৃষ্টি

সরকার প্রায় সকল স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কার্যাদি উপজেলা পরিষদের কাছে হস্তান্তর করার সাথে সাথে উপজেলা পর্যায়ে কেন্দ্রীয় সরকারের কর্মকর্তাদের কাজের সুবিধার জন্য উন্নয়নের স্বার্থে তাদের ক্ষমতা বৃদ্ধি করেন যাতে তাদেরকে কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে সব বিষয়ে নির্দেশ বা সিদ্ধান্তের জন্য অযথা নির্ভর করতে না হয়। এজন্য কিছু নতুন অফিসও খোলা হয়, যেমন (১) উপজেলা ট্রেজারী (২) উপজেলা হিসাবরক্ষণ অফিস (৩) পি এল হিসাবের প্রবর্তন। পি এল হিসাব খোলার ফলে উপজেলা পরিষদকে জেলা অফিস বা কারো জন্য তহবিলের ব্যবস্থাপনার জন্য অপেক্ষা করতে হয় না। উপজেলা পর্যায়ে দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সৃষ্টি করা হয় এবং সহকারী জজ ও ম্যাজিস্ট্রেটগণ নির্বাহী বিভাগের নিয়ন্ত্রণের বাইরে থেকে স্বাধীনভাবে কাজ করার সুযোগ পান। এর ফলে জনগণের দোরগোড়ায় বিচার ব্যবস্থাকে নিয়ে আসা হয়। পল্লীর সাধারণ মানুষকে এখন সাধারণ মামলার জন্য দূরদূরান্তে যেতে হয় না।

প্রকল্প অনুমোদনের ক্ষমতা ও তহবিল সংকুলান

উপজেলা পর্যায়ে স্থানীয় সরকারের কার্যক্রম বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন আনা হয়। ঊর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক কোন প্রকল্প অনুমোদনের জন্য উপজেলা পরিষদকে অপেক্ষা বা নির্ভর করতে হয় না। এখন উপজেলা পরিষদ নিজেই প্রকল্প তৈরী ও বাস্তবায়ন করে। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণের ফলে উন্নয়নমূলক কার্যক্রম বাস্তবায়নের জন্য প্রচুর অর্থ, জনসম্পদ ও অন্যান্য সমর্থনসূচক বিষয়াদির প্রয়োজন হচ্ছে। এ অসুবিধাদি দূরীকরণের জন্য অবশ্য কেন্দ্রীয় সরকার বিভিন্নভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করছে। বার্ষিক উন্নয়ন কার্যক্রমের আওতায় কেন্দ্রীয় সরকার প্রত্যেক উপজেলা পরিষদকে উল্লেখযোগ্য তহবিল দিয়ে থাকেন। এছাড়া পরিষদ যাতে নিজেদের তহবিল সৃষ্টি করতে পারে তার জন্য বিধান রাখা হয়েছে। সংরক্ষিত বিষয়ের ক্ষেত্রেও পূর্বের চেয়ে এখন বেশী পরিমাণ টাকা বরাদ্দ করা। সরকার হতে প্রাপ্ত তহবিল দিয়ে পরিষদ উন্নয়নমূলক কার্যাদি সম্পাদন করেন এবং নিজেদের সৃষ্ট তহবিল দিয়ে দৈনন্দিন খরচাদি সংকুলান করেন।

দক্ষ অর্থ ব্যবস্থাপনার জন্য সব সূত্র হতে প্রাপ্ত তহবিলকে একীভূত করে পরিষদ তহবিল গঠন করা হয় এবং পরিষদ বাজেট প্রণয়নের মাধ্যমে এ তহবিল ব্যবহার করতে পারে। পরিষদের বাজেট দু'ভাগে ভাগ করা হয়– একটি রাজস্ব বাজেট এবং অপরটি উন্নয়ন বাজেট। বার্ষিক উন্নয়ন পরিকল্পনা মোতাবেক উন্নয়ন বাজেটের টাকা খরচ করা হয়। উল্লেখ্য, প্রত্যেক উপজেলা পরিষদের পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা আছে যা স্থানীয় চাহিদার উপর ভিত্তি করে প্রণীত হয়।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

বার্ষিক উন্নয়ন কর্মসূচী বাস্তবায়নের সুবিধার্থে কেন্দ্রীয় সরকার উপজেলা পরিষদগুলোকে প্রতিবৎসর জাতীয় বাজেটের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল হতে দিয়ে থাকে। এ পর্যন্ত এক্ষেত্রে যে টাকা বরাদ্দ করা হয় তা নিম্নরূপ ঃ

১৯৮২–৮৩	টাকা	১৩০০	মিলিয়ন
১৯৮৩–৮৪	,,	১৭০৯·৫	,,
১৯৮৪–৮৫	,,	২০০০	,,
১৯৮৫–৮৬	,,	২০০০	,,
১৯৮৬–৮৭	,,	১৬০০	,,
১৯৮৭–৮৮	,,	২০০০	,,
১৯৮৮–৮৯	,,	১৭০০	,,
	মোট	১২৩০৯·৫	,,

এছাড়া সরকার প্রাথমিক অবস্থায় প্রত্যেক উপজেলা পরিষদকে উপজেলার অফিস ও আবাসিক সুবিধাদির উন্নয়নের জন্য এক সাথে ৫ লক্ষ টাকা বরাদ্দ করেন। উন্নয়নমূলক কার্যাদি তদারক করার জন্য প্রত্যেক উপজেলা পরিষদকে একটি গাড়ী/নৌযান দেয়া হয়।

বহু উপজেলা আছে যেখানে আবাসিক সুবিধাদি খুবই কম বা নেই বললেই চলে। উপজেলায় ভৌত সুবিধাদি উন্নয়ন ও নির্মাণের জন্য সরকার উন্নয়ন সহায়ক তহবিলের পাশপাশি কাঠামো নির্মাণ/উন্নয়ন তহবিল উপজেলা পরিষদের কাছে দিয়ে থাকেন এখাতে ১৯৮২–৮৩ হতে ১৯৮৬–৮৭ পর্যন্ত নিম্নলিখিত হারে অর্থ বরাদ্দ করা হয় ঃ

১৯৮২–৮৩	টাকা	১৪০০	মিলিয়ন
১৯৮৩–৮৪	,,	১৭২৩	,,
১৯৮৪–৮৫	,,	২২৩০	,,
১৯৮৫–৮৬	,,	২২৫০	,,
১৯৮৬–৮৭	,,	১৭৫০	,,
	মোট	৯৩৫৩	,,

উল্লেখ্য, এ খাত হতে ১৯৮৪–৮৫, ১৯৮৫–৮৬ এবং ১৯৮৬–৮৭ অর্থ বছরে নব সৃষ্ট জেলা সদরের অবকাঠামো নির্মাণের জন্য কিছু টাকা ব্যবহার করা হয়।

উপজেলা পরিষদের কর্মী কাঠামো

স্থানীয় সরকারী সংস্থা হিসেবে এর প্রতি যোগ্য ও অভিজ্ঞ কর্মকর্তাগণ আকৃষ্ট হবে না–এটা বিবেচনা করে সরকার তার নিজস্ব কর্মকর্তাগণকে পরিষদের কাছে ন্যস্ত করেন। ১৯৮২ সনের ২০শে অক্টোবরের কার্যক্রম অনুযায়ী সকল হস্তান্তরিত বিষয়ের কর্মকর্তা/কর্মচারী পরিষদের নিকট

ন্যস্ত হয় এবং মূলতঃ ১৯৮৫ সনের ১লা জুনের মধ্যে কর্মকর্তা/কর্মচারী হস্তান্তরের প্রক্রিয়া সমাপ্ত হয়।

উপজেলা পরিষদের কর্মকর্তা কর্মচারীর ধরনের ক্ষেত্রে একটা বিশেষ বৈশিষ্ট্য হচ্ছে এর একটা প্রকৌশল বিভাগ। প্রকৌশল বিভাগের প্রধান হচ্ছে একজন সহকারী প্রকৌশলী বা অন্ততঃ পক্ষে ১২ বছরের অভিজ্ঞতা সম্পন্ন একজন ডিপ্লোমা প্রকৌশলী। উপজেলা পর্যায়ের সকল কারিগরি কর্মকর্তা এ বিভাগের আওতায় থাকবেন, যদিও বিশেষ ধরনের কর্মসূচীর বিভাগীয় কর্মকর্তাগণ নিজস্ব পরিচয়ও বজায় রাখতে পারবেন—যেমন পল্লী পানি সরবরাহ, পল্লী পূর্ত কর্মসূচী ইত্যাদি।

উপজেলা পরিষদের প্রধান নির্বাহী হচ্ছেন চেয়ারম্যান, যাকে বিভিন্ন কাজে সহায়তা করার জন্য কেন্দ্রীয় সরকার একজন দক্ষ কর্মকর্তা নিয়োগ করেন। ইউ এন ও প্রশাসন ক্যাডারের কর্মকর্তা। ইউ এন ও তাঁর পেশাগত দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা দিয়ে চেয়ারম্যানকে সাহায্য করেন। সাথে সাথে ইউ এন ও কেন্দ্রীয় সরকারের বিভিন্ন দপ্তরগুলোর মধ্যেও সমন্বয় সাধন করে থাকেন। আবার কিছু দপ্তর আছে যা সরাসরি ইউ এন ও এর নিয়ন্ত্রণে, যেমন ভূমি প্রশাসন ব্যবস্থা।

উপজেলা পর্যায়ের সকল কার্যক্রমের সমন্বয় সাধন করার জন্য উপজেলা পরিষদকে ক্ষমতা দেয়া হয়েছে। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার বিভাগ ব্যতীত অন্য সকল সংরক্ষিত বিষয়ের কর্মকর্তাগণকে উপজেলা পরিষদের নিকট 'জবাবদিহি' করতে হয় অর্থাৎ তাদের কোন কার্যক্রমের উপর উপজেলা পরিষদ প্রতিবেদন চাইলে তারা তা দিতে বাধ্য থাকেন। অপর দিকে হস্তান্তরিত বিষয়ের ক্ষেত্রে সকল কর্মকর্তা উপজেলা পরিষদের কাছে শুধু জবাবদিহিই করতে হয় না সংগে সংগে হিসাব নিকাশের জন্যও দায়ী থাকেন। সুতরাং এক্ষেত্রে উপজেলা পরিষদকে ব্যাপক ক্ষমতা দেয়া হয়েছে।

উপজেলা পরিষদের গঠন প্রকৃতি

নির্বাচিত, প্রতিনিধিত্বমূলক, মনোনীত এবং কারিগরি ও পেশাগত সদস্য নিয়ে উপজেলা পরিষদ গঠিত। পরিষদের চেয়ারম্যান স্বয়ং প্রাপ্তবয়স্কদের সরাসরি ভোটে নির্বাচিত হয়ে থাকেন। প্রতিনিধি সদস্যরা হচ্ছে জনগণ কর্তৃক নির্বাচিত ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানবৃন্দ, উপজেলা কেন্দ্রীয় সমবায় সমিতির চেয়ারম্যান পদাধিকার বলে সদস্য ; সংশ্লিষ্ট উপজেলায় বসবাসরত মহিলাদের মধ্য হতে তিনজন মহিলা সদস্য ও পুরুষদের মধ্য হতে একজন পুরুষ সদস্য যাদেরকে সরকার মনোনয়ন দিয়ে থাকেন। এছাড়া উন্নয়নমূলক কাজের সংগে সংশ্লিষ্ট আছেন এমন সব উপজেলা কর্মকর্তাবৃন্দ পরিষদের সদস্য হয়ে থাকেন। কর্মকর্তা সদস্যগণ পরিষদের সভায় আলোচনায় অংশগ্রহণ করতে পারেন কিন্তু ভোট দিতে পারেন না।

নির্দেশনা কর্তৃপক্ষ ও নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষের অবলুপ্তিসাধন

ইতোপূর্বে স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলো সাধরণতঃ আমলাগণ কর্তৃক বিভিন্ন ভাবে নিয়ন্ত্রিত হতো ; ফলে অনেক সময় এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা যেতো। স্থানীয় সরকার সংস্থাগুলোর বিকাশ

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

সাধনে এটা একটা বাঁধা স্বরূপ ছিল। উপজেলা পদ্ধতিতে এর অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। বর্তমানে উপজেলা পরিষদের নির্দেশনা কর্তৃপক্ষ বা 'নিয়ন্ত্রনকারী কর্তৃপক্ষ' বলতে কিছু নেই। একটা স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা হিসেবে পরিষদ তার সব কর্মকাণ্ড নিজেই নিয়ন্ত্রন করে। পরিষদ আমলা নির্ভর নয় এমনকি সরকারী সহায়তা তহবিলের ক্ষেত্রেও আমলাদের কোন নিয়ন্ত্রন নেই। কেন্দ্রীয় সরকারের সংগে তার সম্পর্ক কার্যাদির বিষয়ে খবরাখবর নেয়া, মূল্যায়ন, পরিদর্শন, কারিগরি উপদেশ প্রদান ও প্রশিক্ষণের মধ্যেই সীমাবদ্ধ।

জাতীয় পরিকল্পনা, কর্মসূচী ও অগ্রাধিকারের সংগে সংগতি রেখে যাতে উপজেলা পরিষদগুলো তাদের পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন এবং প্রকল্প তৈরীর সময় খাতওয়ারী বরাদ্দ সঠিকভাবে পালন করেন তার জন্য পরিকল্পনা কমিশন পরিষদকে উপদেশ দিয়ে থাকেন। এ উপদেশমালার বিশেষ দিক হচ্ছে ঃ

(ক) উপজেলা পরিষদগুলো যাতে জাতীয় অগ্রাধিকারের সংগে সংগতি রেখে উন্নয়ন সহায়ক তহবিল দ্বারা উৎপাদনমুখী প্রকল্প গ্রহণ করে ;

(খ) উপজেলা পরিষদ যাতে পরিকল্পনা ও আর্থিক শৃংখলা বজায় রেখে গণতান্ত্রিক উপায়ে উন্নয়ন প্রকল্প গ্রহণ করে ;

(গ) উপজেলা পরিষদ যাতে সঠিক প্রকল্প গ্রহণ করে ও প্রয়োজনীয় প্রকল্প বাদ না দিয়ে কম গুরুত্বপূর্ণ প্রকল্পের প্রতি উৎসাহ কম দেখায় ;

(ঘ) যাতে প্রকল্প প্রণয়নের সময় জনসংখ্যা, এলাকা, অনগ্রসরতা, পূর্ববর্তী সময়ে সফলতা ও ব্যর্থতা ইত্যাদি দেখে প্রকল্প নেয়া হয় তার নিশ্চয়তা বিধান করা ;

(ঙ) স্থানীয়ভাবে তহবিল গঠন করে তা রক্ষনাবেক্ষণ কাজে খরচ করার জন্য উপদেশ প্রদান ইত্যাদি।

উপজেলার বিভিন্ন ক্ষেত্রে বিকেন্দ্রীকরণের প্রভাব ঃ একটি বিশ্লেষণ

উপজেলা পর্যায়ে উন্নয়ন প্রশাসনের বিকেন্দ্রীকরণের ফলে স্থানীয় পর্যায়ের অনেক কার্যক্রম/প্রকল্প সফলভাবে বাস্তবায়িত হয়েছে। এ ধরনের কার্যক্রমের মধ্যে রয়েছে জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রন, প্রাথমিক শিক্ষা, নিবিড় চাষাবাদ ও সেচ ; সমাজ সেবা, পল্লী পূর্ত কর্মসূচী এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণ।

যেহেতু প্রশাসন প্রকল্পগুলোর খুব কাছাকাছি অবস্থান করছে তাই প্রকল্পের গুণাগুন পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে পরীক্ষা করা যায় এমনকি বাস্তবায়নের সময়ও দোষত্রুটি দূর করা যায়। অধিকন্ত এতে জনগণের আগ্রহ দেখা যায় ও প্রকল্পে গণ অংশায়ন সম্ভবপর হয়ে থাকে। বহু প্রকল্প আছে যেগুলোর সফল বাস্তবায়ন, স্থায়ীত্ব ও রক্ষণাবেক্ষণ অনেকাংশে বাস্তবায়ন পর্যায়ে গণ অংশায়নের উপর নির্ভর করে।

এছাড়া, প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরন ও উন্নয়নমূলক কাজের ব্যাপকতার ফলে গ্রাম হতে শহরের দিকে ধাবমান লোকের সংখ্যা অনেকাংশে কমেছে। ইতিপূর্বে সকল উন্নয়ন কর্মসূচীই শহর কেন্দ্রিক ছিল, ফলে কর্মজীবি জনগণ শহরের দিকে ধাবিত হতো কিন্তু এখন উপজেলা পর্যায়ে

ব্যাপক উন্নয়ন তৎপরতা চলছে এবং কর্মসংস্থানেরও সৃষ্টি হচ্ছে বলে শহরের প্রতি আকর্ষণ ধীরে ধীরে হ্রাস পাচ্ছে। অন্যদিকে শহর ভিত্তিক অনেক কর্মকর্তাও কার্যোপলক্ষ্যে উপজেলায় যাচ্ছেন। এর ফলে শহরগুলো হতে চাপ অনেকাংশে কমেছে।

যেহেতু বিকেন্দ্রীকরণের ফলে বর্তমানে বহু উন্নয়নমূলক কার্যক্রম উপজেলা পর্যায়ে গ্রহণ ও বাস্তবায়ন হয় তাই জাতীয় সরকারের এদিকে অযথা সময় ব্যয় করতে হয় না। জাতীয় সরকার এখন অধিক গুরুত্ব সহকারে জাতীয় সমস্যাদির প্রতি লক্ষ্য রাখতে পারেন।

প্রেসিডেন্ট আইয়ুব খান বিকেন্দ্রীকরণের নামে চালু করেন মৌলিক গণতন্ত্র এবং এ প্রক্রিয়ায় চার স্তর বিশিষ্ট স্থানীয় সরকার ছিল— যেমন ঃ ইউনিয়ন কাউন্সিল, থানা কাউন্সিল, জেলা কাউন্সিল এবং বিভাগীয় কাউন্সিল। এখানে আমরা একটা স্তর থানা কাউন্সিল বা থানা পরিষদ পাই (বর্তমানে থানাকে উপজেলা বলা হয়)। পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যদিও গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার নামে এ কাউন্সিলগুলো সৃষ্টি করা হয়েছিল, কিন্তু মূল উদ্দেশ্য ছিল রাজনৈতিক। তৎকালীন সরকারের কর্মসূচীর পক্ষে রাজনৈতিক সমর্থন আদায় করাই ছিল এর উদ্দেশ্য। ডায়না কনিয়ার্স যথার্থই বলেছেন বিকেন্দ্রীকরণের দু'ধরনের লক্ষ্য থাকে, একটা প্রকাশ্যে বলা হয়ে থাকে এবং অপরটা প্রচ্ছন্নভাবে যা মূলতঃ রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে।

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে এখন পর্যন্ত সময়কে তিন ভাগে ভাগ করা যায়। স্বাধীনতা লাভের সময় হতে ১৯৭৫ সালের ১৫ই আগষ্ট অর্থাৎ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতায় পট পরিবর্তনের সময়কে ১ম ভাগ ; পট পরিবর্তনের পর হতে ১৯৮২ সনের ২৪শে মার্চ পর্যন্ত ২য় ভাগ এবং ২৪শে মার্চ হতে এখন পর্যন্ত সময়কে ৩য় ভাগে ভাগ করা যায়। ১ম ভাগের সময়টি ছিল মূলতঃ যুদ্ধোত্তর দেশে পুনর্বাসনের সময়। কোন্ ধারায় রাষ্ট্র পরিচালিত হবে তা-ই তখন একটা মূল প্রশ্ন ছিল। আমাদের দেশে প্রথমে রাষ্ট্রপতি শাসিত সরকার তারপর সংসদীয় গণতন্ত্র আবার রাষ্ট্রপতি শাসিত এক দলীয় সরকার ইত্যাদি পদ্ধতিগুলো পরীক্ষা নিরীক্ষা করা হয়েছিল। কিন্তু বিকেন্দ্রীকরণের ক্ষেত্রে যে পদক্ষেপ নেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে তা পরীক্ষিত হবার আগেই অবলুপ্ত হয়। ১৯৭৬ হতে ১৯৮২ পর্যন্ত সময়ে কোন উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটেনি। তবে পাকিস্তান আমলের ধাচে জেলা কাউন্সিল ও থানা কাউন্সিল পুনঃ করা হয় যার নেতৃত্বে সরকারী আমলা অর্থাৎ জেলা প্রশাসক এবং মহকুমা প্রশাসক ছিলেন। ঐ সময় (১৯৭৬-৮২) সমূহের মধ্যে সম্পর্ক কিভাবে স্থাপন করা হতো তা চিত্র ৬.১ এ দেখান হলো। বুঝতে অসুবিধা হয় না যে সাধারণ মানুষের জন্য এটা একটা সহজ পদ্ধতি ছিল না। এ পদ্ধতিকে কিভাবে আরো সহজ করা যায় অর্থাৎ প্রশাসনকে কিভাবে জনগণের কাছাকাছি নেয়া যায় ৩য় ভাগে অর্থাৎ ১৯৮২ সনে ২৪শে মার্চ রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা পরিবর্তনের পর ডায়না কনিয়ার্সের ভাষায় অন্ততঃ প্রকাশ্য উপায়ে উদ্যোগ নেয়া হয়। এ উদ্যোগের রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক উদ্দেশ্য ছিল পরিষ্কার। প্রথমতঃ ধরে নেয়া হয়েছিল যে বেসামরিক প্রশাসন-এ অপর্যাপ্ততার আলোকে সরকার মনে করলেন যে ক্ষমতা বন্টন প্রক্রিয়ার আলোকে প্রশাসনকে এমনভাবে সাজাতে হবে যার ফলে প্রশাসন জনগণের খুব কাছাকাছি চলে যায়। দ্বিতীয় কারণের মধ্যে দেখা যায় যে সরকারের একটা প্রচ্ছন্ন ধারণা ছিল প্রশাসন জনগণ হতে বিচ্ছিন্ন রয়েছে।

চিত্র ৬.১

সরকার,মাঠ পর্যায়ের দপ্তর ও স্থানীয় সরকারী প্রতিষ্ঠান সমূহের মধ্যে সম্পর্ক ১৯৭৬-৮২

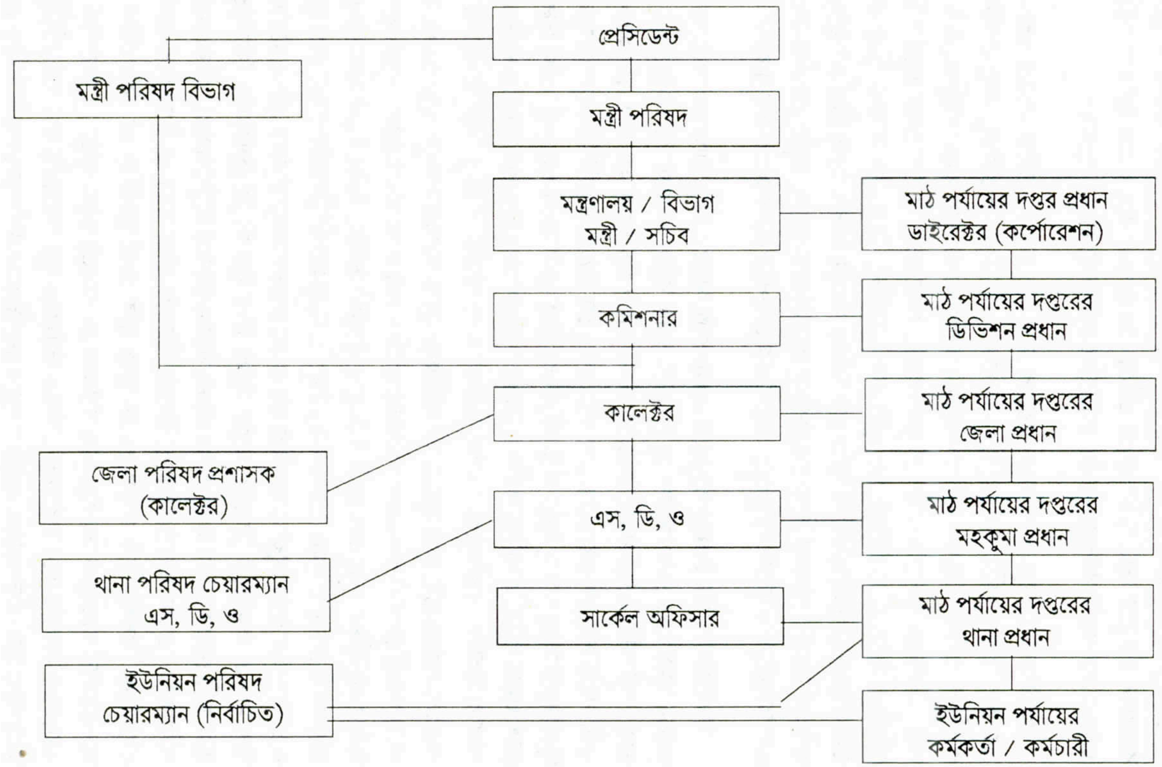

সূত্র ঃ প্রশাসনিক পুনর্গঠন/সংস্কার কমিটির রিপোর্ট – ১৯৮২

এ উদ্যোগের প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত লক্ষ্য জানতে যদিও আরো পরীক্ষা নিরীক্ষা এবং গবেষণার অপেক্ষা রাখে তবুও দু'টি বিষয় উল্লেখ করা যেতে পারে–প্রথমতঃ প্রশাসন অনেকটা উপর নীচ (টপ–ডাইন) প্রকৃতির ছিল, এটিকে নীচ উপর (বটম–আপ) করার প্রয়োজন অনুভব করা হয় এবং দ্বিতীয়ত ঃ প্রকাশ্য লক্ষ্য ছিল বেসামরিক প্রশাসনকে ক্ষমতা বণ্টনের আলোকে পুনর্গঠন করতে হবে।

আরো একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য করা যায়। প্রায়ই যুক্তি দেখান হয় যে, রাজনৈতিক স্থিতিশীল অবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণ করা হয় এবং এর সফল বাস্তবায়নে দেশের রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার একটা প্রতিফলন ঘটে। তাহলে রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা কি তা জানা দরকার। দেশে স্বাভাবিক অবস্থায় যে কোন ব্যক্তি আশা করে যে মৌলিক আইন; শাসনতন্ত্র ইত্যাদি বলবৎ আছে এবং এর ফলে সংসদ, বিচার বিভাগ এবং নির্বাহী বিভাগ স্বাভাবিক ভাবে তাদের কাজ করছে। আরো গুরুত্বপূর্ণ যে এ অবস্থায় ধরে নেয়া হয় আমলাতান্ত্রিক কাঠামো এবং বিভিন্ন মতের রাজনৈতিক দলগুলোও স্বাধীনভাবে মত বিনিময় ও চিন্তা করছে। যদি রাজনৈতিক স্থিতাবস্থা এই হয় তা হলে বলা যায় বাংলাদেশের রাজনৈতিক স্থিতাবস্থায় বিকেন্দ্রীকরণের কাঠামো তৈরী করা হয় নি। এর ফলে বিকেন্দ্রীকরণ বাস্তবায়ন পর্যায়ে দেখা গেছে মত পার্থক্য। এখানে ডায়না কনিয়ার্সের সমর্থন পাওয়া যায়। তিনি বলেন, কোন প্রকার বিকেন্দ্রীকরণমুখী সংস্কার সংক্রান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রক্রিয়া নিঃসন্দেহে জটিল, কারণ এর সংগে অনেকগুলো বিষয়, প্রশ্ন ও স্বার্থ জড়িত এবং গোটা প্রক্রিয়াই প্রকৃতভাবে রাজনৈতিক। যার ফলে বিকেন্দ্রীকরণ কর্মসূচীর পরিকল্পনা ও বাস্তবায়ন সোজাসুজি ও যুক্তিযুক্তভাবে করা যায় না।

১৯৮২ সনে প্রশাসনিক পুনর্গঠন / সংস্কার এর জন্য গঠিত কমিটির রিপোর্টের আলোকে বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের যে প্রক্রিয়া শুরু করা হয় তার উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে,

(ক) শতাব্দীরও বেশী পুরাতন মহকুমার অবলুপ্তি সাধান;
(খ) নিয়ামক (regulatory) ও উন্নয়নমূলক কার্যাবলী দেখার সুবিধার্থে থানা উন্নীতকরণ;
(গ) সমপর্যায়ের কোন স্থানীয় সরকার সংস্থা সৃষ্টি না করে মহকুমাগুলোকে জেলায় পরিণত করা (ইতোমধ্যে অবশ্য জেলা পরিষদ গঠন করা হয় এবং চেয়ারম্যানও নিযুক্ত করা
(ঘ) স্থানীয় উন্নয়নমূলক প্রকল্প প্রণয়ন, পরিকল্পনা গ্রহণ ও বাস্তবায়নের জন্য সিদ্ধান্ত গ্রহণের ক্ষমতা দিয়ে পুরাতন থানা কাউন্সিল গুলোকে উপজেলা পরিষদে রূপান্তর;
(ঙ) থানা কাউন্সিলের কাঠামো অপরিবর্তনীয় রেখে এটিকে সরাসরি ভোটে নির্বাচিত চেয়ারম্যানের হাতে ন্যস্ত করা, এবং
(চ) উপজেলা পর্যায়ের সব কর্মকর্তাকে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণে আনা (পরিবর্তিত প্রশাসনিক কাঠামো চিত্র ৬.২-এ দেখান হলো)। যদিও প্রায়শঃই বলা হয়ে থাকে জনগণের সুবিধার জন্য প্রশাসনিক স্তর কমানো হয়েছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় একমাত্র মহকুমা স্তর ছাড়া কিছুই কমেনি। অন্যদিকে উপজেলা পরিষদ কেবলমাত্র স্থানীয় সরকার মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণেই নয় বরং তাদেরকে রাষ্ট্রপতির সচিবালয়, মন্ত্রী পরিষদ বিভাগসহ অন্যান্য বিভাগের আদেশ নির্দেশও পালন করতে হয়।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

চিত্র – ৬.২

কেন্দ্রের সাথে বর্তমানে মাঠ পর্যায়ের সম্পর্ক স্থাপন পদ্ধতি

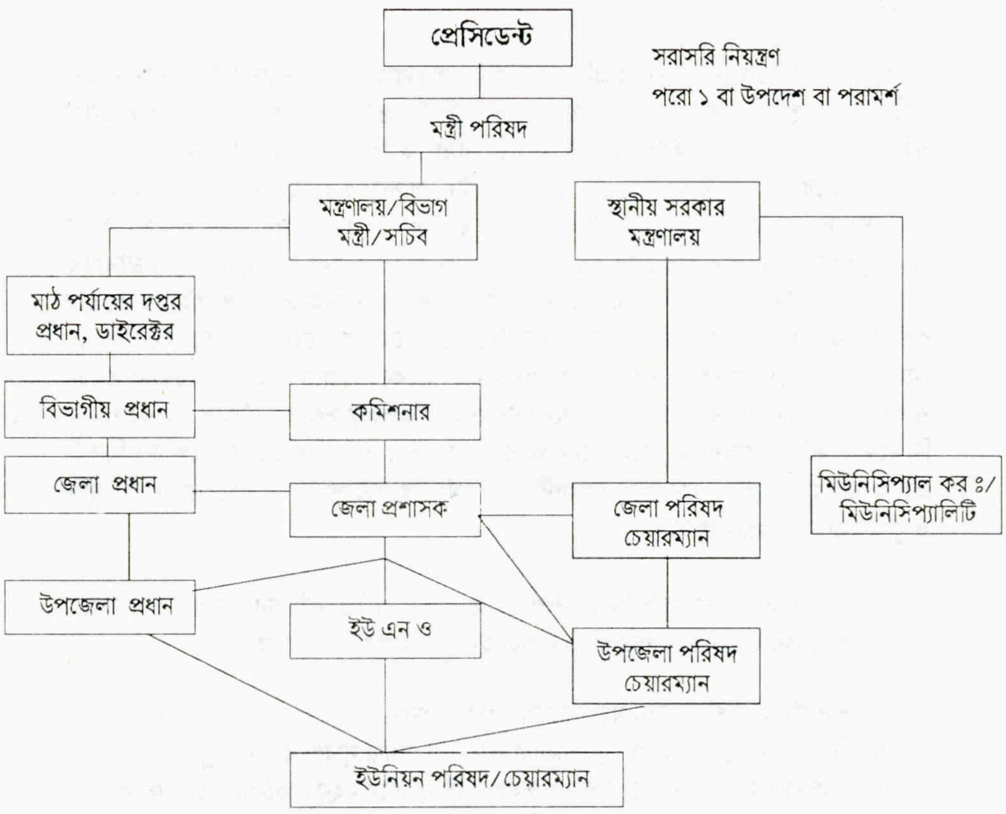

বিকেন্দ্রীকরণের আরেকটি উল্লেখযোগ্য বিষয় হচ্ছে উপজেলা পর্যায়ে বিচারের সুবিধার জন্য দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সৃষ্টি করা হয়েছে এবং বিচার বিভাগ ও পুলিশ প্রশাসনকে উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হয়েছে।

বিকেন্দ্রীকরণের বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ায় যে দ্বন্দ্বের সূত্রপাত হয় তাকে তিন ভাগে ভাগ করা যেতে পারে : রাজনৈতিক, প্রশাসনিক ও উন্নয়ন। রাজনৈতিক দ্বন্দ্ব আবার দ্বিমুখী। উপজেলা পদ্ধতি অপছন্দ করে এমন সব রাজনৈতিক দলের বিরোধীতা এবং উপজেলা পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যান ও উপজেলা পরিষদের সদস্য অর্থাৎ ইউনিয়ন পরিষদের নির্বাচিত চেয়ারম্যানের মধ্যে দ্বন্দ্ব বিরাজমান। উপজেলা পদ্ধতি রাজনৈতিক উদ্দেশ্য চরিতার্থে কেন্দ্র ও স্থানীয় জনগণের মধ্যে

রাজনৈতিক যোগসূত্র হিসেবে কাজ করে বলে বিরোধী দলগুলোর ধারণা। তাদের মতে এটি নির্বাহী আদেশের মাধ্যমে না হয়ে শাসনতান্ত্রিকভাবে আসা উচিৎ ছিল। তারা উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যান নির্বাচনে বিরোধিতা করে। অন্য দিকে দেখা যায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান যেমন জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে নির্বাচিত হন পরিষদের প্রতিনিধি সদস্যগণও জনগণের প্রত্যক্ষ ভোটে ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হন। প্রতিনিধি সদস্যগণ নিয়ম মোতাবেক উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানকে অনাস্থা ভোটের মাধ্যমে অপসারিত করতে পারেন। প্রতিনিধি সদস্যদের পরিষদ চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে প্রায় ক্ষোভ প্রদর্শন করার প্রবণতা দেখা যায়। এর বড় একটি কারণ হচ্ছে উপজেলা তহবিলের উপর চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণ ক্ষমতা। পরিষদ চেয়ারম্যান কর্তৃক এ ক্ষমতা অপব্যবহারের বহু উদাহরণ আছে।

আগেই বলা হয়েছে যে উপজেলা পদ্ধতিতে নির্দেশনা কর্তৃপক্ষ ও নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষের অবলুপ্তি ঘটানো হয়েছে। যার ফলে যদিও পরিষদ চেয়ারম্যানকে অপসারণ করার বিধান রাখা আছে কিন্তু এর বাস্তবায়ন প্রক্রিয়া খুবই জটিল বিধায় পরিষদ চেয়ারম্যান ও প্রতিনিধি সদস্যদের মধ্যে সর্বদাই একটি অন্তর্দ্বন্দ্ব বিরাজ করে। অনেক সময় তারা পরিষদের সভায় উপস্থিত হন না, যার জন্য উন্নয়ন কাজসহ বিভিন্ন সমস্যাদি সমাধান করা অথবা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা সম্ভব হয় না।

প্রশাসনিক দ্বন্দ্বের কারণ মূলতঃ মনস্তাত্ত্বিক। উপজেলা পদ্ধতি সৃষ্টির পূর্বে সব সময় একজন সরকারী কর্মকর্তা (সার্কেল অফিসার/ সহকারী কমিশনার) কার্যতঃ থানা কাউন্সিলের দায়িত্বে থাকতেন। এমনকি এ পদ্ধতি আরম্ভ হওয়ার দু'বছরেরও বেশী সময় পর্যন্ত একজন সরকারী কর্মকর্তা অর্থাৎ ইউ এন ও পরিষদের ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করেন এবং চেয়ারম্যানের সব সুযোগ সুবিধাদি ভোগ করেন কিন্তু চেয়ারম্যানের নির্বাচনের পর তিনি তাঁর অবস্থান হতে সরে আসেন। এমনও দেখা গেছে একজন প্রতিনিধি সদস্য (ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যান) উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান হিসেবে নির্বাচিত হয়েছেন এমন অবস্থায় পরিস্থিতির কিছু কিছু ক্ষেত্রে অবনতি ঘটে। অবশ্য সরকার এ ধরনের পরিস্থিতি অতি দ্রুত নিরসন করেন ইউ এন ও বদলী করার মাধ্যমে। অন্যদিকে চেয়ারম্যানের পক্ষ হতেও অসুবিধা দেখা দেয়। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের দায়িত্ব অন্য যে কোন প্রতিনিধি হতে ভিন্নতর, কারণ তিনি শুধু তাঁর এলাকার প্রতিনিধিত্বই করেন না বরং তাঁকে নির্বাহী কাজও করতে হয় যার জন্য প্রয়োজন প্রচুর দক্ষতা ও সরকারী কাজের অভিজ্ঞতা। চেয়ারম্যানগণের এ ধরণের দক্ষতা ও অভিজ্ঞতা না থাকার ফলে বহু জটিলতা দেখা দেয়। অদক্ষ চেয়ারম্যানের অধীনে কাজ করতে অন্যান্য বিভাগের কর্মকর্তাগণও কিছু অনীহা প্রকাশ করেন।

ক্ষমতা বন্টন/অর্পণ প্রক্রিয়ার মাধ্যমে প্রশাসনকে জনগণের কাছাকাছি আনা ও আমলা গোষ্ঠীকে স্থানীয় নেতৃত্বের কাছে জবাবদিহি করাই ছিল অন্যান্যের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ একটি প্রচ্ছন্ন বা অন্তর্নিহিত লক্ষ্য। সেই প্রচ্ছন্ন লক্ষ্যকে প্রকাশ্য রূপ দেয়ার জন্য বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা ও পুলিশ ছাড়া উপজেলা পর্যায়ের সব কর্মকর্তাকে চেয়ারম্যানের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ নিয়ন্ত্রণে আনা হয়। এব্যবস্থার ফলে নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে বিভাগীয় প্রধানগণ ও চেয়ারম্যানের মধ্যে প্রচণ্ড মত বিরোধের সৃষ্টি করে। আংশিকভাবে এ বিরোধ সরকার মীমাংসা করেন এভাবে যে, বিভাগীয় প্রধানগণ স্ব স্ব বিভাগের উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদের উপর পেশা সংক্রান্ত নিয়ন্ত্রণ রাখবেন।

এর ফলে অবশ্য আর একটি অসুবিধার সৃষ্টি হয়। উপজেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাগণের পক্ষে দুই কর্তৃপক্ষকে একসংগে খুশী রাখা অসুবিধা হয়ে পড়ে। এমনও দেখা গেছে বিভাগীয় প্রধান গুরুত্বপূর্ণ কাজে বা কোন সভায় উপজেলা কর্মকর্তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন আবার একই দিন উপজেলায় গুরুত্বপূর্ণ কাজ থেকে চেয়ারম্যানের সংগে অথবা বিভাগীয় কর্মকর্তা উপজেলায় বিভাগীয় কাজ কর্ম পরিদর্শনে গেলেন অথচ উপজেলা কর্মকর্তা চেয়ারম্যানের নির্দেশে জরুরী কোন দায়িত্ব পালনের জন্য কোন মফঃস্বল এলাকায় চলে গেলেন। এ ধরণের পরিস্থিতির জন্য অনেক সময় ভুল বুঝাবুঝি ও অপ্রীতিকর ঘটনার সৃষ্টি হয়েছে অনেক ক্ষেত্রে। এর ফলে লক্ষ্য করা গেছে বিভাগীয় প্রধানগণ তাদের স্ব স্ব কাজ কর্ম তদারক করার জন্য কোন উপজেলায় আগের মত পরিদর্শনে যান না বা মোটেই উৎসাহ দেখান না।

প্রশাসনিক বিরোধের আর একটি ক্ষেত্র দেখা দেয় যাকে কেসলার বিশেষজ্ঞ ও সাধারণ প্রশাসক এর মত বিরোধ বলে আখ্যায়িত করেছেন। নির্বাচিত চেয়ারম্যানগণ আসার পূর্বে ইউ এন ও (যিনি সাধারণ প্রশাসনের দলে পড়ে) ভারপ্রাপ্ত চেয়ারম্যান হিসেবে কাজ করতেন। চেয়ারম্যান হিসেবে তিনি যতটুকু সম্মান আশা করতেন অনেক সময় বিশেষজ্ঞ দলের সদস্যদের কাছ থেকে তা পাওয়া যেত না। এমনকি এ মানসিকতা নির্বাচিত চেয়ারম্যান আসার পরও চলতে থাকে। কারণ চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণ অনেকের পছন্দ হয়নি।

বাস্তবায়নের দ্বন্দ্ব বিরোধের আর একটি কারণ হিসেবে এধরনের বিরোধকে কেসলারের মতে কার্যক্ষেত্র বিরোধ বলা যায়। পুরোনো মহকুমাগুলো হতে নতুন জেলার সৃষ্টি এবং পুরোনো থানাগুলোকে উপজেলায় পরিবর্তনই কার্যক্ষেত্রে বিরোধের মূল সূত্রপাত। কতগুলো সরকারী দপ্তর যেমন– সড়ক ও জনপথ বিভাগ, গণপূর্ত বিভাগ এবং কিছু স্বায়ত্তশাসিত সংস্থা যেমন বিদ্যুৎ উন্নয়ন বোর্ড, পানি উন্নয়ন বোর্ড, পল্লী বিদ্যুতায়ন বোর্ড প্রভৃতির কার্যক্ষেত্রের সঙ্গে নব সৃষ্ট জেলা ও উপজেলাগুলোর সীমানার সংগে সামঞ্জস্য না থাকার ফলে এ সব দপ্তর বা বিভাগের সঙ্গে জেলা ও উপজেলা কর্তৃপক্ষের বিভিন্ন বিষয়ে সমন্বয়ের অভাব দেখা দেয়।

অনেকেই মনে করেন বিকেন্দ্রীকৃত বিচার ব্যবস্থা দু'কারণে সন্তোষজনক ভাবে চলছে না। প্রথমতঃ খুব দ্রুত অনভিজ্ঞ ব্যক্তিগণকে বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তা নিয়োগ করা হয়েছে, এমনকি তাদেরকে ন্যূনতম বা পর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ না দিয়েই সরাসরি কাজ করতে দেয়া হয়েছে। অভিজ্ঞতায় দেখা গেছে যে কোন উপজেলাতেই উন্নতমানের কৌশুলী নেই বা আইন বিষয়ে জানার মত কোন গ্রন্থাগার নেই। এমন উপজেলা দেখা গেছে যেখানে একজন উকিলও ছিল না–সংগত কারণে মামলার উভয় পক্ষকেই জেলা সদরে গিয়ে কৌশুলী আনতে হতো। আরো দেখা গেছে জেলা সদরের জজ কোর্ট বা অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ কোর্টের মামলা বাদ দিয়ে উন্নতমানের কৌশুলী কোন উপজেলায় যেতে চান না। এধরনের পরিস্থিতিতে যদি পক্ষগণ বিত্তহীন হন তাহলে কি ধরনের অসুবিধা হতে পারে তা অনুমান করা যায়। মান যত নিম্নমানেরই হোক না কেন যেহেতু জেলা সদর হতে যাচ্ছেন তাই অনেক সময় আর্থিক কারণের সংগে সামাজিক মর্যাদা রক্ষার জন্যও কৌশুলীগণ অধিক হারে ফি দাবী করেন। ইতোমধ্যে অবস্থার কিছু উন্নতি হলেও যে উল্লেখযোগ্য তা নয়। দ্বিতীয়তঃ যদিও বলা হয়ে থাকে ম্যাজিস্ট্রেসীকে চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণের বাইরে রাখা হয়েছে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে প্রায়ই দেখা যায় চেয়ারম্যান পরোক্ষভাবে বিচার কাজে হস্তক্ষেপ করেন। ইউ এন ও'র

অবর্তমানে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট ইউ এন ও হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। ইউ এন ও চেয়ারম্যানের ষ্টাফ অফিসার হিসেবে দায়িত্ব সম্পাদন করেন। স্বাভাবিকভাবেই পরোক্ষভাবে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের উপর চেয়ারম্যানের প্রভাব পড়ে। উপজেলা অর্থ অফিসার যিনি একজন সহকারী কমিশনার। খণ্ডকালীন ম্যাজিস্ট্রেট হিসেবে কাজ করেন। সহকারী কমিশনার সরাসরি চেয়ারম্যানের নিয়ন্ত্রণে থাকেন এবং চেয়ারম্যান তার বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদনও লিখে থাকেন। এক্ষেত্রেও দেখা গেছে চেয়ারম্যান বিচার কাজে হস্তক্ষেপ করেন। আবার এমনও দেখা গেছে চেয়ারম্যান তার দলবল নিয়ে মিছিল করে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের আদালত আক্রামণ করে তার বা তার দলীয় লোকের পক্ষে রায় দাবী করেছে।

ফৌজদারী আদালতে সরকারী পক্ষের মামলা পরিচালনা করার জন্য পুলিশ সাব ইন্সপেক্টর পদ মর্যাদার একজন কর্মকর্তা থাকেন। বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দেখা গেছে যে পুলিশ কর্মকর্তা তার বিভাগীয় কাজ কর্মে খুব ভাল করে না তাদেরকেই কোর্টে অনেকটা শাস্তিস্বরূপ নিয়োগ দেয়া হয়। অথচ এই পুলিশ কর্মকর্তাকে কোর্টে সম্পূর্ণভাবে একজন বিজ্ঞ কৌশুলীর ভূমিকা পালন করতে হয়। অনভিজ্ঞ কৌশুলী, পুলিশ কর্মকর্তা, অনভিজ্ঞ ও পর্যাপ্ত পরিমাণে প্রশিক্ষণহীন বিচার বিভাগীয় কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সংগতভাবে উন্নতমানের বিচার আশা করা যায় না। আদালত দোরগোড়ায় হওয়ায় অনেক সময় দেখা যায় খুব ছোট বিষয়কে বড় করে দেখিয়ে মামলা দায়ের করা হয়ে থাকে। যদিও দাবী করা হয় আদালতের সংখ্যা বেশী হওয়াতে মামলা তাড়াতাড়ি নিষ্পত্তি হয়ে যাচ্ছে, কিন্তু কখনও কখনও দেখা যায় নিষ্পত্তির হারের চেয়ে নতুন দায়েরকৃত মামলার সংখ্যা বেশী। বড় বড় শহরের কৌশুলীগণ বিচারে প্রহসনের দোহাই দিয়ে প্রথম থেকে বিকেন্দ্রীকৃত বিচার ব্যবস্থার বিরোধিতা করে আসছেন। মূলতঃ তাঁদের ক্ষোভের বড় কারণ হচ্ছে শহর হতে এখন মামলা নব সৃষ্ট জেলায় বা উপজেলায় চলে যাওয়ার ফলে তাঁদের স্বাভাবিক আয়ে টান পড়েছে। তবুও এ বিরোধিতা নতুন ব্যবস্থার জন্য নেতিবাচক বটে।

প্রায়ই বলা হয়ে থাকে উপজেলা পরিষদ প্রশাসনিক ক্ষমতা বন্টনের ফসল। কারণ পরিষদের হাতে অনেক গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব বিশেষ করে উন্নয়নমূলক দায়িত্ব দেয়া হয়েছে। অন্ততঃ ১৯৮২ সনের ২৩শে অক্টোবরের কার্যক্রমে এটা বিধৃত আছে। কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে এ একটি কল্পনা মাত্র। যে দু'টি তালিকা তৈরী করা হয়েছে মূলতঃ তার মধ্যে সংরক্ষিত তালিকা অসম্পূর্ণ। যদিও বলা হয়েছে উপজেলা পরিষদের নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ রাখা হয়নি কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় উপজেলা পরিষদকে নিয়ন্ত্রণ করার জন্য সরকার যথেষ্ট ক্ষমতা রাখেন। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় তিন জন মহিলা সদস্য ও একজন পুরুষ সদস্যের মনোনয়ন দান, বাজেট অনুমোদন, উন্নয়ন পরিকল্পনা অনুমোদন, কর আরোপ করার প্রস্তাব অনুমোদন, পরিষদ কর্তৃক গৃহীত যে কোন প্রস্তাব নাকোচ করা, পরিষদের জন্য যে কোন আইন তৈরী করা ইত্যাদি। সুতরাং স্বায়ত্তশাসনের মাত্রা নির্ভর করে সরকার একে কতটুকু ক্ষমতা দিচ্ছে তার উপর। উপজেলা পরিষদের সবচেয়ে বড় দুর্বলতা হচ্ছে উপজেলা পরিষদকে সরকার উন্নয়ন সহায়ক তহবিল হিসেবে প্রতি বছর মঞ্জুরী দিয়ে থাকেন এবং এ মঞ্জুরী বিনা শর্তে দেয়া হয় না। কোন্ খাতে কত খরচ করতে হবে বা কি ধরনের প্রকল্প নেয়া যাবে ইত্যাদি নিয়ম-কানুন অবশ্যই পালন করতে হয়। এ পরিস্থিতিতে পরিষদ স্বাধীনভাবে কাজ করতে পারে না।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

উপজেলা সৃষ্টির মূল বক্তব্য ছিল প্রশাসনকে জনগণের কাছাকাছি নিতে হবে এবং জনগণের মংগলের জন্যই সব কার্যক্রম গ্রহণ করা হবে এবং শেষ পর্যন্ত দেশের দারিদ্র্য দূর করা হবে। এ উদ্দেশ্য কতটুকু সফল হয়েছে তা দেখতে হবে। বাস্তব রূপ অনেক ক্ষেত্রেই বিপরীত। এর কারণ পরিকল্পিত উপায়ে কোন কার্যক্রম গ্রহণ করা হয় না, প্রায়ই সরকারী নির্দেশে যদিও বলা হয়েছে প্রত্যেক উপজেলা পরিষদ একটি পঞ্চ বার্ষিকী পরিকল্পনা ও বার্ষিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবে এবং উপজেলা পরিষদের সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাগণকেই তা করতে হবে কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা যায় এ কাজটি সন্তোষজনকভাবে কোথাও করা হয়নি। কিভাবে পরিকল্পনা তৈরী করতে হবে তা সরকারী নির্দেশে বলা নেই, এমনকি এর জন্য কোন নমুনাও দেয়া হয়নি। অন্যদিকে জেলা পর্যায়ে বা তদুর্ধ্ব কোন কর্মকর্তা এ ব্যাপারে মোটেই উৎসাহ দেখান না। কারণ আগের মত কোন প্রকল্প জেলা অনুমোদন কর্তৃপক্ষ কর্তৃক অনুমোদিত হতে হয় না। ফলে উপর-নীচ এবং নীচ-উপর এর মধ্যে মোটেই সমন্বয় সাধিত হচ্ছে না। সুতরাং উপজেলা পর্যায়ে পরিকল্পনা প্রণয়ন একটি অলৌকিক বস্তু হিসেবেই থেকে যাচ্ছে।

সংসদ সদস্যের মূল দায়িত্ব সংসদে আইন প্রণয়ন করা। কিন্তু এ দেশের রাজনৈতিক ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যাবে যে সংসদ সদস্যগণ কখনো শুধু আইন প্রণয়ন করেই সন্তোষ্ট হননি। সংসদের বাইরেও তাঁরা তাদের কাজের পরিধি ব্যপৃত করেছেন। অবশ্য এর জন্য আমাদের সামাজিক ব্যবস্থাও দায়ী। প্রত্যেক সংসদ সদস্যেরই একটি নির্বাচনী এলাকা আছে যেখানকার নির্বাচকগণ স্বাভাবিকভাবেই এ এলাকার সংসদ সদস্যের কাছে কিছু প্রত্যাশা করেন এটা উন্নয়নমূলক কাজের মাধ্যমেও হতে পারে বা ব্যক্তি পর্যায়েও হতে পারে। কিন্তু সংসদ সদস্যের আর্থিক কোন ক্ষমতা না থাকায় তিনি অনেক সময় উপজেলা পরিষদের উপর প্রভাব খাটাতে চান। এদিকে সংসদ সদস্যগণকে সরকার তাঁদের এলাকার বিভিন্ন কমিটির উপদেষ্টা হিসেবে কাজ করার নির্দেশ দিয়েছেন। মূলতঃ অনেক সময় অনিচ্ছা সত্ত্বেও উপদেশ শুনতে হয়। যদি সংসদ সদস্য ও চেয়ারম্যানের মধ্যে মত বিরোধ দেখা দেয় তা হলে কোন কোন সময় মারাত্মক পরিস্থিতির উদ্ভব হয় এবং তা উন্নয়নের পথ অন্তরায়ের সৃষ্টি করে।

উপজেলা পরিষদের কোন নিয়ন্ত্রণকারী কর্তৃপক্ষ নেই। যদিও জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে বিভাগীয় কাজ তদারক করার জন্য বলা হয়েছে কিন্তু তা খুবই অস্পষ্ট। মন্ত্রি পরিষদ বিভাগ হতে গত ৩০শে জনু '৮৫ তারিখে জারীকৃত স্মারক নং মপবি/জে প্র-২/১(২২)/৮৫-২৯৪ এ উপজেলা পরিষদের সঙ্গে সরকারী কর্মকর্তাগণের সম্পর্কে অনুঃ ৩ এর উপ-অনুচ্ছেদ-এ জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ কর্তৃক উপজেলা পরিষদ পরিদর্শনের কথা বলা হয়েছে। পরিদর্শন শব্দটির প্রায়োগিক দিক ততটা পরিস্কার নয়। এতে বলা হয়েছে জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য কর্মকর্তাগণ উপজেলা পরিষদ পরিদর্শন করবেন ও প্রয়োজনীয় উপদেশ দেবেন। যদিও আইনগত কোন সমর্থন নেই তবুও বলা হয়ে থাকে উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানগণ সরকারের উপ-সচিব পদ মর্যাদাসম্পন্ন কোন জেলা প্রশাসক বা জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তা। তবে উপ-সচিব পদ মর্যাদার বেশী নহেন, এমনকি কোন কোন ক্ষেত্রে আরো কম পদমর্যাদাসম্পন্ন। সুতরাং তথাকথিত উপ-সচিব পদ মর্যাদাসম্পন্ন চেয়ারম্যান এ ধরনের উপদেশ অনেক সময়ই শুনতে চান না বা তাতে তাঁর কাজে হস্তক্ষেপের সামিল বলেই মনে করেন।

সুপারিশ

১। যদিও প্রত্যেক উপজেলা পরিষদকে পঞ্চবার্ষিক পরিকল্পনা তৈরী করতে বলা হয়েছে এবং এর উপর নির্ভর করে বার্ষিক পরিকল্পনা প্রণয়ন করার নির্দেশ দেয়া হয়েছে, অনেক ক্ষেত্রে তা মেনে চলা হয় না। প্রাথমিক পর্যায়ে তা প্রণয়ন ও অনুসরণ করা হয়ত কষ্টসাধ্য হতে পারে কিন্তু পরিকল্পিত উপায়ে অবশ্যই চলতে হবে। এ নিশ্চয়তা বিধানের জন্য দায়িত্ব পরিষদকে অবশ্যই বহন করতে হবে। বার্ষিক উন্নয়ন তহবিল বরাদ্দের ও ছাড়পত্র দেয়ার ব্যাপারে এটি পূরণ একটি পূর্ব শর্ত হওয়া উচিত।

২। প্রত্যেক উপজেলায় দেওয়ানী ও ফৌজদারী আদালত সৃষ্টি করার ফলে একদিকে যেমন দক্ষ কর্মকর্তা / কর্মচারী ও কৌশুলীর অভাব দেখা দিয়েছে অন্যদিকে জেলা সদর হতে বিচারাধীন হাজতী আসামীদের আনা নেয়ার অসুবিধা ছাড়াও প্রত্যেক উপজেলায় টাউট বাটপার ও মামলা বাজের সংখ্যা বেড়েছে। এর সঙ্গে সরকারী খরচও আছে। অনেক উপজেলায় মামলার সংখ্যা খুবই কম। এ সব দিক বিবেচনা করে ৩ থেকে ৪টি উপজেলার মধ্যে একটি আদালত সীমাবদ্ধ রাখা যেতে পারে।

৩। বর্তমানে উপজেলা পরিষদ স্থানীয় সরকার পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় মন্ত্রণালয়ের নিয়ন্ত্রণে আছে। পরিষদ ছাড়াও এ মন্ত্রণালয় আরো নানাবিধ প্রতিষ্ঠানের কর্মকাণ্ড দেখেন। এর ফলে গুরুত্ব অনেকাংশে কমে যায়। উপজেলা পরিষদের কাজ আরো গুরুত্বপূর্ণভাবে দেখাশুনার জন্য একই মন্ত্রণালয়ের অধীনে একটি পরিদপ্তর খোলা যেতে পারে, যার দায়িত্ব একজন সরকারের অতিরিক্ত সচিবের পদ মর্যাদাসম্পন্ন মহাপরিচালক থাকবেন।

৪। উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যান ও ইউনিয়ন পরিষদের চেয়ারম্যানের নির্বাচন একই দিন হওয়া বাঞ্ছণীয়, এতে একের প্রতি অন্যের শ্রদ্ধাবোধ বাড়বে যা কাজের জন্য মংগলজনক।

৫। যেহেতু জেলা প্রশাসক ও অন্যান্য জেলা পর্যায়ের কর্মকর্তাদেরকে উপজেলা পরিষদ ভিজিট ও পরিদর্শনের জন্য বলা হয়েছে সুতরাং এসমস্ত কর্মকর্তাদের পদ মর্যাদা চেয়ারম্যান হতে অন্ততঃ এক ধাপ উপরে উন্নীত করতে হবে।

৬। অনেক সময় দেখা যায় উপজেলা পরিষদের চেয়ারম্যানের বিরুদ্ধে তার কার্যকলাপের জন্য সর্বসম্মতিক্রমে অনাস্থা পেশ করলেও কোন না কোন কর্তৃপক্ষের হস্তক্ষেপের ফলে কোন ফল পাওয়া যায় না এতে কাজের ক্ষতি হয়। এ ধরনের পরিস্থিতিতে বিকল্প পদ্ধতি ব্যবহার করা যেতে পারে। এর জন্য প্রয়োজনীয় আইন প্রণয়ন করতে হবে।

৭। উপজেলা পরিষদের উপর যতদূর সম্ভব কম নিয়ন্ত্রণ রাখা যেতে পারে।

৮। কাজের সুবিধার জন্য উপজেলা পরিষদ চেয়ারম্যানের ব্যাপক উন্নয়নধর্মী প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা দরকার। সাভারস্থ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্র (বিপিএটিসি) এ দায়িত্ব পালন করতে পারে।

উপরোক্ত সুপারিশমালার বাস্তবায়ন অনেক ক্ষেত্রেই সহজ কাজ নয়, তবুও কর্মের জটিলতা এবং বিপুলতা, নিষ্ক্রিয়তার ওপর হওয়া উচিত নয়। উপজেলা পদ্ধতি চালু হয়েছে বেশী আগে নয় এর পূর্ণ সফলতা দেখতে হলে আমাদেরকে আরো কিছু দিন অপেক্ষা করতে হবে।

উপসংহার

যদিও রণ্ডিনেলী এবং অন্যান্যরা বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণ প্রক্রিয়াকে ব্যক্তিগতকরণ বা সরকারী হতে বেসরকারী কর্তৃপক্ষের কাছে কার্য বন্টন পদ্ধতি বলে মনে করেন তবুও উপজেলা পদ্ধতি যে ক্ষমতা বন্টন প্রক্রিয়ার ফসল এতে কোন সন্দেহ নেই। তবে রণ্ডিনেলী এবং চিমা যথার্থভাবে এও বলেছেন, 'বিকেন্দ্রীকরণের সুফল পেতে হলে তুলনামূলকভাবে দীর্ঘ সময়ের প্রয়োজন। বিকেন্দ্রীকরণ নীতি বাস্তবায়ন কখনো দ্বন্দ্বমুক্ত নয় ; বিভিন্ন দল, উপদলের মধ্যে মতবিরোধ থাকবেই। উন্নয়নশীল দেশসমূহে একে প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক সমস্যাদি দূরীকরণের জন্য ধন্বন্তরী ঔষধ হিসেবে বিবেচনা করাও ঠিক হবে না। এর বাস্তবায়নের ফলে আপনা হতেই দক্ষ কর্মকর্তা / কর্মচারীর অভাব দূর হবে না বরং প্রাথমিকভাবে তাদের চাহিদা বেড়ে যাবে।

বহু অসুবিধা ও দুর্বলতা থাকা সত্ত্বেও উপজেলা পরিষদ একটি উৎকৃষ্ট প্রতিনিধিত্বমূলক স্থানীয় সরকার প্রতিষ্ঠান। যদিও এ পদ্ধতিতে কিছু সমস্যা ও মত-পার্থক্য, দ্বন্দ্ব এবং কিছু মৌলিক বিষয় আছে যা গণতান্ত্রিকভাবে দূর করা সম্ভব, এবং এর ফলে স্থানীয় কর্তৃপক্ষ একদিকে যেমন বেআইনী কর্মতৎপরতা হতে বিরত থাকবে অন্যদিকে সরকারী নীতিমালার সংগে সংগতি রেখে একটি ন্যূনতম সীমারেখাও মেনে চলবে। এখানে উল্লেখ করা অপ্রাসংগিক হবে না যে বৃটিশ স্থানীয় সরকার পদ্ধতি যা বিশ্বব্যাপী প্রশংসিত হচ্ছে এবং যাকে বহু কমনওয়েলথ দেশসহ অনেক দেশ অনুসরণ করছে তা কোন পরিকল্পিত ধারণার ফসল নয়। পূর্ববর্তী শতাব্দীগুলোর অপরিকল্পিতভাবে গড়ে উঠা প্রতিষ্ঠানগুলো হতে এ অবস্থা সৃষ্টি হয়েছে এবং সময়ের ব্যপ্ত পরিসরে গণতান্ত্রিক উপায়ে সংশোধিত আকারে সমন্বিত হয়ে গৃহীত হয়েছে। সুতরাং উপজেলা পদ্ধতিও কোন সময়ের অগ্নি পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হবে না তার কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে না। ১৯৮২ সনের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে উল্লিখিত কয়েকটি বিধি নিষেধ ব্যতীত উপজেলা পদ্ধতিকে একটি মডেল গণতান্ত্রিক প্রতিষ্ঠান হিসেবে ধরা যেতে পারে। উন্নয়নমূলক কর্মকাণ্ডের সমন্বয় সাধনের মত গুরুত্বপূর্ণ কাজটি উপজেলা পরিষদকে করতে হয়। উপজেলা পদ্ধতির ভিত্তি রয়েছে রাজনৈতিক সমন্বয় সাধনের উপর। এর দক্ষতা আংশিকভাবে প্রশিক্ষণ, সঠিক নিয়মাবলী তৈরী প্রভৃতি আমলাতান্ত্রিক উপায় অবলম্বন করে বাড়ানো যায়। যাহোক বিক্ষুব্ধ রাজনৈতিক পরিস্থিতির উপরই কোন রাজনৈতিক পদ্ধতির সফলতা নির্ভর করে এবং একটি ভয়ংকর আমলাতান্ত্রিক সমুদ্রের মধ্যে উপজেলা পদ্ধতি একটি গণতন্ত্রের দ্বীপ হিসেবে বেঁচে থাকবে।

উপজেলা পরিষদের দুর্বলতর দিক হচ্ছে তা একটি বিভক্ত শিবির। এর পরতে পরতে দ্বন্দ্ব আমলা ও রাজনীতিবিদদের দ্বন্দ্ব, আমলাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব এবং রাজনীতিবিদদের নিজদের মধ্যে দ্বন্দ্ব। আমলাগণ রাজনীতিবিদদের বিশ্বাস করেন না। রাজনীতিবিদরাও উল্টো আমালাদের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রের মনোভাব গড়ে তোলে। এসব অসুবিধা দূর করা যাবে, যদি মনোভাবের পরিবর্তন করা যায় এবং স্বল্পকালীন সুবিধার জন্য উপজেলা পরিষদকে ব্যবহার করা না হয়। বিকেন্দ্রীকরণের পরিকল্পনা দীর্ঘ মেয়াদের ভিত্তিতে গ্রহণ করা উচিৎ। দুর্ভাগ্যজনক ভাবে বাংলাদেশে বিকেন্দ্রীকরণের সরকারী কর্মসূচী ছিল সব সময় ক্ষণস্থায়ী। যথেষ্ট সময় এবং দিক নির্দেশনা ছাড়া বিকেন্দ্রীকরণের সফলতা আসা সম্ভব নয়। তবে গণসমর্থন আদায়ের জন্য উপজেলা পরিষদ কতটুকু স্বশাসন ভোগ করে, কতটুকু দায়িত্ববোধ এর গড়ে উঠে এবং কতটুকু নিরপেক্ষতা এ বজায় রাখে তার উপরই এর ভবিষ্যৎ অনেকাংশে নির্ভর করে।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

তথ্য নির্দেশ

1. B.C. Smith *Decentralisation*
2. G. Sabbir Cheema & Dennis A Rondinellin, *Decentralisation and Development : Policy Implementation in Developing Countries.*
3. D. A. Rodninelli, Govt. Decentralisation in Comparative Perspective : Theory and Practice in Developing Countries. *International Review of Administrative Science.*
4. Diana Conyers "Decentralisation : A Frame for Discussion" *Decentralisation, Local Govt. Institutions & Resource Mobilization* ed. Hasnat A. Hye. Comilla, BARD.
5. James W. Fesler, A Process to the understanding of Decentralisation. Journal of Politics Vol 27C 1965.
6. U. N. GHOSAL, *A History of Indian Public Life* vol-2 chapter IX.
7. A. M. M. Showkat Ali, *Politics, Development & Upazila.*
8. A. M. M. Showkat Ali, *Field Administration and Rural Development in Bangladesh.*
9. Govt. of the Peoples Republic of Bangladesh, *Report of the Committee for Administrative Reorganisation/Reforms.*
10. S. M. Ali, Saifur Rahman, K. M. Das, *Decentralization and Peoples Participation in Bangladesh.*
11. Atiar Rahman, *Rural Power Structure.*
12. Hasnat Abdul Hye, *Decentralisation, Local Govt. Institution & Resource Mobilisation,* BARD, Comilla.
13. Akbar Ali Khan, *Conflict and Co-ordination Problems in Upazila Administration - A Note* **"The Young Economist, BYEA Journal."**
14. Akbar Ali Khan (Translated by Aminul Islam Bhuiyan) বাংলাদেশে পল্লী উন্নয়নের জন্য বিকেন্দ্রীকরণ "প্রশাসন সমীক্ষা" জার্নাল, বিপিএটিসি ১ম বর্ষ ১ম সংখ্যা
15. Mohammad Faizullah, *Development of Local Govt. in Bangladesh.*
16. Mohammad Faizullah, Upazila Development Planning " Development Review" the bi-annual publication of Academy for Planning & Development vol. 1 No-2 June 1988.
17. গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান
18. L. R. Bhuiya, Functional Relationship and Administrative Efficiency at Upazila level ; A Seminar Paper submitted during 4th ACAD Course at BPATC.

দুর্নীতি ও উন্নয়ন ঃ বাংলাদেশ প্রসঙ্গে

— মুহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার

ভূমিকা

বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের জন্য দুর্নীতি আজ অন্যতম প্রধান সমস্যা ও হুমকি হয়ে দেখা দিয়েছে। উন্নত, উন্নয়নশীল এবং স্বল্পোন্নত সকল সমাজেই দুর্নীতির সংক্রমন ঘটেছে, যদিও সমাজ ও রাষ্ট্রভেদে দুর্নীতির মাত্রা ও কার্যকারিতায় রয়েছে উল্লেখযোগ্য তারতম্য। বিশ্বব্যাপী আজ দুর্নীতি প্রতিরোধের ওপরে গুরুত্বারোপ করা হচ্ছে এবং প্রশাসনিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক দুর্নীতি হ্রাস করার জন্য নানা রকম পরীক্ষামূলক উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে।[১]

বিশ্বের প্রতিটি অঞ্চলের সমাজ, প্রশাসন ও রাজনীতি যখন দুর্নীতির সংক্রমণে আক্রান্ত, তখন একশ্রেণীর দুর্নীতি বিশেষজ্ঞরা দুর্নীতিকে উন্নয়নের সহায়ক শক্তিরূপে ব্যাখ্যা করছেন। দুর্নীতির সনাতনী ধারণার এ সংশোধনবাদীরা দুর্নীতির মাত্রাবৃদ্ধিতে শংকিত নন। বরং এঁদের মতে উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার প্রক্রিয়ায় দুর্নীতি ইতিবাচক ভূমিকা পালন করে।[২] অনেক সমাজবিজ্ঞানী এ গ্রুপের চিন্তাবিদদেরকে দুর্নীতির পূণঃমূল্যায়নকারী গ্রুপ বা দুর্নীতির সংশোধনবাদী গ্রুপ হিসাবে আখ্যায়িত করেছেন।

দুর্নীতির সর্বজন গ্রহণীয় সংজ্ঞা দেয়া দুষ্কর। সমসাময়িক সমাজবিজ্ঞান সাহিত্যে দুর্নীতির এমন সংজ্ঞা খুঁজে পাওয়া কষ্টকর যা দুর্নীতির সকল স্বরূপ ও এলাকাকে অন্তর্ভূক্ত করতে পারে। উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সমাজবিজ্ঞানী দুর্নীতির সংজ্ঞা বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা করেছেন। প্রাসঙ্গিকতার কারণে সে সব আলোচনায় না গিয়ে আমি সংক্ষেপে এ প্রসঙ্গে জে.এস.নাঈ এর সংজ্ঞাটি তুলে ধরতে আগ্রহী। তাঁর ব্যাখ্যায় দুর্নীতি এমন ব্যবহার যা ব্যক্তিগত স্বার্থের কারণে কোন বিশেষ দায়িত্বে মনোনীত বা নির্বাচিত ব্যক্তিকে যথাযথ কর্ম সম্পাদন থেকে বিচ্যুত করে।[৩] নাঈ এর সংজ্ঞাটির প্রতি দুর্নীতি গবেষকদের অনেকেরই দুর্বলতা লক্ষ্য করা যায়, যদিও টৈভফিক এফ. নাস এবং তাঁর সহযোগীরা আরো একপা এগিয়ে দুর্নীতির আরো বিস্তৃত একটা সংজ্ঞা দেয়ার চেষ্টা করেছেন। এঁরা সে কাজটিকেই দুর্নীতিযুক্ত বলে সংজ্ঞায়িত করার চেষ্টা করেছেন, যেখানে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সরকারী ক্ষমতা বা কর্তৃত্বের অবৈধ ব্যবহার করা হয়। মাইকেল জনষ্টন অবশ্য নাঈ এর সংজ্ঞার ওপরে গুরুত্বারোপ করলেও একে সংস্কৃতিগতভাবে পক্ষপাতমূলক বলে সমালোচনা করেছেন। তাঁর নিজের দেয়া সংজ্ঞাতে তিনি দুর্নীতিকে ব্যক্তিগত স্বার্থের জন্য সরকারী সম্পদ ও পদমর্যাদার অপব্যবহারকে বুঝিয়েছেন। জনষ্টনের সংজ্ঞার সাথে ভারত সরকারের দুর্নীতি প্রতিরোধ কমিটির রিপোর্টের সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। এ রিপোর্ট অনুযায়ী দুর্নীতি সরকারী অফিস অথবা কোন বিশেষ পদাসীন ব্যক্তির ক্ষমতা ও প্রভাবের অবৈধ এবং স্বার্থপ্রণোদিত চর্চাকে অন্তর্ভূক্ত করে।

উদ্দেশ্য

এ নিবন্ধের উদ্দেশ্য হবে দুর্নীতিকে উন্নয়নের সহায়ক শক্তি হিসাবে ব্যাখ্যাকারী সমাজবিজ্ঞানীদের যুক্তি বিশ্লেষণ করা এবং বাংলাদেশ প্রসঙ্গে দুর্নীতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক কার্যকারিতা পরীক্ষার মাধ্যমে এ সকল গবেষকদের বক্তব্যের যৌক্তিকতা পরীক্ষা করা। দুর্নীতি বাংলাদেশের উন্নয়নকে সহায়তা করছে কিনা এ নিবন্ধে তা পরীক্ষা করে দেখা হবে।

বাংলাদেশে দুর্নীতির ইতিবাচক ভূমিকা

বর্তমান বিশ্বের দুর্নীতি গবেষকদের অনেকেই দুর্নীতির ইতিবাচক ভূমিকার ওপর গুরুত্বারোপ করেছেন। এঁদের উল্লেখযোগ্য সংখ্যকের নাম আমি ইতিপূর্বে উল্লখ করেছি। বাংলাদেশের দুর্নীতির ইতিবাচক দিক সমাজবিজ্ঞানীদের লেখায় প্রাধান্য পায়নি। বাংলাদেশে মূলতঃ দুর্নীতি বিষয়টির ওপরে গবেষণা কাজ হয়েছে কম। যা দু'একটি গবেষণাকাজ চোখে পড়ে, সেগুলোতে দুর্নীতির ইতিবাচক ভূমিকাকে বিস্তারিতভাবে তুলে ধরা হয়নি। এখানে আমরা বাংলাদেশে দুর্নীতির উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ভূমিকা চিহ্নিত করার চেষ্টা করবো।

দুর্নীতি সরকারী আমলাদের গুণগত মান উন্নয়নে সহায়ক

সরকারী পদের বেতন যদি একজন প্রতিভাসম্পন্ন লোকের সামাজিক মর্যাদা ও চাহিদার তুলনায় কম হয়, তাহলে সঙ্গত কারণেই যোগ্যতর প্রতিভাবানরা নিজেদের প্রয়োজনের তাগিদে কম বেতনের সরকারী চাকরিতে যোগদানের পরিবর্তে আকর্ষণীয় বেতনে বেসরকারী চাকরিতে যোগদানে উৎসাহিত হবেন। ফলে, সরকার, জনগন তথা জাতি বঞ্চিত হবে প্রতিভাবানদের সেবা থেকে। কিন্তু বাংলাদেশে বিভিন্ন সরকারী পদ, বেতন কম হওয়া সত্বেও, দুর্নীতির সুযোগ থাকার কারণে প্রতিভাবানদেরকে ধরে রাখতে সমর্থ হচ্ছে। ফলে, একদিকে জনগণ পাচ্ছেন প্রতিভাবান প্রশাসকের সেবা, অন্যদিকে সংশ্লিষ্ট চাকুরে, নির্দিষ্ট পদে বেতন কম হওয়া সত্বেও অবৈধ উপার্জনে তা পুষিয়ে নিচ্ছেন। কাজেই, কম বেতনের সরকারী পদগুলোতে যোগ্যতর লোক ধরে রাখতে হ'লে এ সকল পদগুলোতে দুর্নীতির সুযোগ রাখা দরকার। অন্যথায় এ সকল পদে স্থান নেবে অযোগ্য কর্মকর্তা ও প্রশাসক যাদের ভুল পরিচালনা ও সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রশাসনিক জটিলতা ও অচলাবস্থা সৃষ্টি হওয়া মোটেও বিচিত্র নয়।

দুর্নীতি বেসরকারী মূলধন গঠনে ভূমিকা রাখে

বাংলাদেশের দুর্নীতি বেসরকারী মূলধন গঠনে ইতিবাচক ভূমিকা রাখছে। দুর্নীতির মাধ্যমে উদ্যোক্তাদের যে কোন ধরনের উদ্যোগ ত্বরান্বিত হচ্ছে। ফলে, বিনিয়োজিত মূলধন মুনাফাযুক্ত হয়ে বেড়ে উঠছে। বর্ধিত মূলধন পুণঃবিনিয়োগের ব্যবস্থা নিয়ে আরো বাড়িয়ে তোলা হচ্ছে। এভাবে স্বল্প সময়ে দুর্নীতি অধিক মূলধন সৃষ্টিতে সহায়ক ভূমিকা রাখছে। দুর্নীতির ইতিবাচক ভূমিকার ওপরে গুরুত্বারোপকারীদের প্রথম সারির গবেষক জে. এস. নাঈও বেসরকারী মূলধন গঠনে দুর্নীতির ভূমিকার ওপরে আলোকপাত করেছেন। বলার অপেক্ষা রাখেনা যে, বর্ধিত বেসরকারী

মূলধন কোন একটা দেশের রাজনৈতিক উন্নয়নের পূর্বশর্ত অর্থনৈতিক উন্নয়ন ত্বরান্বিত করতে মূল্যবান অবদান রাখে।

ঘুষ : ব্যবসায়ীদের অন্যতম অস্ত্র

অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় আমলাতন্ত্রের সাধারণতঃ সহায়তা করারই কথা। কিন্তু ব্যক্তিগত স্বার্থপরতা এবং লাল ফিতার দৌরাত্ম্য অধিকাংশ সময় আমলাদেরকে এ দায়িত্ব পালনে ধীর গতিসম্পন্ন করে তোলে। অর্থনৈতিক উন্নয়নের সহায়ক নীতিমালা গ্রহণে আমলাতন্ত্র সরকারকে প্রভাবিত করতে পারে, যদিও অনেকক্ষেত্রেই আমলাতন্ত্রের মধ্যে এ দায়িত্ব পালনে উৎসাহব্যঞ্জক সাড়া লক্ষ্য করা যায় না। দুর্নীতি এ সবক্ষেত্রে আমলাতন্ত্রের সক্রিয়তা বৃদ্ধিতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা নেয়। বেসরকারী উদ্যোগের সফলতা এবং দ্রুততা অনেকাংশেই আমলাতান্ত্রিক সহায়তার ওপরে নির্ভরশীল। দুর্নীতি, বিশেষ করে ঘুষ, উন্নয়নের সাথে সম্পর্কিত এ সকল আমলাতান্ত্রিক সহায়তা পেতে সহায়ক ভূমিকা রাখে এবং উদ্যোক্তাদের প্রায় প্রতিটি ক্ষেত্রকেই (বিশেষ করে লাইসেন্স পারমিট সংগ্রহ, ঋণ গ্রহণ, বৈদেশিক মুদ্রা সংগ্রহ প্রভৃতি) সহজ করে দেয়।[১২] অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে—যেমন, কোন শিল্প উদ্যোক্তা যদি রাজধানী উন্নয়ন কর্পোরেশনে একটা বাণিজ্যিক প্লটের জন্য দরখাস্ত করে চুপচাপ বসে থাকেন, তাহলে সংশ্লিষ্ট প্লট পাওয়া তার জন্য যেমন হতে পারে কষ্টকর, তেমনি হাউজ বিল্ডিং ফাইনান্স কর্পোরেশন গৃহ নির্মাণ ঋণের আবেদন ব্যক্তিগত তদবীর ব্যতিরেকে মঞ্জুর করানোর ব্যাপারটিও কষ্টকর। বিনা তদবীরে এ ধরনের উদ্যোগ সফল হলেও তা হয় যথেষ্ট বিলম্বিত। সংশ্লিষ্ট দপ্তরে ঘুষের ব্যবহার এ সকল প্রাপ্তিকে অধিকাংশক্ষেত্রেই নিশ্চিত, ত্বরান্বিত ও সহজ করে দেয়।

দুর্নীতির বৃদ্ধি সামাজিক ভারসাম্য সৃষ্টিতে সহায়ক

সকল এলাকায় দুর্নীতির বৃদ্ধি সামাজিক ভারসাম্য সৃষ্টিতে ভূমিকা রাখে। শুধুমাত্র কোর্ট-কাছারী, পুলিশ অফিস, কাস্টম অফিস এবং রেজিষ্ট্রি অফিসেই যদি দুর্নীতি সীমাবদ্ধ থাকে, তাহলে সমাজের অন্যান্য এলাকা ও শ্রেণীগুলোর মধ্যে বঞ্চনার মনোভাব গড়ে ওঠে। তার চেয়ে প্রশাসন, রাজনীতি, অর্থনীতি তথা সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রেই দুর্নীতির চর্চা হলে কোন একটা বিশেষ এলাকায় এ ধরনের বঞ্চনার মনোভাব গড়ে ওঠেনা। বরং সর্বক্ষেত্রে দুর্নীতি চর্চা সৃষ্টি করে এক ধরনের ভারসাম্য যা বিশেষ বিশেষ এলাকার উন্নয়ন কর্মসূচীকে হতাশাগ্রস্থ করার পরিবর্তে ত্বরান্বিত করে। দুর্নীতির সুযোগ শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ এলাকায় সীমাবদ্ধ থাকলে এ সকল এলাকার সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা কর্মচারীদের প্রতি অন্যান্য দুর্নীতির সুযোগবঞ্চিত এলাকাগুলোর কর্মকর্তা কর্মচারীবৃন্দ ঈর্ষাপরায়ণ হয়ে উঠবেন যা সার্বিক উন্নয়নকে অবশ্যই বাধাগ্রস্থ করবে। অন্যদিকে, এ সকল এলাকায় দুর্নীতির সম্ভাব্য সুযোগ সৃষ্টি সমাজের, প্রশাসনের প্রতিটা সদস্য সদস্যার মধ্যে পারস্পারিক সহমর্মিতা ও মানসিক শান্তির পরিবেশ তৈরী করে।

অর্থনৈতিক উন্নয়নে দুর্নীতির ভূমিকা

রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক উন্নয়নে দুর্নীতির অবদানমূলক ভূমিকা হান্টিংটনের লেখায় উল্লেখিত হয়েছে।[১৩] দুর্নীতির ইতিবাচক ভূমিকা সম্পর্কিত অবুইভা'র ব্যাখ্যাও এ প্রসঙ্গে

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

প্রণিধানযোগ্য। দুর্নীতি বিনিয়োগের মাত্রাবৃদ্ধিতে ভূমিকা রেখে অর্থনৈতিক উন্নয়নের বৃদ্ধি ঘটায়। উদ্যোক্তারা সবসময় ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তার মধ্যে বিনিয়োগ করেন। অব্রের মতে এ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা উন্নয়নশীল দেশগুলোতে অনেক বেশী।[১৫] দুর্নীতি এ ঝুঁকি ও অনিশ্চয়তা কমাতে পারে। বিনিয়োগের সংশ্লিষ্ট এলাকায় উৎপাদিত পণ্যসামগ্রীর ভবিষ্যত বাজার, চাহিদা ও সম্ভাবনার অগ্রিম ইঙ্গিত দিয়ে আমলাতন্ত্র বিনিয়োগকারীদের উৎসাহে মাত্রাবৃদ্ধি ঘটাতে পারে। দুর্নীতি এক্ষেত্রে ভবিষ্যতের সম্ভাবনাময় চাহিদার ক্ষেত্রগুলো পূর্বেই চিহ্নিত করে উদ্যোক্তাদেরকে সেক্ষেত্রে বিনিয়োগে আগ্রহী করতে ইতিবাচক ভূমিকা নিতে পারে, এবং এভাবে বিনিয়োগ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে অর্থনৈতিক উন্নয়নের গতিতে মাত্রা যোগ করতে পারে।

দুর্নীতি আমলাতান্ত্রিক সংহতি বৃদ্ধি করে

যে কোন সরকারের গৃহীত নীতিমালা বাস্তবায়নে আমলাদের ভূমিকা সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ। আমলাতন্ত্রের ভূমিকার সফলতা অনেকাংশেই নির্ভর করে আমলাতান্ত্রিক সংহতির ওপর। দুর্নীতির বৃদ্ধি আমলাতান্ত্রিক সংহতি গড়ে ওঠা ও জোরদার হওয়ার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতি আবার রাজনৈতিক দুর্নীতির সাথে জড়িত। রাজনৈতিক দুর্নীতি নিঃসন্দেহে সামাজিক দুর্নীতি থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এভাবে দুর্নীতি সকল এলাকার দুর্নীতিবাজদের মধ্যে অবৈধ লেনদেনের মধ্য দিয়ে পারস্পারিক সহমর্মিতা গড়ে তোলে যা আন্ত-অভিজন দ্বন্দ্ব (inter-elite conflict) হ্রাস করে এবং দুর্নীতিপরায়ন অভিজনশ্রেণীর মধ্যে সংহতি জোরদার করতে ভূমিকা নেয়। আমলাতান্ত্রিক সংহতির অভাবে সরকারী নীতিমালা বিপর্যয়ের সম্মুখীন হতে বাধ্য। দুর্নীতি এ বিপর্যয়ের সম্ভাবনা কমিয়ে দিচ্ছে এবং আমলাতন্ত্রের সদস্যদের মাঝে সংহতি গড়ে তুলছে। না বললেও চলে যে, প্রশাসনিক, রাজনৈতিক ও সামাজিক এলাকাসমূহে দুর্নীতির প্রভাবে ভিন্নভাবে গড়ে ওঠা সংহতি উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় জাতীয় সংহতিকে জোরালো করতে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখছে।

দুর্নীতি কর্মসংস্থানের প্রসার ঘটায়

দুর্নীতিকারীরা দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থ ফেলে রাখে না। অনেকক্ষেত্রেই এ অর্থকে আরো বাড়িয়ে তোলার জন্য এরা নূতনভাবে বিনিয়োগ করেন। আবার অনেকক্ষেত্রে নিজেদের দুর্নীতি ঢাকবার জন্যও দুর্নীতিবাজ প্রশাসকদেরকে অন্যক্ষেত্রে বিনিয়োগের মাধ্যমে অধিক উপার্জনের উৎস তৈরী করতে দেখা যায়। ফলে দুর্নীতির মাধ্যমে উপার্জিত অর্থে গড়ে ওঠে শিল্প, কল কারখানা ইত্যাদি। এ সকল শিল্প প্রতিষ্ঠানে কর্মসংস্থানের সুযোগ ঘটে অনেক বেকারের। এভাবে উন্নয়নশীল দেশের অন্যতম প্রকট সমস্যা বেকার সমস্যা লঘুকরণে দুর্নীতি পরোক্ষভাবে হলেও ইতিবাচক ভূমিকা রাখে।

রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনে দুর্নীতির অবদান

ঘন ঘন সরকার পরিবর্তন অনেক উন্নয়নশীল দেশের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। বলার অপেক্ষা রাখে না যে, এ বৈশিষ্ট্য রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা অর্জনের পথে বিরাট অন্তরায়। উন্নয়নশীল দেশের

সরকারসমূহ, বিশেষ করে সামরিক সরকারসমূহ নির্বাচনী দুর্নীতি চর্চার মধ্য দিয়ে অধিককাল ক্ষমতায় থাকার উদ্যোগ নেন এবং অধিকাংশ ক্ষেত্রেই এ উদ্যোগে তারা সফলতা পাওয়ার ব্যবস্থা করতে সমর্থ হন। সামরিকীকরণ প্রক্রিয়ার সর্বশেষ ধাপে সাধারণ নির্বাচন দেন এবং এ ধরনের নির্বাচনে দুর্নীতির (সন্ত্রাস, পেশী শক্তির ব্যবহার, আমলাতন্ত্রের সহায়তা ইত্যাদি) আশ্রয় গ্রহণ করে বিজয়ের ব্যবস্থা করেন। ফলে ক্ষমতা কাঠামোতে সরকারের পরিবর্তন বিলম্বিত হয়। এভাবে কৃত্রিম ও সাময়িক হলেও দুর্নীতির মধ্য দিয়ে এক ধরণের রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা গড়ে ওঠে।

উর্ধ্বতন-অধঃস্তন সম্পর্কের ভালো দিক

উর্ধ্বতন-অধঃস্তন সম্পর্ক (patron-client relation) দুর্নীতির চর্চাকে সহজ করে দেয়। এ সম্পর্কের বিভিন্ন দিক নিয়ে অনেক সমাজবিজ্ঞানীই আলোচনা করেছেন। এঁদের মধ্যে উলফ, জামান, বেইলী, চেঙ্গ, কুরভেটারিস ও ডোবরাজ এবং স্কটের নাম উল্লেখ করা যায়।[১৬] আধুনিক সংগঠনে, বিশেষ করে আমলাতন্ত্রে এ সম্পর্কের কার্যকারিতা তুলে ধরার ক্ষেত্রে আমার নিজের গবেষণা কাজটিও প্রণিধানযোগ্য। এ সম্পর্কের মাধ্যমে উর্ধ্বতনেরা অধঃস্তনদেরকে দিয়ে নিজেদের স্বার্থের অনুকূলে অন্যায় ও এখতিয়ারবহির্ভূতভাবে কাজ করিয়ে নেন। অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন, একজন ব্যাংক ম্যানেজার পিওনকে দিয়ে তাঁর বাড়ীর বাজার করাচ্ছেন, অথবা জনৈক উর্ধ্বতন কর্মকর্তা তাঁর অফিসের মালী বা পিওনকে দিয়ে তাঁর ব্যক্তিগত গাভীর পরিচর্যা করাচ্ছেন, ইত্যাদি। এ সম্পর্কের অপকারিতার ওপরে অনেকেই আলোকপাত করেছেন যার কিছু নমুনা ওপরে উল্লেখ করেছি। এতে চাকরি নীতিমালার (service rule) অমর্যাদা করা হয়, নিম্নতন কর্মচারীদের স্বাধীনতা থাকে না ইত্যাদি অনেক যুক্তিই এঁরা দিয়েছেন। কিন্তু এ দুর্নীতির কিছু ভালো দিকও রয়েছে। যেমন, উর্ধ্বতনদের সাথে এরকম সম্পর্কের ফলে নিম্নতনদের সম্পর্ক নিবিড় হয়ে ওঠে। এতে দুর্নীতির পরিমাণ বৃদ্ধি পেলেও নিম্নতনদের মন থেকে ভীতি ও সংকোচ দূর হয় এবং নিম্নতনেরা এক ধরনের নিরাপত্তা অনুভব করেন। যে উর্ধ্বতনের আদেশে এরা এখতিয়ার বহির্ভূতভাবে অন্যায় কাজ করে যান, বিপদাপদ হলে তিনি রক্ষা করবেন, এরকম একটা ধারনা (যদিও অধিকাংশক্ষেত্রে ভ্রান্ত) প্রবল থাকার কারণে নিম্নতনেরা মানসিক শান্তিতে কাজ করে যেতে পারেন। এ ধরনের মানসিক শান্তি কোন সংগঠনের কর্মচারীদের কাছ থেকে অধিক সেবা পাওয়ার জন্য যথেষ্ট প্রয়োজনীয়। এছাড়া রাজনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায়ও প্রভু অধঃস্তন সম্পর্ক পরোক্ষভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রাখতে পারে।

দুর্নীতি কল্যাণমূলক তৎপরতা বৃদ্ধি করে

দুর্নীর্তির ফলে সমাজসেবামূলক ও কল্যাণমূলক প্রতিষ্ঠানের কর্মতৎপরতা বৃদ্ধি পায়। দুনীর্তিকারীরা অসৎ উপায়ে উপার্জিত অর্থের কল্যাণমূলক ব্যবহারের মধ্য দিয়ে তাদের অর্থনৈতিক চেহারাটা ঢেকে রাখতে প্রয়াস পান। তাছাড়া ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকেও দুর্নীতিবাজরা মানসিক অশান্তিতে থাকেন। দুর্নীতিকর্মের অন্যায় থেকে পরিত্রাণ পেতে এরা দান খয়রাত করেন এবং অনেকক্ষেত্রে সমাজকল্যাণমূলক বা ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানে বড় অংকের চাঁদা দিয়ে মানসিক শান্তি খোঁজেন। ফলে, দুর্নীতির কারণে অনেকক্ষেত্রে সমাজ সেবামূলক ও কল্যাণমূলক তৎপরতা বৃদ্ধি পায়।

দুর্নীতি কর্মকর্তা কর্মচারীদের ব্যবহার সুন্দর করে

দুর্নীতি কর্মকর্তা কর্মচারীদের ব্যবহার মার্জিত ও পরিশীলিত করে। দুর্নীতিতে জড়িত পার্টির কাছ থেকে অবৈধ অর্থ আদায়ের পরিবেশ তৈরী করার জন্য কর্মকর্তা কর্মচারীদেরকে সংশ্লিষ্ট পার্টির সাথে সুন্দর ব্যবহার করতে হয়। তা ছাড়া ঘুষের বিনিময়ে কোন কাজ করে দেবার জন্য একাধিক কর্মকর্তা কর্মচারীর ভেতরে অনেকক্ষেত্রে প্রতিযোগিতা চলে। ফলে কর্মকর্তা কর্মচারীরা আকর্ষণীয় ব্যক্তির ও সুন্দর ব্যবহারের প্রতিযোগিতা করে পার্টির আস্থা অর্জন করতে প্রয়াস দান। এভাবে দেখা যায় যে দুর্নীতিবাজ কর্মকর্তা কর্মচারীদের সুন্দর ব্যবহারের পেছনে দুর্নীতির একটা ইতিবাচক ভূমিকা থাকে।

স্বজনপ্রীতির ভালো দিক

উন্নয়নশীল দেশগুলোর প্রশাসনে স্বজনপ্রীতির চর্চা কোন নূতন ব্যাপার নয়। এ দেশগুলোর প্রশাসনে নিয়োগ, পদোন্নতি,বদলী প্রভৃতিসহ অন্যান্য সুযোগ সুবিধা বন্টনের ক্ষেত্রেও স্বজনপ্রীতির ব্যবহার লক্ষিত হয়। উর্দ্ধতনদের প্রতি অধঃস্তনদের আনুগত্য কোন সংগঠনের সুষ্ঠু কার্যকারিতার জন্য খুবই প্রয়োজনীয়। স্বজনপ্রীতি কর্মকর্তা কর্মচারীদের এবং আনুগত্য বৃদ্ধিতে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে। স্বজনপ্রীতির মাধ্যমে সুযোগ লাভকারী ব্যক্তি সুযোগদাতা ব্যক্তির প্রতি ঔদ্ধত্য প্রকাশ করার পরিবর্তে সবসময় অনুগত থাকেন। তাছাড়া এ প্রক্রিয়ায় সুযোগদাতা এবং সুযোগ লাভকারীর মধ্যে একটা সুন্দর সমঝোতার সম্পর্ক গড়ে ওঠে যা এদের নির্দিষ্ট কর্মতৎপরতায় সাবলীলতা আনে।

বাংলাদেশে দুর্নীতির নেতিবাচক ভূমিকা

দুর্নীতি গবেষকদের প্রায় সকলেই দুর্নীতির অকল্যাণকর দিকগুলোর ওপরে আলোকপাত করেছেন এবং দুর্নীতির ক্ষতিকারক দিকগুলো থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য প্রয়োজনীয় পরামর্শ দিয়েছেন। নিম্নে আমি বাংলাদেশের দুর্নীতির উল্লেখযোগ্য নেতিবাচক দিকসমূহ তুলে ধরবো।

দুর্নীতিজড়িতদের নৈতিক মনোবল হ্রাস পায়

দুর্নীতিজড়িত ব্যক্তিগণ সাময়িকভাবে দুর্নীতির মাধ্যমে অবৈধ অর্থোপার্জনের মধ্য দিয়ে আর্থিক স্বচ্ছলতা অর্জন করেন ঠিকই, কিন্তু এর ফলে এদের প্রায় সকলেরই নৈতিক মনোবল হ্রাস পায়। ফলে মানসিকভাবে এরা দুর্বলতায় ভোগেন। সেজন্যে, সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের দুর্নীতি প্রতিরোধে এরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রাখতে পারেন না। একধরণের অপরাধবোধ, ও ভীতি নিজেদের মধ্যে সক্রিয় থাকার কারণে দুর্নীতি প্রতিরোধের পরিবর্তে দুর্নীতির সহায়ক হিসাবে ভূমিকা পালনেই এরা অভ্যস্থ হয়ে ওঠেন।

দুর্নীতি সামাজিক নৈরাজ্য প্রশস্ত করে

দুর্নীতি ক্যান্সারের মত ভয়াবহ সমাজরোগ। এক সরকারী বিভাগ বা এলাকায় দুর্নীতি প্রতিরোধ করতে না পারলে অন্য সরকারী বিভাগ বা এলাকায় এর সংক্রমণ ঘটতে বাধ্য। এভাবে এক সময়

সমগ্র সমাজ দুর্নীতি কবলিত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে অনেক উদাহরণ দেয়া যেতে পারে। যেমন, ১৯৫০, ১৯৬০ এমনকি ১৯৭০ এর দশকের প্রথমদিকেও শিক্ষা ও বিচার বিভাগে উল্লেখযোগ্য হারে দুর্নীতির সংক্রমণ ছিল না। কিন্তু অন্যান্য এলাকায় (বিশেষ করে, রাজনীতি, প্রশাসন ইত্যাদি) দুর্নীতি ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধির ফলশ্রুতিতে সম্প্রতি শিক্ষা, বিচার প্রভৃতি বিভাগসহ সমাজের সকল স্তর দুর্নীতিকবলিত হয়ে পড়ছে। দুর্নীতি মাধ্যমে বোর্ডের পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করাও এখন অর বিচিত্র কিছু না।[১৯] দুর্নীতির ধর্মই এরকম। দুর্নীতিকে কঠোর হাতে দমন না করতে পারলে এর বিস্তার ঘটে সমাজের সকল শিরা উপশিরায় এবং এভাবে সৃষ্টি হয় সামাজিক নৈরাজ্য।

সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে দুর্নীতি বাধা সৃষ্টি করে

উন্নয়নশীল দেশগুলোতে সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনা সবসময় নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জন করতে পারেনা। সরকারী পরিকল্পনার নির্দিষ্ট লক্ষ্য অর্জনের পথে বাধা সৃষ্টিকারী বৈশিষ্ট্যগুলোর মধ্যে দুর্নীতি অন্যতম। উন্নয়ন কার্যক্রমে বরাদ্দ অর্থের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ আমলাতান্ত্রিক দুর্নীতির চাহিদা পূরণে ব্যয়িত হয়। তাছাড়া, উৎপাদানের লক্ষ্যমাত্রা অর্জনেও দুর্নীতি প্রতিবন্ধক হিসেবে ভূমিকা রাখে। শিল্প কারখানার প্রসার ও উৎপাদন বৃদ্ধি ব্যাহত হয় দুর্নীতির কারণে। উদাহরণ হিসাবে বলা যায় যে, সীমান্ত দুর্নীতি, বিশেষ করে প্রতিবেশী ভারতের সাথে চোরাচালান টেক্সটাইল শিল্পের বিকাশকে ব্যাহত করছে। চোরাপথে দুর্নীতিবাজরা ভারতীয় কাপড় নিয়ে আসার ফলে দেশী কাপড়ের বাজার নষ্ট হচ্ছে ফলে অগ্রসর হতে পারছেনা দেশীয় শিল্প।[২০] এ প্রক্রিয়ায় স্বদেশী দ্রব্যসামগ্রীর উৎপাদন কমে যাচ্ছে। এভাবে দুর্নীতি সরকারী উন্নয়ন পরিকল্পনার লক্ষ্য অর্জনে বাধার সৃষ্টি করছে।

দুর্নীতি প্রশাসনিক অচলাবস্থার সৃষ্টি করে

প্রশাসনিক দুর্নীতি সহজ সরল গ্রামবাসীকে প্রশাসন বিমুখ করে তোলে যা প্রশাসনে গণঅংশগ্রহণের মাধ্যমে গ্রামীণ উন্নয়নের সরকারী লক্ষ্যকে ব্যাহত করে। তাছাড়া প্রশাসনের অভ্যন্তরে প্রচলিত দুর্নীতি প্রশাসনে অযোগ্য কর্মকর্তা কর্মচারীর সমাবেশ ঘটায়। উদাহরণ হিসাবে প্রশাসনিক পদগুলোতে নিয়োগ, পদোন্নতি ও বদলীর ক্ষেত্রে দুর্নীতি ও স্বজনপ্রীতির কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। নিয়োগ ও পদোন্নতিতে দুর্নীতির ফলে উচ্চপদস্থ সরকারী পদগুলোতে অযোগ্য ব্যক্তিত্বের আগমন ঘটে। এতে একদিকে যেমন দেখা দেয় প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে জটিলতা, অন্যদিকে এ রকম নিয়োগ ও পদোন্নতি তুলনামূলকভাবে অধিকতর যোগ্য প্রার্থীদের মধ্যে হতাশার সৃষ্টি করে। প্রশাসনিক কর্মকর্তারা ঘুষ প্রদানকারীদের সাথে তুলনামূলকভাবে ভাল ব্যবহার করেন। এতে সার্বিকভাবে প্রশাসনিক দায়িত্বশীলতা হ্রাস পায়। দুর্নীতি এ সকল প্রক্রিয়ায় প্রশাসনিক অঙ্গনে সার্বিকভাবে অচলাবস্থা সৃষ্টি করে।

দুর্নীতি জীবননাশের কারণ হতে পারে

অনেক দুর্নীতিকারী ''জীবন বাঁচাবার জন্য দুর্নীতি করছি'' বলে নিজের দুর্নীতিকর্মের অপরাধকে হালকা করে দেখাবার প্রয়াস পান। কিন্তু ক্ষেত্রবিশেষে দুর্নীতির চর্চাই জীবননাশের কারণ হতে পারে। উদাহরণ হিসাবে কৃত্রিম সংকট সৃষ্টিজনিত কারণে দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধির কথা বলা যেতে পারে।

যুদ্ধ বিধ্বস্ত এবং বন্যা কবলিত অসহায় মানুষের রিলিফ সামগ্রী নিয়ে এদেশে কম দুর্নীতি হয়নি। দুর্নীতি হয়েছে শিশুখাদ্যে এবং জীবনরক্ষাকারী ওষুধের মত প্রয়োজনীয় সামগ্রীতে ভেজাল মিশিয়ে। না বললেও চলে যে, এ সকল দুর্নীতি অসংখ্য জীবনের অবসান ঘটিয়েছে। উল্লেখ করা অপ্রাসঙ্গিক হবেনা যে, আমেরিকার দেয়া খাদ্য সাহায্যের মাত্র শতকরা ১০ ভাগ পৌঁছেছে সে সকল গ্রামীণ দরিদ্রের হাতে যাদের এ সাহায্য খুবই প্রয়োজন। বাকী শতকরা ৯০ ভাগ সাহায্য শহর এলাকায় বিতরণ করা হয়েছে।[২১]

দুর্নীতি নির্মাণ কাজের স্থায়িত্ব কমিয়ে দেয়

দুর্নীতির ফলে তৈরী দালানকোঠা, রাস্তা, সেতু ইত্যাদি সহ যে কোন নির্মাণকাজের স্থায়িত্ব কমে যায়। অসৎ ঠিকাদারেরা নির্মাণ সামগ্রীর উপাদানের পরিমাণে কারচুপি ঘটিয়ে নিজেরা লাভবান হওয়ার প্রয়াস পান। ফলে, অনেক ক্ষেত্রে ইটের গাঁথুনিকাজে সিমেন্ট ও বালির অনুপাত ১ ঃ ৬ দেয়ার কথা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে ১ ঃ ১০ বা তারও বেশী দেয়া হয়। একইভাবে এক নম্বর ইট ব্যবহার করার কথা থাকলে দুই নম্বর ইটের ব্যবহার, ঢালাইকাজে যে পরিমাণ লোহার শিক ব্যবহার করার কথা তার চেয়ে কম ব্যবহার করা ইত্যাদি এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। অসৎ ঠিকাদারেরা নিজেদের ব্যক্তিগত মুনাফার জন্য এ জাতীয় কাজ করেন এবং ঘুষের মাধ্যমে তদন্তকারী কর্মকর্তার রিপোর্ট নিজেদের কাজের অনুকূলে করিয়ে নেন। ঠিকাদরী ব্যবসায় দুর্নীতির এটা একটা বহুল প্রচলিত ভঙ্গিমা। সঙ্গত কারণেই এ রকম নির্মাণ কাজ কাংখিত স্থায়িত্ব দিতে পারেনা এবং সাথে সাথে জাতীয় ক্ষতির কারণ হয়ে দাঁড়ায়।

দুর্নীতি সুস্ঠু প্রতিযোগিতা সৃষ্টির পথে অন্তরায়

রাজনৈতিক উন্নয়নের জন্য সুস্থু প্রতিযোগিতা অনুকূল পরিবেশ তৈরী করে। পক্ষপাতিত্ব ও স্বজনপ্রীতি সুস্থু প্রতিযোগিতার পথে বাধা হিসাবে কাজ করে। প্রশাসনিক পদে নিয়োগ, পদোন্নতি থেকে শুরু করে সমাজের প্রতিটি ক্ষেত্রে স্বজনপ্রীতির চর্চা দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে কমবেশী প্রচলিত। বাংলাদেশী সমাজের প্রতিটি অঙ্গনেই স্বজনপ্রীতির চর্চা লক্ষ্যণীয়। স্বজনপ্রীতি এখানে শুধু আত্মীয়তা নির্ভর নয়। আঞ্চলিকতা, ধর্ম, জেলাপ্রীতির (একই জেলায় বসবাসকারী অধিবাসীদের প্রতি বিশেষ পক্ষপাতিত্ব) সূত্র ধরেও এখানে স্বজনপ্রীতির চর্চা লক্ষ্যণীয়।[২২] প্রশাসন, রাজনীতি, শিক্ষাসহ প্রতিটি ক্ষেত্রে তুলনামূলকভাবে অযোগ্যদেরকে বিশেষ সুযোগ দেয়া হলে প্রতিযোগিতার মেজাজ ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং এতে তুলনামূলকভাবে যোগ্য প্রতিযোগীদের উদ্যম ব্যাহত হয়ে তাদের মধ্যে দেখা দেয় হতাশা যা যে কোন সংগঠনের সুস্থু পরিচালনার পথে অন্তরায় সৃষ্টি করে।

ধর্মীয় দৃষ্টিকোণ থেকে দুর্নীতি মানসিক অশান্তি সৃষ্টি করে

দক্ষিণ এশীয় দেশগুলোতে ধর্ম একটা বিরাট শক্তি হিসাবে কাজ করে। এ অঞ্চলের অধিবাসীদের মধ্যে ধার্মিকতা ও ধর্মচর্চার প্রবণতা তুলনামূলকভাবে পৃথিবীর অন্যান্য এলাকার অধিবাসীদের চেয়ে বেশী। দুর্নীতিকে কোন ধর্মই নৈতিকভাবে সমর্থন দেয়না। ফলে, ধর্মবিশ্বাসী দুর্নীতিকারীরা মানসিক অশান্তিতে ভোগেন। বাংলাদেশের শতকরা প্রায় ৮৫ জনের ধর্ম ইসলাম। এ

ধর্মে দুর্নীতিকর্মের বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করা হয়েছে এবং পবিত্র কোরানে দুর্নীতিবাজদের কঠিন শাস্তির কথা বলা হয়েছে। ইসলাম ধর্মে সব সময় সৎ উপার্জনের ওপরে গুরুত্বারোপ করা হয়েছে এবং বলা হয়েছে যে, অসৎ উপার্জনকারীদের কোন ইবাদাত আল্লাহ্‌র দরবারে কবুল হবেনা। অন্যান্য ধর্মেও দুর্নীতিকে সম্পূর্ণ প্রত্যাখ্যান করা হয়েছে। দুর্নীতিকারীদের একটা বড় অংশ ধর্মবিশ্বাসের কারণে সব সময় মানসিক অস্বস্তিতে ভোগেন। কাজেই দুর্নীতি সাময়িক আর্থিক স্বাচ্ছন্দ আনলেও প্রকৃত প্রস্তাবে এ সমাজরোগ সংশ্লিষ্টদেরকে মনস্তাত্বিকভাবে ভেতরে ভেতরে দূর্বল করে তোলে। ফলে, এতে দুর্নীতিবাজদের কর্মস্পৃহা ও উদ্যম হ্রাস পায় যা সার্বিকভাবে উন্নয়ন কার্যক্রমকে বিঘ্নিত করে।

সামাজিক দুর্নীতি সৃষ্টি করে ভীতির পরিবেশ

হত্যা, লুণ্ঠন, ডাকাতি, রাহাজানি, নারী অপহরণ, ধর্ষণ, ছিনতাই ইত্যাদি সম্প্রতি দৈনিক পত্রিকার নিত্তনৈমিত্তিক খবর। সংবাদপত্রের হিসাব অনুযায়ী (উল্লেখ করা প্রয়োজন সে সব খবর সংবাদপত্রে আসেনা) শুধুমাত্র, রাজধানীতেই বছরে প্রায় ৩৬৫০ টি ছোটবড় ছিনতাই সংঘটিত হয়।[২৫] এ সকল সামাজিক দুর্নীতি সমাজে অরাজকতা ও ভীতিময় পরিবেশ তৈরী করে। ফলে, যুগপৎ স্বাভাবিক জীবনযাত্রা এবং রাষ্ট্রীয় উন্নয়ন কার্যক্রম ব্যহত হয়।

ব্যক্তির সাময়িক উন্নতি ঘটালেও দুর্নীতি সমাজ ও দেশের ক্ষতি করে

বিনিয়োগ বৃদ্ধির মধ্য দিয়ে দুর্নীতি উন্নয়ন ত্বরান্বিত করে বলে যে দাবী করা হয় তা আমাদের দেশের জন্য সঠিক নয়। ছোট ছোট দুর্নীতিকারীরা বিনিয়োগের কথা চিন্তা করে না। এরা দুর্নীতির মাধ্যমে অর্জিত অর্থে নিজেদের প্রাত্যহিক জীবনের স্বাচ্ছন্দ ও বিলাসিতাকে ধরে রাখেন এবং বাড়িয়ে তোলেন। বড় বড় দুর্নীতিকারীর (যাদের শিল্পখাতে বিনিয়োগ করার কথা) রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতা উদ্ভাবিত অনিরাপত্তাজনিত কারণে স্বদেশে বিনিয়োগ করার পরিবর্তে সঞ্চিত অর্থ অসৎ উপায়ে বিদেশী ব্যাংকে জমানো বেশী নিরাপদ মনে করছেন। অতি সাম্প্রতিককালে এ প্রক্রিয়া সক্রিয়ভাবে কাজ করছে এবং ইতিমধ্যেই আমাদের কেউ কেউ এ প্রক্রিয়ায় ২০০০ কোটি টাকা বিদেশে পাচার করেছেন বলে অভিযোগ উঠেছে।[২৬] কাজেই, দুর্নীতি কিছু দুর্নীতিকারীর উচ্চাভিলাষ পূরণে ভূমিকা রাখলেও সার্বিকভাবে দেশ ও জাতির অমঙ্গল করছে।

সমালোচনা ও মূল্যায়ন

দুর্নীতির সংশোধনবাদীরা দুর্নীতি উন্নয়ন কার্যক্রম ত্বরান্বিত করার ক্ষেত্রে ইতিবাচক ভূমিকা রাখে বলে যে মত দিয়েছেন তাঁরা আজ নূতন ভাবে সমালোচিত হচ্ছেন।অনেক আগেই এ মতামত যথাযথ সমালোচনার সম্মুখীন হয়েছে। উদাহরণ হিসাবে টিলম্যান এ শ্রেণীর গবেষণা মতামতকে অগভীর গবেষণা, বেপরোয়া মূল্যায়ন এবং শিথিলভাবে গ্রন্থিত ষড়যন্ত্র বলে সমালোচনা করেছেন।[২৭] সিঙ্গাপুরের শ্রম ও বিদেশমন্ত্রী এস, রাজারত্নাম দুর্নীতির এ সকল সংশোধনবাদীদের প্রচেষ্টাকে পাশ্চাত্যের বুদ্ধিজীবীদের উদ্ভাবিত এশিয়া ও আফ্রিকার পশ্চাতপদতাকে চিরন্তন করার

নূতন কৌশল হিসাবে আখ্যা দিয়েছেন। তাঁর বক্তব্যের অংশ বিশেষ সুপ্রণিধানযোগ্যতার কারণে এখানে তুলে ধরা প্রাসঙ্গিক হবে। তিনি বলেন ঃ

I think it is monstrous for these well-intentioned and largely misguided scholars to suggest corruption as a practical and efficient instrument for rapid development in Asia and Africa. Once upon a time, Westerners tried to subjugate Asia.... by selling opium the current defense of kleptocracry is a new kind of opium by some Western intellectuals, devised to perpetuate Asian backwardness and degradation. I think the only people... pleased with the contributions of these scholars are the Asian kleptocrats.[28] বাংলাদেশে সংখ্যায় অতি অল্প হলেও যারা দুর্নীতির সংশোধনবাদীদের বক্তব্যের প্রতিধ্বনি করেন, তারা এদেশের দুর্নীতিকারীদেরই একাংশ, এবং এদের এ কাজ করার উদ্দেশ্য নিজেদের দুর্নীতিকর্ম ঢাকা দেয়ার অপচেষ্টা ছাড়া অন্য কিছু নয়।

বাংলাদেশের দুর্নীতির ইতিবাচক ও নেতিবাচক দিকসমূহ অনুসন্ধানের পর বলা যায় যে, দুর্নীতি এদেশের উন্নয়নের জন্য মোটেও সহায়ক নয়। এখনে দুর্নীতির উল্লেখযোগ্য ইতিবাচক ভূমিকা রয়েছে এবং তা ক্ষেত্রবিশেষে উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করছে বলে মনে হলেও প্রকৃতপক্ষে দুর্নীতি পরিকল্পিত উন্নয়নের ভিত ভেঙ্গে দিচ্ছে এবং সামাজিক অসাম্য ও নৈরাজ্য সৃষ্টিতে অবদান রাখছে। দুর্নীতি উচ্চপদস্থ (সামরিক ও বেসামরিক) আমলাতন্ত্রের ব্যক্তিগত সুখ স্বাচ্ছন্দের নিশ্চয়তা বিধান করছে, কিন্তু আপামর জনসাধারনের প্রতি এ শ্রেণীর দায়িত্বশীলতা ও সেবাকে করে তুলেছে কৃত্রিম ও বিকৃত। দুর্নীতি সংক্রামক হলেও সমাজ ও প্রশাসনের সকল শাখায় দুর্নীতি চর্চার সমান সুযোগ না থাকার কারণে দুর্নীতি শুধুমাত্র বিশেষ বিশেষ বিভাগ বা শাখার বিশেষ বিশেষ পদাসীনদের উচ্চাভিলাষ পূরণে ইতিবাচক ভূমিকা পালন করছে। ফলে, সমাজের সদস্যদের মধ্যে সার্বিকভাবে অসাম্য, মানসিক অশান্তি ও হতাশার জন্ম ও বিস্তার ঘটেছে। স্বজনপ্রীতি, উর্ধ্বতন-অধঃস্তন সম্পর্ক, প্রভৃতি ভঙ্গিমায় চর্চিত দুর্নীতির ইতিবাচক ভূমিকা থাকলেও উন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় সুষ্ঠু প্রতিযোগিতার মেজাজ তৈরীর প্রক্রিয়া এতে বিঘ্নিত হচ্ছে। তাছাড়া এ সকল অবৈধ উপায় চাকরিপ্রাপ্তদের কাংখিত যোগ্যতা বা নৈতিক মনোবল কোনটাই থাকছেনা। দুর্নীতি বিনিয়োগের মাধ্যমে অর্থনৈতিক উন্নয়নকে ত্বরান্বিত করে এ ধারণাও বাংলাদেশের জন্য সঠিক নয়। কারণ, রাজনৈতিক অস্থিতিশীলতাজনিত কারণে বড় বড় দুর্নীতিকারীরা সম্প্রতি স্বদেশে বিনিয়োগের ঝুঁকি গ্রহনের চেয়ে বিদেশী ব্যাংকে টাকা জমানোকেই বেশী পছন্দ করছেন। দুর্নীতিবাজরা ব্যক্তিগত চাহিদার তুলনায় অধিক উপার্জন করলেও, এদের একটা বড় অংশ ধর্মবিশ্বাসের কারণে সব সময় মানসিক অশান্তিতে ভুগছেন। রাজনৈতিক দুর্নীতি যেমন, সরকারের প্রতিশ্রুতিভঙ্গ, নির্বাচনী দুর্নীতি ইত্যাদি সরকারের প্রতি জনগনের আস্থা কমিয়ে দিয়েছে, ফলে সরকারী কর্মসূচীতে গণঅংশগ্রহণ হচ্ছে বিঘ্নিত। এ ভাবে দেখা যায় যে, দুর্নীতির অকল্যাণকর ভূমিকা সহজেই এর কল্যাণকর ভূমিকাকে অতিক্রম করে। সেজন্য দুর্নীতিকে আজ বিশ্বব্যাপী উন্নয়নের অন্যতম উল্লেখযোগ্য সমস্যা হিসাবে চিহ্নিত করা হয়েছে। ভারতীয় গবেষকরা দুর্নীতিকে যথার্থই বহুমুখী দৈত্যের (multi-faced monster) সাথে তুলনা করে এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণার কোন বিকল্প নেই বলে অভিমত দিয়েছেন। বাংলাদেশের

স্বাধীনতাত্তোরকালের প্রতিটি সরকারই দুর্নীতি প্রতিরোধে সফলতা না পেলেও দুর্নীতির বিরুদ্ধে কঠোর হুশিয়ারী উচ্চারণ করতে কার্পণ্য করেননি।

উপসংহার

বাংলাদেশের ক্ষেত্রে দুর্নীতির সংশোধনবাদী এবং তাঁদের এ দেশীয় সমর্থকদের (যদিও এদের সংখ্যা অত্যন্ত কম এবং তারা দুর্নীতিকারীদেরই একাংশে সীমাবদ্ধ) বক্তব্য মোটেও সঠিক নয়। উন্নয়নে সহায়তা করার পরিবর্তে দুর্নীতি এখানে উন্নয়ন কার্যক্রমকে বিঘ্নিত ও বিলম্বিত করছে। সমাজের বিভিন্ন শাখায়, বিশেষ করে প্রশাসন ও রাজনীতিতে এ সমাজব্যাধির সংক্রমণ ও প্রতিষ্ঠা সৃষ্টি করেছে এক সামাজিক নৈরাজ্য। দেশের উন্নয়নকে নিশ্চিত ও ত্বরান্বিত করতে হলে দুর্নীতি প্রতিরোধের কোন বিকল্প নেই। মুখে মুখে দুর্নীতির বিরুদ্ধে জ্বিহাদ ঘোষণা করে কাজকর্মে দুর্নীতি চর্চার পরিবেশ তৈরী করে দিলে যে দুর্নীতি আরো বাড়বে তা বাংলাদেশের স্বাধীনতাত্তোরকালে বেসামরিক ও সামরিক শাসনামলে প্রমাণিত হয়েছে। সেজন্য দুর্নীতির বিরুদ্ধে মৌখিক জ্বিহাদ ঘোষণা না করে, দুর্নীতির সংশোধনবাদীদের উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ষড়যন্ত্রমূলক বক্তব্যে বিভ্রান্ত না হয়ে, সাম্প্রতিক বাংলাদেশের অন্যতম প্রধান সমস্যা দুর্নীতিকে কিভাবে সীমিত করা যায় সে ব্যাপারে দেশ ও জাতির কল্যাণকামী সকলের চিন্তাভাবনা করা দরকার।

তথ্য সংকেত

১। দুর্নীতি প্রতিরোধ প্রচেষ্টার জন্য দেখুন, Robert Klitgaard, Controlling Corruption (Berkeley : University of Colifornia Press, 1988) ; John B. Monteiro, Corruption : Control of Maladministration (Bombay : P.C. Manaktala And Sons Pvt. ltd., 1966) ; Robert Klitgaard, "Managing the Fight Against Corruption : A Case Study," Public Administration and Development, 44 (1) 1984, পৃষ্ঠা 77 - 98 ; R.B. Jain, "Fighting Political Corruption : The Indian Experience." The Indian Political Science Review, 17 (132) 1989, পৃষ্ঠা -215-28. B Peter Pashigian, "On the Control of Crime and Bribery." The Journal of Legal Studies 4 (2) 1975 পৃষ্ঠা 311-26 ; C.J. Davies, "Controlling Administrative Corruption," Planning and Administration 14 (2) 1987, পৃষ্ঠা 62-66.

২। দুর্নীতির ইতিবাচক ভূমিকার জন্য দেখুন, Michael Beenstock, "Corruption and Development," World Development 7(1) 1979 পৃষ্ঠা 15-22. Gabriel Ben-dor, "Corruption, Institutization, And Political Development : The Revisionist Thesis Revisited," Comparative Political Studies 7 (1) 1974 পৃষ্ঠা 63-87. Charles A. Schwartz," Corruption and Political Development in the U.S.S.R., " Comparative Politics, 11 (4) 1979 পৃষ্ঠা 425-43. John Waterbury, "Corruption, Political Stability and Development : Comparative Evidence From Egypt and Morocco," Government and Opposition, 11 Autumn 1979 পৃষ্ঠা 426-45. Robert O. Tilman, Emergence of Black-Market Bureaucracy : Administration, Development, and Corruption in the New States," Public Administration Review, 27(5) 1968 পৃষ্ঠা 437-44. Samuel P. Huntington," Modernization and Corruption," সন্নিবেশিত হয়েছে, Political order in Chaniel H. Leff," Economic Development through Bureaucratic Corruption," American Behavioral Scientist, 8(3) 1964 পৃষ্ঠা 8-14 ; Jose Veloso Abueva, "The Contribution of Nepotism, Spoils, and Graft to Political Development, " East - West Center Review, 3(3) 1966 পৃষ্ঠা 45-59 ; J.S. Nye, "Corruption and Political Development : A Cost-Benefit Analysis," American Political Science Review, 90(2) 1967, পৃষ্ঠা 417-27 ; David Bayley, "The Effects of Corruption in a Development Nation," Western Political Quarterly, 19(4) 1966 পৃষ্ঠা 726-30.

৩। J.S.Nye, "Corruption and Political Development : A Cost-Benefit Analysis," প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা 419.

৪। এ সংজ্ঞাটির ওপরে গুরুত্বারোপকারী দুর্নীতি গবেষক এবং তাঁদের কাজগুলির জন্য দেখুন, Kated Gillespie & Gwenn Okruwik, "Cleaning up Corruption in the Middle East, "The Middle East Journal, 42 (1) 1988, পৃষ্ঠা 59 ; Michael Johnston, Political Corruption and Public Policy in America (Colifornia : Brooks/ Cole Publishing Company, 1982) পৃষ্ঠা -৮.

৫। Tevfik F. Nas এবং তাঁর সহযোগীবৃন্দ, "A Policy-Oriented Theory of Corruption, "American Political Science Review, 80(1) 1986 পৃষ্ঠা 108.

৬। Michael Johnston, "The Political Consequences of Corruption, "Comparative Politics, 18(4) 1986 পৃষ্ঠা 460.

৭। ঐ, পৃষ্ঠা 460.

৮। দেখুন, "Report of the Committee on Prevention of Corruption, "Comparative Politics, 18(4) 1986 পৃষ্ঠা 5.

৯। উদাহরণ হিসাবে দেখুন, Muhammad Yeahia Akhter, "Styles of Administrative Corruption : The case of a Bangladeshi Organization" ; Politics, Administration and Change, 7(1) 1987 পৃষ্ঠা 61-76.

১০। প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, David H. Bayley, "The Effects of Corruption in a Developing Nation," প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা – 728.

১১। J.S. Nye, "Corruption and Political Development : A Cost-Benefit Analysis," প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা - 417-27.

১২। প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, Nathaniel H. Left, Economic Development Through Bureaucratic Corruption in Sub-Saharan Africa : Toward a Search for causes and consequences (Washington D.C : University Press of America Inc., 1979) পৃষ্ঠা 331.

১৩। দেখুন, Monday U. Ekpo সম্পাদিত, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা 308

১৪। Jose Abueva, "The Contribution of Nepotism, Spoils, and Graft to Political Development," East-West Center Review, 111, 1966, পৃষ্ঠা - 45-54, উল্লেখিত হয়েছে, Monday U. Ekpo সম্পাদিত, পুর্বোক্ত, পৃষ্ঠা 308.

১৫। H.C. Aubery, "Investment Decisions in Underdeveloped Countries," সন্নিবেশিত হয়েছে, Capital Formation and Economic Growth (Princeton : National Bureau of Economic Research, 1955) পৃষ্ঠা 404-15.

১৬। দেখুন, Eric R. Wolf, The Social Anthropology of Complex Societies (cambridge : University Press, 1966) ; M. Q. Zaman, "Patron-Client Relations : The Dynamics of Political Action," Asian Profile, 11(6) 1983. পৃষ্ঠা -604-16 ; C.A. Bayley," Patrons and Politics in Northern India," Modern Asian Studies, 7(3)1973, পৃষ্ঠা - 349-88. Peter P. Cheng, "Political Clientelism in Japan." Asian Survey, 28(4) 1988, পৃষ্ঠা ৪৭১–৮৩ ; George : "A Three Paradigm Approach to Political Clientelism," East European Quarterly, 18(1) 1984, পৃষ্ঠা -35-59 ; James C. Scott," Patron-Client Politics and Political change," Uphoff & Illchman সম্পাদিত, The Political Economy of Development (Berkeley and Los Angles : University of Colifornia Press, 1972).

১৭। মুহাম্মদ ইয়াহ্‌ইয়া আখতার, "সংগঠনের পদসোপানী কাঠামোতে প্রভু-অধস্থন সম্পর্ক : একটি বাংলাদেশী নমুনা, লোক, ১(১) ১৯৮৫ পৃষ্ঠা – ২৩–৪২।

১৮। প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, Simcha B. Werner, "New Directions in the study of Administrative Corruption," Public Administration Review, 43(2)1983, পৃষ্ঠা ১৪৮.

১৯। দুর্নীতির মাধ্যমে ১৯৮৮ সালের এস, এস, সি, পরীক্ষায় এবং একই বছরের এইচ, এস, সি, পরীক্ষায় দশম স্থান অর্জন সম্পর্কিত তথ্যের জন্য দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ১৭ই অক্টোবর, ১৯৮৯।

২০। সীমান্ত চোরাচালানের খুব কমই সীমান্ত রক্ষীদের হাতে ধরা পড়ে। শুধুমাত্র ১৯৮৯ সালে বাংলাদেশ রাইফেলস্ কর্তৃক আটককৃত বাইরে থেকে দেশের অভ্যন্তরে আসা (incoming) বিভিন্ন পণ্যের মূল্য ছিল মোট ১০৯,২৪,২০,৭১২ টাকা, অপরপক্ষে দেশ থেকে বাইরে যাওয়া (outgoing) বিভিন্ন পণ্যের মূল্য ছিল মোট ১৪,০০,৩১,৫৩৫ টাকা। দেখুন, আবদুল মুহিত খান, বাংলাদেশে চোরাচালান ও চোরাচালান নিরোধে বাংলাদেশ রাইফেলস্ এর ভূমিকা, দৈনিক সংবাদ, ৩রা মার্চ, ১৯৯০।

২১। F. Mchenry, "Food Bungle in Bangladesh," Foreign Policy, 27 summer 1977, পৃষ্ঠা - 72-88.

২২। প্রাসঙ্গিক তথ্যের জন্য দেখুন, M. Anisuzzaman, "Administrative Culture in Bangladesh : The Public Bureaucrat Phenomenon," Politics, Administration and Change, 10 1 (1), 1985 পৃষ্ঠা 18-31.

২৩। ১৯৮৬ সালে অনুষ্ঠিত বাংলাদেশের জাতীয় সংসদ নির্বাচনে শুধুমাত্র নির্বাচনের দিন (৭ই মে) ১৫ জন নিহত এবং ৭৫০ জন আহত হন। দেখুন, সাপ্তাহিক বিচিত্রা, ১৬ই মে, ১৯৮৬, পৃষ্ঠা ২০। ১৯৮৯ সালে ভারতের তিনদিন ব্যাপী লোকসভা

নির্বাচনের নির্বাচনী সংঘর্ষে নিহত হয়েছেন ১৫৩ জন। দেখুন, দৈনিক ইত্তেফাক, ২৭ শে নভেম্বর, ১৯৮৯। ১৯৯০ সালে অনুষ্ঠিত ভারতের ৯টি রাজ্যের বিধানসভা নির্বাচনে নিহতের সংখ্যা ৮২জন। দেখুন, দৈনিক সংবাদ, ২৮শে ফেব্রুয়ারী, ১৯৯০।

২৪। জিয়ার আমলের ২৬টি সামরিক অভ্যুত্থানের জন্য দেখুন, Azizul Haque, "Bangladesh in 1980 : Strains and stresses - Opposition in the Doldrums," Asian Survey, 21(2) 1981, পৃষ্ঠা 192.

২৫। দেখুন, ইশতিয়াক আহমেদ, অর্থ ছিনতাই সমাচার, অগ্রপথিক, ৩রা আগষ্ট, ১৯৮৯, পৃষ্ঠা ১২।

২৬। দেখুন, দৈনিক সংবাদ, ২৭শে সেপ্টেম্বর, ১৯৮৯।

২৭। R.O. Tilman, "Emergency of Black Market Bureaucracy : Administration, Development and corruption in the New States," Public Administration Review, 28(5) 1968, পৃষ্ঠা 437 - 44.

২৮। উল্লেখিত হয়েছে, Simcha B. Werner "New Directions in the Study of Administrative Corruption," প্রাগুক্ত, পৃষ্ঠা -148.

২৯। দেখুন, পূর্বোক্ত, পৃষ্ঠা -149.

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা

— মোহাম্মদ সফিউর রহমান

বাংলাদেশের বর্তমান বিচার ব্যবস্থার গোড়াপত্তন যদিও বৃটিশ আমলে, তবুও সুলতানী ও মোগল আমলের বিচার ব্যবস্থা এর পূর্বসূরী। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমলের 'নেজামত আদালত' ইত্যাদি পুরনো সুলতানী আমলের আদালতসমূহের উত্তরসূরী। বাংলাদেশের সোনারগাঁয়ে কাজী সিরাজের এক বিধবার নালিশের প্রেক্ষিতে স্বয়ং সুলতান গিয়াসউদ্দীনকে আদালতে তলব করে নেয়া এবং বিধবার পক্ষে রায় দেয় এবং সুলতানের সে রায় মেনে নেয়া আইনের শাসনেরই প্রকৃষ্ট উদাহরণ। মোগল আমলেও 'কাজিউল কুজাত' রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ বিচারক ছিলেন এবং বিভিন্ন এলাকায় কাজী বা বিচারক নিয়োজিত ছিলেন। আকবর তাঁর সাম্রাজ্যকে সুবা, সরকার, পরগণা ও গ্রামে বিভক্ত করেন এবং যথাক্রমে দায়িত্বপ্রাপ্ত সুবাদার, ফৌজদার, আমীল, মোকাদ্দাম ও পাটোয়ারী রাজপ্রতিনিধি হিসাবে রাজস্ব বিষয় ছাড়াও আইন শৃংখলা বিষয়ক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। এতদ্ব্যতীত কেন্দ্রীয়ভাবে 'মুহ্‌তাছিব' ছিলেন সর্বসাধারণের জীবনে ন্যায়নীতি প্রতিষ্ঠার ভারপ্রাপ্ত কর্মচারী। মোহ্‌তাছেবকে অনেকটা স্ক্যাণ্ডেনেভিয়া দেশসমূহের 'ওমবুড্‌স্‌ম্যান' বা যুক্তরাজ্যের 'পার্লামেণ্টারী কমিশনার' এর সাথে তুলনা করা যেতে পারে।

এ দেশের বিচার ব্যবস্থার প্রারম্ভ হিসাবে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আমলের ১৭৮৬ সনের কথা স্মরণ করা যায়। ঐ সনে বেঙ্গল প্রেসিডেন্সীকে কতকগুলো কালেক্টরসিপে বিভক্ত করা হয়— প্রত্যেকটাকে এক একজন ইউরোপীয় কালেক্টরের অধীনে ন্যস্ত করা হয় এবং কালেক্টরকে সিভিল জজ ও ম্যাজিষ্ট্রেট-এর ক্ষমতাও দেয়া হয়। অবশ্য কয়েক বছর পর পৃথক জেলা জজের পদ সৃষ্টি করা হয়। ১৮২৯ সনে লর্ড উইলিয়াম বেন্টিংক-এর সংস্কার অনুযায়ী কমিশনার অব রেভিনিউ এণ্ড সার্কিট পদ সৃষ্টি করা হয়। এর পূর্বে কোর্ট অব এপীল ও সার্কিট বিদ্যমান ছিল। রাজস্ব আদায় দেখাশুনা করা ছাড়াও কমিশনারদেরকে ফৌজদারী বিচারের দায়িত্ব দেয়া হয়। ১৮৩৩ সনের ৩নং আইনে অবশ্য কমিশনারদেরকে বিচারকের দায়িত্ব থেকে ১৮৩৫ সন থেকে অব্যাহতি দেয়া হয়। কিন্তু ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধি আমলে আসার পূর্ব পর্যন্ত তাঁদেরকে কোন কোন বিষয়ে ফৌজদারী বিচারকার্যও পরিচালনা করতে হতো।

দেওয়ানী আদালতের ব্যাপারে ১৮৮৭ সনের দেওয়ানী আদালত আইন দ্বারা অধঃস্তন আদালত-সমূহ সৃষ্টি করা হয়। অবশ্য এ আইন দ্বারা উক্ত বিষয়ে ১৮৭১ সনের ৬নং আইন বাতিল হয়ে যায়। দেওয়ানী আদালত আইনে ১৮৮৭ অনুযায়ী (ধারা-৩) জেলা জজ, অতিরিক্ত জজ, সাব-অর্ডিনেট জজ ও মুনসেফ-এর আদালত আমলে আসে। ১৮৬১ সনের হাইকোর্ট আইন উর্ধ্বতন আদালত সম্পর্কে উল্লেখ্য-যার ফলে ১৮৬২ সনের লেটারস পেটেন্ট দ্বারা কোলকাতা হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। পরবর্তীতে ১৮৬৫ এর নতুন লেটারস পেটেন্ট দ্বারা এর পূর্ণ কার্যক্রম ও পদ্ধতি বিবৃত হয়।

অতঃপর ১৮৬৬ সালে এলাহাবাদ হাইকোর্ট, ১৯১৯ সালে লাহোর হাইকোর্ট, ১৯২২ সালে রেঙ্গুন হাইকোর্ট এবং ১৯৩৬ সালে নাগপুর হাইকোর্ট স্থাপিত হয়।

ঢাকা হাইকোর্ট ১৯৪৮ সনে ভারতীয় স্বাধীনতা আইন ১৯৪৭ এর আওতায় গঠিত হয়। উক্ত আদেশে বলা হয়,

> The High Court of East Bengal shall be a court of record and shall have in respect of territories for the time being included in the province of East Bengal all such appellate and other jurisdictions under the law inforce immediately before the appointed day as exercisable in respect of the said territories by the high court of Calcutta.[১]

যেহেতু সাবেক পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান ১৯৫৬ সনে রচিত হয় কাজেই অন্তর্বর্তীকালীন সময়ে ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইন অনুযায়ী হাইকোর্ট অফ ইষ্ট বেঙ্গল–এর বিভিন্ন কাজকর্ম পরিচালিত হয়। ইষ্ট বেঙ্গল হাইকোর্ট কোলকাতা হাইকোর্টের সব ক্ষমতাই উত্তরাধিকার সূত্রে প্রাপ্ত হয়। কিন্তু যেহেতু পার্বত্য চট্টগ্রাম কোলকাতা হাইকোর্টের আওতাধীন ছিল না, কাজেই পরবর্তীতে তা ঢাকা হাইকোর্টেরও এলাকার বাইরে থাকে।[২] তাছাড়া ১৯৫৫ সনের আগে ঢাকা হাইকোর্টের রীট এখতিয়ারও ছিল না। ঐ সনে ১৯৩৫ সনের ভারত শাসন আইনের ২২৩ (এ) ধারা মোতাবেক ঢাকা হাইকোর্টকে রীট এখতিয়ার অর্পণ করা হয়।

পরবর্তীতে পাকিস্তানের ১৯৫৬ সনের সংবিধান অনুযায়ী সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্টসমূহ পরিচালিত হয়। সংবিধানের ১৪৮ অনুচ্ছেদে বলা হয় যে, প্রধান বিচারপতি ও অনুর্ধ অন্যান্য ৬জন বিচারকসহ সুপ্রীম কোর্ট গঠিত হবে। তবে পার্লামেন্ট আইন দ্বারা উক্ত সংখ্যা বৃদ্ধি করতে পারবে। সুপ্রীমকোর্টকে কেন্দ্রীয় সরকার ও প্রাদেশিক সরকারসমূহের মধ্যকার কোন বিষয়ে অন্তর্দ্বন্দ সম্পর্কে ঘোষণামূলক রায় দেয়ার মূল এখতিয়ার দেয়া হয়, যদি তা সংবিধানের ব্যাখ্যা সম্পর্কিত হয়ে থাকে।[৩] এতদ্ব্যতীত সংবিধানের ব্যাখ্যা প্রদান অন্যূন ১৫,০০০ টাকার দেওয়ানী মামলার এবং হাইকোর্টের অধঃস্তন আদালতের রায়ের বিপরীতে মৃত্যুদণ্ড ও যাবজ্জীবন কারাদণ্ডের বিষয়ে আপীল এখতিয়ার প্রদান করা হয়।[৪]

উক্ত সংবিধান অনুযায়ী পূর্ব পাকিস্তান ও পশ্চিম পাকিস্তান উভয় প্রদেশে এক একটি হাইকোর্ট স্থাপিত হয়। পাকিস্তানের প্রধান বিচারপতি ও সংশ্লিষ্ট গভর্ণরের সাথে আলোচনাক্রমে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক হাইকোর্টের বিচারপতিদেরকে নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়। কমপক্ষে হাইকোর্টে ১০ বছরের অভিজ্ঞতাসম্পন্ন আইনজীবি অথবা ১০ বছরের বিচার বিষয়ে অভিজ্ঞতাসম্পন্ন ব্যক্তি অথবা

---

১ হাইকোর্ট অফ বেঙ্গল আদেশ ১৯৪৭, প্যারা–৫।

২ Eklas V. Crown 7 DLR 552.

৩ Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1956 Art. 156.

৪ Ibid, Art. 157, 158, 159.

অন্ততঃ ৩ বছর জেলা জজ হিসাবে কাজ করেছেন এ রকম কোন অন্যূন ১০ বছরের সিনিয়র সি এস পি অফিসারকে হাই কোর্টের জজ করা যেতে পারে বলে বলা হয়।[৫]

ঐ সংবিধানের আরোও উল্লেখযোগ্য দিক এই যে, হাইকোর্টকে সংশ্লিষ্ট প্রদেশে রীট গ্রহণ করার অনুমতি দেয়া হয় এবং habeas corpus, mandamus, prohibition, quo warranto and certiorari রীট এর উল্লেখ করা হয়।

পাকিস্তানের ১৯৬২ সনের সংবিধানে সুপ্রীম কোর্টের জজদের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হবে বলে উল্লেখ করা হয়।[৬] হাইকোর্টে বিচারক হিসাবে অন্ততঃ ৫ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা হাইকোর্টে অন্ততঃ ১৫ বছর এডভোকেট হিসাবে দায়িত্ব পালন সুপ্রীম কোর্টের বিচারক হিসাবে নিয়োগের শর্ত হিসাবে উল্লেখ করা হয়। প্রধান বিচারককে সরাসরি এবং অন্যান্য বিচারকদেরকে প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ সাপেক্ষে রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিয়োগের ব্যবস্থা রাখা হয়। সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ারাবলীর মধ্যে মূল, আপীল সংক্রান্ত ও পরামর্শ প্রদানমূলক এখতিয়ার রাখা হয়। যখন হাইকোর্ট মৃত্যুদণ্ড অথবা যাবজ্জীবন কারাদণ্ড অথবা কোর্ট অবমাননার দণ্ড প্রদান করবে অথবা কোনও বিষয়ে সাংবিধানিক প্রশ্ন জড়িত আছে বলে প্রত্যয়ণ করবে, সে সকল অবস্থায় সুপ্রীম কোর্ট আপীল শ্রবণ করতে পারবে বলে উল্লেখ করা হয়।[৭] সংবিধানে এটাও উল্লেখ করা হয় যে, যদিও সুপ্রীম কোর্টের স্থায়ী সীট ইসলামাবাদে থাকবে তবুও বছরে অন্ততঃ দু'বার সুপ্রীমকোর্ট ঢাকায় আহূত হবে।[৮]

উক্ত সংবিধানেও প্রত্যেক প্রদেশের জন্য হাইকোর্টের ব্যবস্থা রাখা হয়। হাইকোর্টে আইনজীবি হিসাবে অন্ততঃ ১০ বছরের অভিজ্ঞতা অথবা ১০ বছর বিচারক হিসাবে অভিজ্ঞতা অথবা অন্ততঃ ৩ বছর জেলা জজ হিসাবে দায়িত্ব পালনসহ ১০ বছরের সিভিল সার্ভিসের অভিজ্ঞতা বিচারক হিসাবে নিয়োগের শর্ত হিসাবে রাখা হয়। হাইকোর্টের এখতিয়ার সমূহের মধ্যে রীট এখতিয়ারও রাখা হয়, যদিও পূর্বেকার সংবিধানের মত রীটের নাম উল্লেখ করা হয়নি। [৯]

স্বাধীনতা উত্তর কাঠামো

বাংলাদেশের স্বাধীনতা উত্তরকালে ১১ই জানুয়ারী ১৯৭২-এ ঘোষিত অস্থায়ী বাংলাদেশের সংবিধান আদেশ ১৯৭২-এ নিম্নরূপ বর্ণিত হয় ঃ

There shall be a High Court of Bangladesh consisting of a Chief Justice and so many other Judges, as may be appointed from time to time.[১০]

---

৫ Ibid, Art. 165, 166, 167.
৬ Constitution of the Islamic Republic of Pakistan 1962, Art. 49.
৭ Ibid, Art. 58.
৮ Ibid, Art. 56.
৯ Ibid, Art. 92, 98
১০ Provincial Constitution of Bangladesh Order 1972, Art. 9.

অতঃপর ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং-৫ হিসাবে The High Court of Bangladesh order ১৭ই জানুযায়ী ১৯৭২-তে ঘোষিত হয়। উক্ত আদেশে হাইকোর্টের মূল, আপীল বিষয়ক ও অন্যান্য এখতিয়ার নিম্নোক্তভাবে উল্লেখিত হয় ঃ

The High court of Bangladesh shall be a Court of Record, and shall have, in respect of the territories of Bangladesh, all such original, appellate, special, revisional, review, procedural and all other powers as were exercisable in respect of the said territories by the High Court at Dacca under any law in force before the 26th day of March, 1971 :

Provided that the High Court of Bangladesh shall have no power to issue any writ, order or direction in nature of habeas corpus, mandamus, prohibition, or declaration, which the High Court at Dacca had power to issue under any constitutional provision in force before the 26th day of March, 1971.[১১]

এখানে উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশের প্রথম হাইকোর্টকে সাবেক হাইকোর্টের রীট এখতিয়ার ব্যতীত অন্যান্য সকল এখতিয়ারই অর্পণ করা হয়। কিন্তু এতে একদিকে যেমন হাইকোর্টের বিরুদ্ধে আপীলের ব্যবস্থা ছিল না অন্যদিকে সরকার মামলায় কোন পার্টি হলে কি ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে সে সম্পর্কে উল্লেখ ছিল না। এ অসুবিধা দূরীকরনার্থে ৬ই ফেব্রুয়ারী ১৯৭২-এ The Bangladesh (legal proceedings) order 1972 (President's order No. 12 of 1972), ১৫ই জুন ১৯৭২ -তে the Bangladesh (legal proceedings) (second order 1972) (President's order No. 69 of 1972) ২রা আগষ্ট ১৯৭২-এ The Bangladesh (legal proceedings) (Third) order 1972 (President's order No. 90 of 1972) এবং ২রা আগষ্ট ১৯৭২-এ The High Court of Bangladesh (Amendment) order 1972 (President's order No. 91 of 1972) জারী করা হয়। শেষোক্ত আদেশে একটি নতুন ৬ (এ) অনুচ্ছেদ সংযোজন করত ঃ নিম্নরূপ উল্লেখ করা হয় ঃ

6A (I) There shall be an Appellate Division of the High Court of Bangladesh which shall consist of the Chief Justice and two other Judges to be appointed by the President after consultation with the Chief Justice:

provided that where any appeal or petition pending before the Appellate Division relates to any judgement or order passed by the Chief Justice or any other judge of the Appellate Division either sitting singly or as a judge of any High Court the President shall appoint an ad hoc Judge to sit in place of the Chief Justice or the other Judge for hearing the appeal or petition.

(2) All appeals and petitions, which immediately before the commencement of the Provisional Constitution of Bangladesh Order, 1972, were pending before the erstwhile Supreme Court of Pakistan arising out of matters within the territories of Bangladesh shall, on the commencement of the High Court of Bangladesh

---

[১১] The High Court of Bangladesh order 1972 (President's Order No. 5 of 1972) Art.4.

(Amendment) Order, 1972 (P. O. No. 91 of 1972), stand transferred to, and be deemed to be appeals and petitions pending before the Appellate Division and shall be continued in, and heard and determined by, the Appelate Division.[১২]

এতদ্ব্যতীত উক্ত আদেশে বলা হয় যে, যে সব রীটসমূহ ১৯৭২ সনের বাংলাদেশের অস্থায়ী সংবিধান আদেশ জারীর পূর্বে কোন হাইকোর্টে বিদ্যমান ছিল সেগুলো বাংলাদেশের হাইকোর্টে স্থানান্তরিত বলে ধরা হবে। তবে এটা উল্লেখ্য যে, ১৯৭২ সনের রাষ্ট্রপতির আদেশ নং ৯১-তে সাবেক সুপ্রীম কোর্টের মত কোন কাঠামো সৃষ্টি করা হয়নি, বরং উক্ত আদেশ সাবেক পাকিস্তানের সুপ্রীম কোর্টের এখতিয়ারের একটি বিকল্প ছিল মাত্র।[১৩]

সাংবিধানিক রূপরেখা

বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২ সনের ৪ঠা নভেম্বর বাংলাদেশ গণপরিষদ কর্তৃক গৃহীত এবং ১৪ই ডিসেম্বর স্পীকার কর্তৃক প্রমাণীকৃত হয়। উক্ত সংবিধান ১৬ই ডিসেম্বর তারিখে কার্যকরী হয়। মূল সংবিধানে বলা হয় যে, বাংলাদেশ সুপ্রীম কোর্ট নামে বাংলাদেশের একটা সর্বোচ্চ আদালত থাকবে এবং আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ নিয়ে তা গঠিত হবে। বিচারপতিদের সংখ্যা রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নির্ধারিত হবে। প্রধান বিচারপতি রাষ্ট্রপতি কর্তৃক নিযুক্ত হবে এবং প্রধান বিচারপতির সাথে পরামর্শ করতঃ রাষ্ট্রপতি অন্যান্য বিচারক নিয়োগদান করবেন। বিচারক নিয়োগের শর্ত হিসাবে সুপ্রীমকোর্টে অন্যূন ১০ বছর কাল এডভোকেট হিসাবে কর্মরত থাকা অথবা ১০ বছর বিচার বিভাগীয় পদে অধিষ্ঠিত থাকা অথবা অন্যূন ১০ বছর এডভোকেট থাকা (ও অন্যূন ৩ বছর জেলা জজের ক্ষমতা নির্বাহ করা) রাখা হয়।[১৪] উক্ত সংবিধানে বলা হয় যে, কোন বিচারক ৬২ বছর বয়স পূর্ণ হওয়া পর্যন্ত স্বীয় পদে বহাল থাকবেন। তবে প্রমাণিত অসদাচরণ বা অসামর্থের কারণে সংসদের মোট সদস্য সংখ্যার অন্যূন দুই-তৃতীয়াংশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা দ্বারা সমর্থিত সংসদের প্রস্তাবক্রমে রাষ্ট্রপতি কোন বিচারককে অপসারণ করতে পারবেন।[১৫] আপীল বিভাগকে হাইকোর্ট বিভাগের রায়, ডিক্রী, আদেশ বা দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপীল শুনানীর ও তা নিষ্পত্তির এখতিয়ার দেয়া হয়। যেসব ক্ষেত্রে হাইকোর্ট বিভাগ এ মর্মে সার্টিফিকেট দান করেন যে, মামলাটির সাথে এ সংবিধান ব্যাখ্যার বিষয়ে আইনের গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন জড়িত রয়েছে অথবা হাইকোর্ট বিভাগ কোন মৃত্যুদণ্ড বহাল করেছেন কিংবা কোন ব্যক্তিকে মৃত্যুদণ্ড বা যাবজ্জীবন কারাদণ্ডে দণ্ডিত করেছেন বা উক্ত বিভাগের অবমাননার জন্য কোন ব্যক্তিকে দণ্ড দান করেছেন সেসব ক্ষেত্রে আপীল বিভাগ আপীল শ্রবণ করবেন।[১৬]

---

১২ The High court of Bangladesh (Amendment) order 1972, (P.0. 91 of 1972) Art. 1.

১৩ দেখুন Ghazi Shamsur Rahman, " Supreme Court of Bangladesh : Its constitutional Evaluation (documented)" Administrative Science Review, Vol. IX No. 4, (December 1979), p/72.

১৪ দেখুন, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান ১৯৭২, অনুঃ ৯৪-৯৫, বাংলাদেশ গেজেট অতিরিক্ত (ডিসেম্বর ১৪, ১৯৭২) পৃঃ ৩৪৩৭। শেষাংশ পরবর্তীতে বাদ দেওয়া হয়।

১৫ Ibid. , অনুঃ ৯৬, পৃঃ ৩৪ ৩৮।

১৬ Ibid. অনুঃ ১০৩, পৃঃ ৩৪৪০।

হাইকোর্ট বিভাগের এখতিয়ারের মধ্যে আদি, আপীল ও অন্য প্রকার পূর্বার্পিত এখতিয়ার ও ক্ষমতা বলবৎ রাখা হয় বিশেষত ঃ সংবিধানের ১০২ নং অনুচ্ছেদে হাইকোর্ট বিভাগকে কোন সংক্ষুব্ধ ব্যক্তির আবেদনক্রমে সংবিধানে অর্পিত মৌলিক অধিকারসমূহ বলবৎ করার এখতিয়ার অর্থাৎ রীট এখতিয়ার প্রদান করা হয়।

পরবর্তীতে অবশ্য কতকগুলো পরিবর্তন আনয়ন করা হয়। তন্মধ্যে ২৫শে জানুয়ারী ১৯৭৫–এ সংবিধানের ৪র্থ সংশোধনী আইনে বিচারপতি অপসারণের ব্যাপারে জাতীয় সংসদের সিদ্ধান্তের ব্যবস্থা বিলোপ করত বলা হয় যে, রাষ্ট্রপতি অসদাচরণ বা অসামর্থের কারণে সংশ্লিষ্ট বিচারপতিকে কারণ দর্শাও করত অপসারণ করতে পারবেন।[১৭] পরবর্তীতে ২৩ শে এপ্রিল ১৯৭৭–এর আদেশে বলা হয় যে, সুপ্রীম কোর্ট অথবা হাইকোর্টের কোন জজকে অপসারণ করতে হলে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিলের মতামত নিতে হবে এবং এ উপলক্ষে সুপ্রীম কোর্টের ৩ জন সিনিয়র জজের সমন্বয়ে উক্ত কাউন্সিল গঠনের বিধান রাখা হয়।[১৮] অবশ্য তারপর ২৭ শে নভেম্বর ১৯৭৭–এ সর্বোচ্চ আদালতকে সুপ্রীম কোর্ট নামে অভিহিত করা হয় এবং সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগ ও হাইকোর্ট বিভাগ চিহ্নিত করা হয়।[১৯] অবশ্য ইতিপূর্বে স্বল্পকালীন সময়ের জন্য রাষ্ট্রপতি বিচারপতি সায়েমের আমলে সুপ্রীমকোর্ট ও হাইকোর্ট সামরিক আইন ঘোষণা দ্বারা আলাদা সংগঠন হিসাবে দেখানো হয়েছিল। পরবর্তীতে সাময়িকভাবে সুপ্রীম জুডিশিয়াল বিলোপ করা হলেও সংবিধানের সংশোধনীক্রমে সুপ্রীম জুডিশিয়াল কাউন্সিল পুনঃপ্রতিষ্ঠা করা হয়।[২০] অবশ্য ২৪ শে মার্চ ১৯৮২ সনে সামরিক আইন ঘোষণার পর সাময়িকভাবে হাইকোর্ট বিভাগের রীট এখতিয়ার স্থগিত রাখা হয়। ঘোষণায় বলা হয় যে, স্থগিত রাখা সংবিধানের ১০২ অনুচ্ছেদ থেকে উদ্ভূত ও এর সাথে সম্পর্কিত সকল রীট আবেদনের শুনানী স্থগিত থাকবে।[২১] তবে উক্ত ঘোষণার পর পরই সামরিক আইন আদেশ নং–১–এ সুপ্রীমকোর্টকে প্রতিষ্ঠিত সংস্থা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া হয় এবং ১৯৮৫ সনের ১৫ই ফেব্রুয়ারী The Constitution (partial revival) (2nd order) 1985-তে সংবিধানের সমতা সংক্রান্ত মৌলিক অধিকার নং –২৮, ২৯, ৩০, ৩৪, ৪০ ও ৪১ পুর্নবহাল করা হয়। অতঃপর ১০ই নভেম্বর ১৯৮৬–তে সংবিধানের ৭ম সংশোধনী দ্বারা সংবিধান পুনরূদ্ধারের সাথে সাথে বিচারপতিদের বয়স সীমা ৬২ থেকে ৬৫ বছর পর্যন্ত বৃদ্ধি করা হয়।

৯ই জুন ১৯৮৮–তে সংবিধানের ৮ম সংশোধনী আমলে আসে। বিচার বিভাগীয় বিকেন্দ্রীকরণের লক্ষ্যে ঢাকা ছাড়াও কুমিল্লা, চট্টগ্রাম, বরিশাল, যশোর, রংপুর ও সিলেটে হাইকোর্ট বিভাগের স্থায়ী বেঞ্চে গঠিত হয়। ১১ ই জুন ১৯৮৮–তে প্রধান বিচারপতির বিজ্ঞপ্তি অনুযায়ী রংপুর বেঞ্চের এখতিয়ারে ১৬টি জেলা, বরিশাল বেঞ্চের এখতিয়ারে ৭টি জেলা, যশোর বেঞ্চের এখতিয়ারে ১০টি

---

১৭ The Constitution (4th Amendment) Act 1975 (Act No.11 of 1975) Sec. 15.

১৮ Proclamation Order No. 1 of 1977 Art. 7 (i).

১৯ Second proclamation Order No 1 of 1977 Art. 94.

২০ The Constitution (partial revival) Order 1985.

২১ ২৪-৩-৮২ ইং তারিখের সামরিক আইন জারীর ঘোষণাপত্র (ছ) দ্রষ্টব্য, দেখুন দৈনিক ইত্তেফাক ২৫ শে মার্চ ১৯৮২, পৃঃ ১, ৮।

জেলা, সিলেট বেঞ্চের এখতিয়ারে ৪টি জেলা, কুমিল্লা বেঞ্চের এখতিয়ারে ৬টি জেলা, চট্টগ্রাম বেঞ্চের এখতিয়ারে ৩টি জেলা প্রতিস্থাপিত হয় এবং অবশিষ্ট জেলাগুলো ঢাকা বেঞ্চের আওতাধীন করা হয়। পরবর্তীতে সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগের রায়ে উক্তভাবে বেঞ্চ গঠন অসাংবিধানিক বলে উল্লেখ করা হয়েছে।[২২] সরকার উক্ত রায় মেনে নিয়েছেন। তবে ৪র্থ জাতীয় সংসদের ৫ম অধিবেশনে বিষয়টি পুনরালোচিত হয়েছে। বর্তমানে সুপ্রীমকোর্টের আপীল বিভাগে ৫ জন এবং হাইকোর্ট বিভাগে প্রায় ২৯ জন বিচারপতি রয়েছেন। আপীল বিভাগের বিচারকরা সাধারণতঃ ফুলবেঞ্চে একত্র বসে আপীল শুনেন। হাইকোর্ট বিভাগের একক বিচারক বিচারালয়কে সিংগল বেঞ্চ, দু'জন বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চকে ডিভিশন বেঞ্চ এবং তিন বা ততোধিক বিচারপতি সমন্বয়ে গঠিত বেঞ্চকে ফুল বেঞ্চ বলা হয়ে থাকে।

হাইকোর্টের এখতিয়ারসমূহের মধ্যে মূল ও আপীল এখতিয়ার এবং দেওয়ানী ও ফৌজদারী এখতিয়ার রয়েছে। কোম্পানী আইন, এডমিরালটি আইন ইত্যাদি সংক্রান্ত মামলা হাইকোর্ট বিভাগের বিশেষ এখতিয়ার। 'রীট' হাইকোর্ট বিভাগের একটা মূল দেওয়ানী এখতিয়ার। এর আপীলসমূহ আপীল বিভাগ শ্রবণ করেন। ভারতে অবশ্য রীট হাইকোর্ট বা সুপ্রীমকোর্ট উভয় আদালতেই শুরু করা যায়। সংবিধান অনুযায়ী হাইকোর্ট বিভাগ অন্যান্য সকল অধঃস্তন আদালত সমূহকে তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ করেন, এবং আপীল বিভাগের রায়সমূহ হাইকোর্ট বিভাগের জন্য এবং উভয় বিভাগের রায়সমূহ অন্যান্য অধঃস্তন আদালতসমূহের জন্য বাধ্যতামূলক।[২৩] হাইকোর্ট বিভাগ অধঃস্তন আদালত সমূহ পরিচালনার জন্য বিধিমালাও প্রণয়ন করে থাকেন। এতদ্ব্যতীত সুপ্রীমকোর্টের উভয় বিভাগেরই রিভিশন্যাল ও রিভিউ ক্ষমতা রয়েছে।

জেলা ও দায়রা জজ

জেলা ও দায়রা জজের আদালত দুইটি প্রবাহ থেকে সৃষ্ট। দেওয়ানী মামলা সংক্রান্ত এখতিয়ারের জন্য বিচারপতিকে জেলা জজ এবং ফৌজদারী মামলা সংক্রান্ত এখতিয়ারের জন্য দায়রা জজ বলা হয়ে থাকে। 'দায়রা' শব্দটি আরবী, যার মানে হচ্ছে, 'ঘোরা' বা 'সার্কিট'। দেওয়ানী ক্ষমতাসম্পন্ন জজ একাধিক স্থানে ঘুরে ফৌজদারী মামলারও আপীল শুনতেন বলে তাকে দায়রা জজ নামাকরণ করা হয়। কোর্ট অফ সার্কিট–এর সৃষ্টির কথা পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে। বছররের ভিন্ন ভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন স্থানে আদালতের সেশন বা অধিবেশন করতে হতো বলে উক্ত আদালতকে সেশনস কোর্টও নামাকরণ করা হয়— যথা : সিলেটের জজকে প্রতিবছর নির্দিষ্ট সময়ে কাছাড়ের শিলচরে গিয়ে সেশন বা অধিবেশন করতে হতো। পরবর্তীতে কতিপয় নির্দিষ্ট অপরাধকে সেশনস কেস্ নাম দেয়া হয়। যথা : খুন, ডাকাতি, ঘর পোড়ানো ইত্যাদি।

জেলা জজের আদালত ও অন্যান্য অধঃস্তন আদালতসমূহ ১৮৮৭ সালের সিভিল কোর্টস আইন দ্বারা সৃষ্ট এবং ১৯০৮ সনের দেওয়ানী কার্যবিধি–এর বিস্তারিত কার্য পদ্ধতি বর্ণনা করেছে। অধুনা ১৯৮৩ সনের অধ্যাদেশ নং–২ দ্বারা অবশ্য সিভিল কোর্ট আইনের কয়েকটি পরিবর্তন

---

২২ 1989 BLD (SPL) ১

২৩ গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানের অনুঃ ১০৯ ও ১১১।

সাধিত হয়েছে এবং অধ্যাদেশ নং ৪৮ দ্বারা দেওয়ানী কার্যবিধির বেশ কয়েকটি রদবদল করা হয়েছে। সিভিল কোর্ট আইন জেলা জজের আদালত, অতিরিক্ত জজের আদালত, সাবঅর্ডিনেট জজের আদালত ও মুন্সেফের আদালত (পরবর্তীতে সহকারী জজের আদালত) কাঠামো বর্ণনা করেছে।[২৪] জেলা জজ তাঁর এলাকার অন্যান্য দেওয়ানী আদালতসমূহ তত্বাবধান করে থাকেন। জেলা জজের মূল, আপীল ও রিভিশন্যাল এখতিয়ার রয়েছে। জেলা জজ সাধারণতঃ মূল মামলা স্বয়ং বিচার করেন না। কিন্তু কতকগুলো আইনে তাঁকে বিশেষ বিষয়ে একমাত্র বিচারক বলে উল্লেখ করা হয়েছে যথা : দেউলিয়া আইন, উত্তরাধিকার আইন ইত্যাদি সংক্রান্ত বিচার। তবে তিনি তাঁর কোন কোন কাজ ডেলিগেটও করতে পারেন। তিনি সাবঅর্ডিনেট জজদের রায় অথবা আদেশের আপীল শুনেন যদি মামলার মূল্য ৭০,০০০/- টাকা অথবা তদুর্ধ হয়ে থাকে। কিন্তু সহকারী জজদের সকল রায় বা আদেশের উপরই তাঁর কাছে আপীল হতে পারে। জেলা জজের আপীলের উপর দ্বিতীয় আপীলের ব্যবস্থা নেই, তবে হাইকোর্ট বিভাগ তা রিভিশন করতে পারেন।

বৃটিশ আমলে সেশনস কেসসমূহের বিচার কার্যে জুরির ব্যবস্থা ছিল। স্থানীয় রীতিনীতি ও প্রজ্ঞা যাতে বিচারকার্যে কাজে লাগানো যায় সে জন্যই এ ব্যবস্থা করা হয়েছিল। স্থানীয় গণ্যমান্য ব্যক্তিবর্গ যথা : ইউনিয়ন বোর্ড প্রেসিডেন্ট, স্কুল বা মাদ্রাসা শিক্ষক প্রমুখকে জু্রর হিসাবে বিভিন্ন কেসে নিয়োগ করা হতো। মামলায় জুরি question of fact নির্ধারণ করতেন যে আসামী দোষী না নির্দোষ, পক্ষান্তরে question of law বিচারক নির্ধারণ করতেন। বিচারককে জুরর রায় মেনে নিতে হতো। পরবর্তীতে জুরির পরিবর্তে এসেসার নিয়োগ করা হতো। এসেসারদের মতামত নিতে অবশ্য বিচারক বাধ্য ছিলেন না। তবে তাঁদের মতামত বিচারক অবশ্যই বিবেচনা করতেন।

১৯৫৭ সনের তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তানের ২৩ নং আইনে বিচার ব্যবস্থার কতকগুলো সবিশেষ পরিবর্তন সাধন করা হয়। জুরি ব্যবস্থা রহিত ছাড়াও ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে বিচার কার্যের জন্য জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের পরিবর্তে জেলা জজের কাছে দায়ী করার ব্যবস্থা তার মধ্যে অন্যতম।

পূর্বে সেশন জজের রিভিশন্যাল ক্ষমতা ছিল না। কিন্তু ১৯৭৬ সনের আইন সংস্কার কমিটির সুপারিশ মোতাবেক ১৯৭৮ সনের আইন সংস্কার অধ্যাদেশে ফৌজদারী কার্যবিধিতে ৪৩৯ (ক) ধারা যোগ করত (১৯৭৯ সনের ১ লা জুন থেকে কার্যকরী) সেশন জজকে রিভিশন্যাল ক্ষমতাও দেয়া হয়। অধঃস্তন কোর্টসমূহের যে সমস্ত রায় বা সিদ্ধান্ত আপীলযোগ্য নয়, সে গুলো সেশন জজ রিভাইজ করতে পারেন, যদি তিনি মনে করেন যে, রায় বা সিদ্ধান্তে কোন আইনের ভুল থেকে গেছে। তবে জেলা জজের দেওয়ানী রিভিশন ক্ষমতা ১৯৮৩ সনে বিলোপ করা হয়।

অতিরিক্ত জেলা জজের দায়িত্ব জেলা জজের মতই। যে মামলাগুলো জেলা জজ তাঁকে ট্রান্সফার করেন সেগুলোর বিচারকার্য তিনি পরিচালনা করেন।

---

২৪ The Civil Courts Act, 1887, Sec.3.

সাব-জজ ও সহকারী জজ

কোন জেলায় এক বা একাধিক সাব-জজ থাকতে পারেন। প্রতি সাব জজের এলাকা হাইকোর্ট বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন জেলা জজ কর্তৃক নির্ধারিত হয় এবং আদালতের স্থান সরকারী বিজ্ঞপ্তি দ্বারা স্থিরীকৃত হয়। একজন সাব জজের দু'ধরণের ক্ষমতা থাকে—মূল ও আপীল সংক্রান্ত। সাধারণত ঃ তিনি ২০,০০০/- টাকার ঊর্ধ্বের মূল্যমানের মামলাসমূহ বিচার করে থাকেন। তবে তাঁর কাছে পেশকৃত আদিম মামলার মূল্যমানের কোন সীমারেখা নেই। জেলা জজ সাব জজকে সহকারী জজদের মামলার আপীল শুনানীরও দায়িত্ব দিতে পারেন। কোন কোন সাব জজ ও সহকারী জজকে ১৮৮৭ সনের Small Cause Courts Act অনুযায়ী small causes মামলাসমূহ বিচারেরও ক্ষমতা প্রদান করা হয়ে থাকে। সাব জজের রায় ও আদেশের উপর ৭০,০০০/- টাকা পর্যন্ত জেলা জজ আপীল শুনতে পারেন এবং এর উপরের মূল্যমানের আপীল হাইকোর্ট বিভাগ গ্রহণ করে থাকেন।[২৫]

সিভিল কোর্টসমূহের সর্ব নিম্নস্তরে সহকারী জজকোর্ট রয়েছে। সহকারী জজদেরকে পূর্বে 'মুন্সেফ' বলা হতো। শব্দটা আরবী, যার মানে হচ্ছে—ন্যায়বিচারকারী। সম্প্রতি উক্ত নাম পরিবর্তন করা হয়েছে। মুন্সেফের মূল ও রিভিশন্যাল এখতিয়ার রয়েছে। সাধারণত মুন্সেফরা ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের মামলাসমূহের শুনানী নেন। তবে কিছু নির্ধারিত সংখ্যক সিনিয়র মুন্সেফকে হাইকোর্ট বিভাগের সুপারিশক্রমে ৫০,০০০/- টাকা পর্যন্ত মামলা শুনানীর ক্ষমতা সরকার বিজ্ঞপ্তি দ্বারা প্রদান করতে পারেন। সহকারী জজের কোর্টের আপীলসমূহ জেলা জজ-এর কোর্টে করা হয়। কোন কোন ক্ষেত্রে সহকারী জজকে small causes কোর্টেরও দায়িত্ব দেয়া হয়। পারিবারিক আদালত আইনে অনেক সহকারী জজ পারিবারিক আদালতেরও দায়িত্ব পালন করে থাকেন। সহকারী জজের আদালত গ্রাম্য আদালত ও সালিশী বোর্ডের ক্ষুদ্র দেওয়ানী বিষয়সমূহের রায়ের রিভিশন্যাল ক্ষমতাও রাখেন।[২৬]

সহকারী ও সাব জজদের আদালতে ইনজাংকশন-এর আবেদনসমূহও শুনানী হয়ে থাকে। দেওয়ানী কার্যবিধির Order XXXIX, rule 1&2 অনুযায়ী সহকারী ও সাব জজগণ interlocutary অথবা অন্তবর্তীকালীন দেওয়ানী ইনজাংকশন জারী করতে পারেন এবং সুনির্দিষ্ট প্রতিকার আইন ১৮৭৭-এর আওতায় স্থায়ী ইনজাংকশন জারী করে থাকেন।[২৭]

দেওয়ানী কার্যবিধি সংশোধন

১৯৮৩ সনের ৪৮ নং অধ্যাদেশে দেওয়ানী কার্যবিধির কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ সংশোধন করা হয়। এর মধ্যে উক্ত কার্যবিধির ৪৭ নং ধারা বিলোপ সবিশেষ উল্লেখ্য। এটা ডিক্রী কার্যকরী মামলা

---

২৫ Sec. 21 of the Civil Courts Act. 1887, as amended by Ordinance-II of 1983.

২৬ The Village Courts Ordinance 1976 Sec. 4 (2) and the Conciliation of Disputes (Municipal Areas) Ordinance 1979, Sec. 4 (2).

২৭ Specific Relief Act 1877 Sec. 52-57 কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্য ইনজাংকশন জারী করা যায় না তা ঐসব ধারায় বর্ণিত আছে। ১৯৮৯ সনের ৩২ নং আইন অনুযায়ী সরকারের উন্নয়ন প্রকল্প ও প্রচেষ্টা বানচাল হয় এমন ক্ষেত্রেও ইনজাংকশন প্রদান করা যাবে না বলা হয়েছে।

সংক্রান্ত ছিল। এতে কোন মামলার ডিক্রী কার্যকরীকরণে দীর্ঘসূত্রিতার অবসান হয়। ১১৫ নং ধারা সংশোধনক্রমে জেলা জজের রিভিশন ক্ষমতা উঠিয়ে দেয়া হয় এবং উক্ত ক্ষমতা হাইকোর্টের উপর ন্যস্ত করা হয়। তবে যে সমস্ত রিভিশন্যাল মামলা ইতিমধ্যেই জেলা জজের আদালতে ছিল সেগুলো তাতে ব্যাহত হবে না বলে বলা হয়। আরো বলা হয় যে, হাইকোর্ট বিভাগ কেবলমাত্র ঐ সব ক্ষেত্রেই রিভিশন করবেন যে গুলোতে সিদ্ধান্তের ভুলে ন্যায়বিচারের অন্যথা হয়েছে বলে তাঁরা মনে করেন।

অন্যান্য সংশোধনীর মধ্যে সময়সীমা আনয়ন উল্লেখ্য। ২৬ নং অর্ডার সংশোধনক্রমে আদালত-কমিশনের প্রতিবেদনের সময়সীমা সাধারণভাবে ৩ মাসে সীমাবদ্ধকরণ তার মধ্যে উল্লেখ্য। ১৮ নং অর্ডারে একটা নতুন ১৯ নং বিধি যোগ করত ঃ বলা হয় যে, আদালত চূড়ান্ত শুনানীর তারিখ নির্ধারণের ১২০ দিনের মধ্যে শুনানী সমাপ্ত করবেন। ২০ নং অর্ডার সংশোধন করত উল্লেখ করা হয় যে, শুনানী সমাপ্তির ৭ দিনের মধ্যে আদালত রায় ঘোষণা করবেন এবং আরো ৭ দিনের মধ্যে ডিক্রী ঘোষণা করবেন। এতদ্ব্যতীত ১৪ নং অর্ডার সংশোধন করতঃ বলা হয় যে, প্রথম শুনানীর ১৫ দিনের মধ্যে বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণ করতে হবে এবং উক্ত অর্ডারে নতুন ৮ নং বিধি যোগ করত বলা হয় যে, বিচার্য বিষয়সমূহ নির্ধারণের ১২০ দিনের মধ্যে চূড়ান্ত শুনানী শুরু করতে হবে।

ফৌজদারী আদালতসমূহ

ফৌজদারী আদালতসমূহের গঠন ও কার্যাবলী ১৮৯৮ সনের ফৌজদারী কার্যবিধি দ্বারা নির্ধারিত। উক্ত আইনের ৬ নং ধারা সুপ্রীমকোর্ট ব্যতীত অন্যান্য ফৌজদারী আদালতসমূহকে নিম্নোক্ত ৫ শ্রেণীতে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ—

১। সেশন কোর্টসমূহ
২। মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহ
৩। প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহ
৪। দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহ
৫। তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট আদালতসমূহ

সেশনস কোর্টের বিষয়ে ইতিমধ্যেই আলোচিত হয়েছে। সাধারণভাবে জেলা জজকে যেমন সেশনস জজের দায়িত্ব পালন করতে হয়, তেমনিভাবে অতিরিক্ত জেলা জজ এবং সাবজজদেরকে ফৌজদারী মামলার উদ্দেশ্যে অতিরিক্ত সেশনস জজ ও সহকারী সেশনস জজরূপে ঘোষণা করা হয়ে থাকে। সেশনস জজের এখতিয়ারের মধ্যেই মূল, আপীলকৃত ও রিভিশন্যাল এখতিয়ার রয়েছে। মূল এখতিয়ারের মধ্যে তিনি ফৌজদারী আইন দ্বারা প্রদত্ত ক্ষমতাবলে যে কোন অপরাধের বিচার করতে পারেন। তবে মৃত্যুদণ্ড প্রদানের ক্ষেত্রে তা হাইকোর্ট কর্তৃক দৃঢ়ীকৃত হতে হবে। আপীল এখতিয়ারের মধ্যে সহকারী জজ অথবা সহকারী সেশনস জজ অথবা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট অথবা প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট ৫ বছরের জেল দিলে তা জেলা জজের কাছে আপীলযোগ্য। এতদ্ব্যতীত নিম্নতর আদালত থেকে কোন মামলাকে জেলা জজ রিভাইস করারও এখতিয়ারপ্রাপ্ত।

সহকারী সেশনস জজ ৭ বছরের জেল দিতে পারেন। তবে ১৯৮২ সনের ২৪ নং অধ্যাদেশে তাঁকে বিশেষ অবস্থায় অতিরিক্ত সেশনস জজের দায়িত্ব পালন এবং ফাঁসী ব্যতীত অন্যান্য সকল শাস্তি প্রদানের ক্ষমতা অর্পন করা হয়েছে।[২৮]

ম্যাজিষ্ট্রেসী

ফৌজদারী কার্যবিধির ১০নং ধারায় জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ও অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের ব্যবস্থা রয়েছে। পূর্বে ১৩ নং ধারানুযায়ী মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের ব্যবস্থা ছিল। কিন্তু ১৯৮২ সনের ৬০ নং অধ্যাদেশে নতুন ১৩(এ) ধারা সংযোজন করতঃ থানা ম্যাজিষ্ট্রেট (পরবর্তীতে উপজেলা^ ম্যাজিষ্ট্রেটকে উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটরূপে ক্ষমতার্পণ করতে পারেন এবং উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের সাবেক মহকুমা ম্যাজিষ্ট্রেটের সকল ক্ষমতা থাকবে। তবে মন্ত্রিপরিষদ বিভাগের রিজোলিউশন অনুযায়ী ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ও ১৪৫ ধারার ক্ষমতা উপজেলা নির্বাহী অফিসারকে প্রদান করা হয়েছে।[২৯]

১৯৮২ সনের ২৪নং অধ্যাদেশে একটি ২৯ (সি) ধারা যোগ করা হয়েছে যা পরবর্তীতে ঐ সনের ৬০নং এবং ১৯৮৩ সনের ৪নং অধ্যাদেশ দ্বারা কিছুটা সংশোধিত হয়। উক্ত অধ্যাদেশ অনুযায়ী সরকার কোন চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেট, জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট অথবা অতিরিক্ত জেলা ম্যাজিষ্ট্রেটকে মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্য নয় এমন সব অপরাধের বিচারকার্য পরিচালনা করার ক্ষমতা দিতে পারেন। অনুরূপভাবে কোন প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটকে ১০ বছর পর্যন্ত জেল হতে পারে এমন সব মামলা বিচার করার ক্ষমতা অর্পণ করতে পারেন।

ম্যাজিষ্ট্রেটদের আদালতসমূহ নিম্নোক্ত প্রকার শাস্তি প্রদানের জন্য ক্ষমতাপ্রাপ্ত ঃ[৩০]

ক) মেট্রোপলিটান ম্যাজিষ্ট্রেট ও প্রথম শ্রেণীর ম্যাজেষ্ট্রেটের আদালত	নির্জনে রাখার আদেশসহ ৫ বছর পর্যন্ত জেল ও ১০,০০০/= টাকা জরিমানা ও বেত্রাঘাত।[৩১]
খ) দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত	নির্জনে রাখার আদেশসহ ৩ বছর পর্যন্ত জেল এবং ৫,০০০/= টাকা পর্যন্ত জরিমানা।
গ) তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত	২ বছর পর্যন্ত জেল এবং ২,০০০/= টাকা পর্যন্ত জরিমানা।

বলা বাহুল্য উপরোক্ত হারে শাস্তি প্রদান ১৯৮২ সনের ২৪ নং অধ্যাদেশ দ্বারা বিধিবদ্ধ হয়। ১৯৭৮ সনের ৪৯ নং অধ্যাদেশ জারীর পূর্ব পর্যন্ত প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটদেরকে ২ বছর পর্যন্ত জেল ও ১০০০ টাকা পর্যন্ত জরিমানা, দ্বিতীয় শ্রেণীর মেজিষ্ট্রেট দেরকে ৬ মাস পর্যন্ত জেল ও

২৮ Ordinance XXXVII of 1983.

২৯ Government of Bangladesh, Cabinet Division, Resolution on Reorganisation of the Administration at the Thana level (no. DA-12 (26) /82-449 dated 23rd October, 1982), vide 'Charter of duties of Thana (Later, Upazila) Nirbahi Officer.

৩০ Code of Criminal Procedute 1898 (as amended) sec. 32.

৩১ যদি ১৯০৯ সনের Whipping Act দ্বারা বিশেষভাবে ক্ষমতা প্রাপ্ত হন।

^ ম্যাজিষ্ট্রেট) এর ব্যবস্থা করা হয় । সরকার কোনও প্রথম বা দ্বিতীয় শ্রেণীর

LIBRARY
Bangladesh Public Administration

২০০/= টাকা পর্যন্ত জরিমানা এবং ৩য় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে ১ মাসের জেল এবং ৫০/= টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার ক্ষমতা অর্পিত ছিল। উক্ত অধ্যাদেশে প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে ৩ বছরের জেল ও ৫,০০০/- টাকা জরিমানা করার, দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে ২ বছরের জেল ও ২,০০০/- টাকা জরিমানা করার এবং তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটদেরকে ১ বছরের জেল ও ১,০০০/- টাকা পর্যন্ত জরিমানা করার ক্ষমতা প্রদান করা হয় যা ১৯৮২ সনের ২৪ নং অধ্যাদেশ জারী হওয়া পর্যন্ত বলবৎ থাকে।

ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন

বিগত দু'দশকে ফৌজদারী কার্যবিধির বেশ কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। প্রথমতঃ ফৌজদারী কার্যবিধির ১৮ নং অধ্যায় উঠিয়ে দিয়ে সেশনস কেসসমূহের বেলায় ম্যাজিস্ট্রেটদের প্রাথমিক আনুষ্ঠানিক শুনানী রহিত করা হয়েছে। পূর্বে সেশনস কেসের কগনিজেন্স ম্যাজিস্ট্রেট গ্রহণ করতঃ আদালতে আনুষ্ঠানিক ইংক্যোয়ারীর পর প্রয়োজনে দায়রা জজের আদালতে সোপর্দ করতেন। কিন্তু এ ব্যবস্থার ফলে দায়রা জজের আদালত সরাসরি ঐ ধরনের কেসসমূহ গ্রহণ করে থাকেন।

তবে সংশোধনীসমূহের মধ্যে ১৯৮২ সনের ফৌজদারী কার্যাবিধির ৩টি সংশোধনী ব্যাপক ও গুরুত্বপূর্ণ। পূর্বে বর্ণিত ৩২, ২৯ (সি) ও ৩৩ (এ) ছাড়াও ১৬৭ ধারা সংশোধন করতঃ পুলিশ তদন্তের সময়সীমা ৬০ দিনে সীমাবদ্ধকরণ যা ম্যাজিস্ট্রেট প্রয়োজনে আরো ৩০ দিন বৃদ্ধি করতে পারেন, ৩৩৯ (বি) ধারা ফৌজদারী কার্যবিধিতে সংযোজন করতঃ অন্ততঃ একটি বাংলা দৈনিক সংবাদপত্রে বিজ্ঞপ্তি প্রকাশের পর অনুপস্থিত আসামীকে অনুপস্থিতভাবে বিচার করার ব্যবস্থা করণ, ৩৩৯ (সি) ধারা সংযোজনের মাধ্যমে ম্যাজিস্ট্রেটের বিচার মামলা গ্রহণের সময় থেকে ৬০ দিনের মধ্যে সমাপ্ত করার এবং দায়রা জজ, অতিরিক্ত দায়রা জজ ও সহকারী দায়রা জজের ১২০ দিনের মধ্যে মামলা নিষ্পত্তি করার ব্যবস্থাকরণ উল্লেখ্য। অবশ্য তাঁরা যদি উক্ত সময়ে সংশ্লিষ্ট বিচারকার্য নিষ্পত্তি না করতে পারেন তাহলে নিষ্পত্তি না করার কারণ উল্লেখ করতঃ আরো ৩০ দিন অতিরিক্ত সময় নিতে পারেন। এতদ্ব্যতীত ফৌজদারী কার্যবিধিতে ৪৪২(এ) যোগ করত আপীল কোর্টের আপীল ও রিভিশনের সময়সীমা ৯০ দিনে সীমাবদ্ধ করা হয়েছে। কেস গ্রহণের ক্ষেত্রে সমন পদ্ধতি ও ওয়ারেন্ট পদ্ধতি একীভূতকরণ, সংক্ষিপ্ত বিচার পদ্ধতিতে অধিক সংখ্যক মামলা অন্তর্ভুক্তকরণ ইত্যাদি ফৌজদারী কার্যবিধির সংশোধনীসমূহের উল্লেখযোগ্য দিক।[৩২]

বিশেষ ধরনের আদালতসমূহ

বাংলাদেশের বিশেষ ধরনের আদালতসমূহের মধ্যে শ্রম আদালত, শ্রম আপীল আদালত, গ্রাম আদালত, সালিশবোর্ড আদালত, পারিবারিক আদালত, প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যাল, প্রশাসনিক আপীল ট্রাইবুন্যাল, শিশু আদালত সবিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রম আদালত ১৯৬৯ সনের শিল্প সম্পর্ক অধ্যাদেশ দ্বারা সৃষ্ট। শ্রম আদালতে একজন সভাপতি ও নিয়োগকারী কর্তৃপক্ষ এবং কর্মচারীর,

---

[৩২] এ প্রসঙ্গে দেখুন Government of Bangladesh, Cabenet Division, Hand Book on Criminal Law Reforms, 1983, pp. 1-12.

পক্ষের দু'জন সদস্য থাকেন। তাঁরা শ্রম বিরোধ মীমাংসা করে থাকেন। তাঁদের প্রদত্ত আদেশ ও 'এওয়ার্ড'[৩৩] শ্রম আপীল আদালতে আপীলযোগ্য।

গ্রাম্য আদালতে ইউনিয়ন পরিষদ চেয়ারম্যান সভাপতিত্ব করেন। এতদ্ব্যতীত বাদী ও বিবাদী পক্ষ প্রত্যেকে দু'জন সদস্য মনোনয়ন দান করেন। তবে প্রত্যেক পক্ষের অন্ততঃ একজন মনোনীত সদস্য ইউনিয়ন পরিষদের সদস্যদের মধ্য থেকে হতে হয়। উক্ত আদালতের সিদ্ধান্তে ঐকমত্য হলে অথবা চার সদস্যের মতৈক্য হলে তা চূড়ান্ত বলে বিবেচিত হয়। কিন্তু সিদ্ধান্ত যদি ৩-২ এ হয় তা হলে যে কোন পক্ষ ফৌজদারী মামলার ক্ষেত্রে উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেটের কাছে এবং দেওয়ানী মামলার ক্ষেত্রে সহকারী জজের কাছে রিভিশন দরখাস্ত করতে পারেন। গ্রাম্য আদালতে কোন আইনজীবী থাকবে না। এবং উক্ত আদালত ৫,০০০/- টাকা পর্যন্ত মূল্যমানের মামলা গ্রহণ করতে পারেন অথবা ৫,০০০/-টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ প্রদান করতে পারেন। গ্রাম্য আদালত ঐ মূল্যমানের চুরি, জোচ্চোরী ইত্যাদির বিচার করতে পারেন। অনুরূপভাবে শহর এলাকায় বিশেষ সালিশ অধ্যাদেশ ১৯৭৯ এর আওতায় সালিশ বোর্ড বিচারকার্য সম্পন্ন করে থাকেন। সালিশ বোর্ডের গঠন ক্ষমতা ও কার্যাবলী গ্রাম্য আদালতেরই অনুরূপ।

পরিবারিক আদালত একটা বিশেষ ধরনের আদালত। বিবাহ বিচ্ছেদ, অভিভাবকত্ব, ভরণ-পোষণ ইত্যাদি বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের জন্য ১৯৮৫ সনে উক্ত আইন প্রণয়ন করা হয়। উক্ত আদালত পারিবারিক বিষয়ে দেওয়ানী, ফৌজদারী ও সালিশী কার্যক্রম গ্রহণ করে থাকেন। সাধারণত সহকারী জজদেরকে উক্ত আদালতের বিশেষ এখতিয়ার প্রদান করা হয়।

সংবিধানের ১১৭ নং অনুচ্ছেদ অনুযায়ী জাতীয় সংসদ সরকারী কর্মচারীদের অভিযোগ নিষ্পত্তির জন্য প্রশাসনিক ট্রাইবুন্যাল আইন ১৯৮০ প্রণয়ন করেন। এটা একটা এক সদস্যবিশিষ্ট আদালত। প্রশাসনিক সর্বোচ্চ পর্যায়ে অভিযোগের কোন প্রতিকার না পেলে ছয় মাসের মধ্যে সংশ্লিষ্ট সরকারী কর্মচারী উক্ত আদলতে মামলা করতে পারেন। জেলা জজ পর্যায়ের এক সদস্য বিশিষ্ট উক্ত ট্রাইবুন্যালের বিরুদ্ধে দু'মাসের মধ্যে প্রশাসনিক আপীল ট্রাইবুন্যালে আপীল করা যেতে পারে। উক্ত আপীল ট্রাইবুন্যালের সভাপতি সুপ্রীম কোর্টের জজের মর্যাদা রাখেন এবং আরো দু'জন সদস্যের মধ্যে একজন অভিজ্ঞ বেসামরিক কর্মচারী থাকতে পারেন। উক্ত আপীল ট্রাইবুন্যালের সিদ্ধান্ত চূড়ান্ত বলে গণ্য হয় এবং সুপ্রীমকোর্টের হাইকোর্ট বিভাগ বা আপীল বিভাগের এর উপর কোন আপীল শ্রবণ করার এখতিয়ার নেই।

শিশু আদালত ১৯৭৪ সনের শিশু আইন অনুযায়ী গঠিত। একজন প্রথম শ্রেণীর সার্বক্ষণিক ম্যাজিস্ট্রেট এবং সংশ্লিষ্ট অন্যান্য কর্মচারী সমন্বয়ে উক্ত আদালত গঠিত। মাসে সাধারণতঃ দুই, তিন বা ততোধিক বার উক্ত আদালত বসে। যে সব ব্যক্তির বয়স ১৬ বছরের কম থাকে তাদের মামলাসমূহ উক্ত আদালত পরিচালনা করে থাকেন। এ আইন ১৯৭৬ সনের ১১ই সেপ্টেম্বর

[৩৩] 'Award' means the determination by a Labour Court, Arbitrator or Appellate Tribunal of any industrial dispute or any matter relating thereto and includes an interim award ; Vide Industrial Relations Ordinance 1969. Sec. 2(ii).

তারিখে ঢাকায় এবং ১৯৮০ সনের ১লা জুন তারিখে বাংলাদেশের সর্বত্র বলবৎ হয়। শিশু আদালতের ক্ষমতা আরোও কয়েকটি আদলতকে দেয়া হয়েছে। যথা—হাইকোর্ট বিভাগ, দায়রা জজের আদালত, অতিরিক্ত দায়রা জজের আদালত, সহকারী দায়রা জজের আদালত, উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত এবং প্রথম শ্রেণীর ম্যাজিষ্ট্রেটের আদালত। অপরাধে অভিযুক্ত শিশুর পিতা–মাতা বা অভিভাবককে আদালত বিচারের সময় উপস্থিত থাকতে নির্দেশ দিতে পারেন। ঘরোয়া পরিবেশে বিচারকার্য সম্পন্ন হয় বিধায় এ ধরনের মামলায় কোন উকিল রাখার প্রয়োজন হয় না। উক্ত আইনে শিশুদের জন্য রিম্যাণ্ডহোম ও সংশোধনী প্রতিষ্ঠানেরও ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। সমাজকল্যাণ বিভাগ রিম্যাণ্ডহোমকে 'কিশোর হাজত' নাম দিয়েছেন এবং ঢাকার অদূরে টঙ্গীতে সংশোধনী প্রতিষ্ঠান স্থাপন করেছেন।[৩৪]

উপসংহার

বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থার ক্রমবিকাশ অত্যন্ত তাৎপর্যপূর্ণ। বিচার কার্যের প্রধান সহায়ক দেওয়ানী কার্যবিধি, ফৌজদারী কার্যবিধি ও দণ্ড বিধি নানা অভিজ্ঞতার ফলে রচিত ও প্রণীত। কেবলমাত্র দেওয়ানী কার্যবিধি বৃটিশ আমলে ১৮৫৯, ১৮৭৭, ১৮৮২ এই তিনবার পরিবর্তিত হয়ে ১৯০৮ সনে চূড়ান্ত হয়েছিল। ঠিক তেমনিভাবে দণ্ডবিধি প্রণয়ন লর্ড মেকোলের মেধা ও পুঞ্জীভূত অভিজ্ঞতার ফল। ১৮৩৩ সনে বৃটিশ হাউস অফ কমন্সে সিদ্ধান্ত হয় যে বৃটিশ ভারতের জন্য পৃথক আইন ব্যবস্থা করা হবে। ১৮৪৫ সনে এ জন্য লর্ড মেকোলের সভাপতিত্বে একটি মিশন গঠন করা হয়। মেকোলে কমিশন কর্তৃক প্রণীত দণ্ডবিধি ১৮৫৬ সনে ইণ্ডিয়ান লেজিস্লেটিভ কাউন্সিলে পেশ করা হয়। কিন্তু ১৮৫৭ সনের সিপাহী বিদ্রোহের জন্য বিষয়টি স্থগিত রাখা হয়। অবশেষে ১৮৬০ সনে আইনটি বিধিবদ্ধ এবং ১৮৬২ সনের ১লা জানুয়ারী থেকে তা কার্যকর হয়। তেমনিভাবে ফৌজদারী কার্যবিধি অনেক চিন্তাভাবনার পরে ১৮৯৮ সনে প্রণীত হয়।[৩৫]

এটা ভাবতে অবাক লাগে যে, প্রায় দু'শতাব্দী পরও বৃটিশ আমলে রচিত এ সব আইনসমূহ প্রায় অবিকৃতভাবে আমাদের কোর্ট–কাচারীতে কাজে আসছে। অবশ্য সময়ের পরিবর্তনের সাথে সাথে কোন কোন ক্ষেত্রে সংশোধন করা হয়েছে মাত্র। কিন্তু কোন আমূল পরিবর্তন সাধন সম্ভবপর হয়নি। ভারতীয় প্রজাতন্ত্র ১৯৭৩ সনে ফৌজদারী কার্যবিধি নতুনভাবে বিধিবদ্ধ করছেন এবং একজিকিউটিভ ম্যাজিষ্ট্রেসী ও জুডিশিয়াল ম্যাজিষ্ট্রেসী আলাদা করেছেন বটে, কিন্তু এর কার্যকরিতার পূর্ণমূল্যায়ান এখনও করা যায়নি।

তেমনিভাবে ১৮৬১ সনের পুলিশ আইন এবং ১৯৪৩ সনের পুলিশ প্রবিধি[৩৬] মাঝে মধ্যে কিছুটা সংশোধনীসহ এখনও চালু রয়েছে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ৲ একটা ব্যতিক্রমধর্মী আইন

---

৩৪ এ প্রসঙ্গে দেখুন–গাজী শামসুর রহমান, বাংলাদেশের আইনে শিশু প্রসঙ্গ (ঢাকা, বাংলাদেশ শিশু একাডেমী ১৯৮৩) পৃঃ–২৬৩–৬৬।

৩৫ ফৌজদারী কার্যবিধি প্রণয়নের কারণসমূহ ও উদ্দেশ্যসমূহ গেজেট অফ ইণ্ডিয়া ১৮৯৭, পার্ট–৫, পৃঃ ৩৬৩ এবং এ সম্পর্কিত সিলেকশন কমিটির প্রতিবেদন গেজেট অফ ইণ্ডিয়া পার্ট–৫, পৃঃ ১৯–এ বর্ণিত হয়।

৩৬ ১৯৪৩ সনের পুলিশ প্রবিধি দ্বারা ইতিপূর্বে রচিত ১৯২৭ সনের পুলিশ প্রবিধি বতিল করা হয়।

DMP অধ্যাদেশ ১৯৭৬

ছিল। কিন্তু জারী করার পর পরই দেখা যায় যে উক্ত আইনটি প্রচলিত অনেকগুলো আইনের সাথে সাংঘাতপূর্ণ হয়েছে। ফলত ঐ বছরেরই শেষের দিকে প্রায় ডজনখানেক আইনের সংশোধন করতে হয়। তবুও দেখা যায় যে, পুলিশ কমিশনারের দায়িত্ব, চীফ মেট্রোপলিটান ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্ব ও জেলা ম্যাজিস্ট্রেটের দায়িত্বের মধ্যে বেশ ভুল বোঝাবুঝির অবকাশ থেকে গেছে এবং এ জন্য বিশেষ ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হয়।[৩৭]

আমাদের বিচার ব্যবস্থা স্বাধীন ও নিরপেক্ষ বলে স্বীকৃত। কিন্তু বিচারের দীর্ঘসূত্রিতা অনেকক্ষেত্রেই বিচারের উদ্দেশ্যকে ব্যাহত করে। একটা হিসাবে দেখা গেছে যে, হাইকোর্ট ডিভিশনে ১৯৮৪-৮৫ সনে ১৮,৫০০, ১৯৮৫-৮৬ সনে ২১,২০০, ১৯৮৬-৮৭ সনে ২৪,৭০০ মামলা বিচারাধীন ছিল।[৩৮] সার্বিকভাবে দেশের অন্যান্য অধঃস্তন আদালতে বহুসংখ্যক মামলা বছরের পর বছর নিষ্পত্তির অপেক্ষায় বিদ্যমান থাকার কারণে সরকার ১৯৮২ ও ১৯৮৩ সনে যথাক্রমে ফৌজদারী কার্যবিধি সংশোধন করতঃ তদন্ত, বিচার ও রায়ের সময়সীমা নির্ধারণের ফলে পরিস্থিতি কিছুটা আয়ত্বে আসার কথা। তদুপরি মিথ্যা মামলা দায়ের প্রমাণিত হলে বাদীর বিরুদ্ধেও ৬ মাসের জেল ও ৩,০০০/- টাকা জরিমানার শাস্তিমূলক ব্যবস্থা গ্রহণের পদ্ধতি মামলার সংখ্যা কমানোর ক্ষেত্রে কিছুটা কার্যকর ভূমিকা পালন করতে পারে।[৩৯]

প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরণ ও উপজেলা পদ্ধতি প্রবর্তনের সরকারী নীতির সাথে সাথে উপজেলা পর্যায়ে বিচার কাঠামো বিকেন্দ্রীকরণেরও প্রয়োজন দেখা দেয়। বাংলাদেশ সরকারী কর্মকমিশন ১৯৮৩ সনে বিশেষ সংক্ষিপ্ত পরীক্ষার মাধ্যমে ৬৫০ জন ম্যাজিস্ট্রেটের নিয়োগের সুপারিশ করেন এবং সাবেক জনপ্রশাসন প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠান (নিপা), সিভিল অফিসার্স ট্রেনিং একাডেমী (কোটা) এবং ষ্টাফ ট্রেনিং ইনষ্টিটিউট (এসটিআই)-তে তাদের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা করা হয়। আইন ডিগ্রীধারীদের ক্ষেত্রে মাত্র ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ এবং অন্যান্যদের ক্ষেত্রে দু'মাসের প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা হয়। কিন্তু দেখা যায় যে, ঐ প্রশিক্ষণ ব্যবস্থা খুবই অপর্যাপ্ত ছিল। কোন কোন ক্ষেত্রে আইন প্রশিক্ষণ ব্যতিরেকেই তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেট মাত্র এক মাসের জেল দিতে পারতেন এবং দীর্ঘ এক বছর বা নয় মাসের প্রশিক্ষণ পাওয়ার পূর্বে এ ক্ষমতা অর্পিত হত না, সেখানে কোন কোন ক্ষেত্রে প্রশিক্ষণ ব্যতীতই তৃতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়ে একজন দু'বছরের জেল দিতে পারেন। কিছুদিন পূর্বে যখন কোন উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট চাকরীচ্যুত হন, যিনি দ্বিতীয় শ্রেণীর ম্যাজিস্ট্রেটের ক্ষমতা সম্পন্ন ছিলেন তিনি তাঁর আপীলে উল্লেখ করেন যে, তিনি পূর্বে একজন

৩৭ স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় এ জন্য তদানীন্তন রাষ্ট্রপতির উপদেষ্টা জনাব শফিউল আজমের নেতৃত্বে একটা কমিটি গঠন করেন এবং এ সম্পর্কে একটা গবেষণা হয়। বর্তমান প্রবন্ধের লেখক আইন সংক্রান্ত বিষয়ে কমিটিকে সাহায্য করেন। ঐ উপলক্ষে ১৮৬৬ সনের কোলকাতা মেট্রোপলিটান পুলিশ আইন এবং উক্ত সনের কোলকাতা সাবারবান পুলিশ আইনও বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।

৩৮ The Bangladesh Observer p. 1c Colum. 6-7.

৩৯ Section 250 (5) of the Code of Criminal Procedure added by sec. 20 of Ordinance No. XXIV of 1982.

৭ এর ক্ষমতা অর্পিত হতে দেখা যায়। কয়েক দশক পূর্বে যেখানে তিনি

আইনজীবি ছিলেন বিধায় ম্যাজিষ্ট্রেট হিসাবে তাঁকে মাত্র ১৫ দিনের প্রশিক্ষণ দেয়া হয় এবং এটা বিচার বিভাগীয় দায়িত্ব পালনে ব্যর্থতার অন্যতম প্রধান কারণ ছিল।[৪০]

বিচার ব্যবস্থাকে উপজেলা পর্যায়ে নিয়ে যাওয়ার পরীক্ষা নিরীক্ষা অবশ্য ৬০–এর দশকের শেষের দিক থেকে শুরু হয়। তদানীন্তন পূর্ব পাকিস্তান সরকার ১৯৭০ সনে পরীক্ষামূলকভাবে ৪২টি থানায় ম্যাজিষ্ট্রেট নিয়োগ করেন। ঐ সব থানা ম্যাজিষ্ট্রেটদেরকে শুধু কমপ্লেইন্ট রেজিষ্টারের (সি–আর) মামলা করার ক্ষমতা দেয়া হয়, জেনারেল রেজিষ্টারের (জি–আর) মামলা করার ক্ষমতা দেয়া হয় নি। তদুপরি মহকুমা হাকিম ও থানা হাকিমের কমপ্লেইন্ট রেজিষ্টারের মামলা গ্রহণ করার সহবর্তমান (concurrent) এখতিয়ার ছিল। ফলে ক্ষেত্র বিশেষে এক পক্ষ মহকুমা হাকিমের কোর্টে এবং অন্য পক্ষ থানা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে একই সময়ে একে অন্যের বিরুদ্ধে মামলা শুরু করতেন। এক্ষেত্রে দু'পক্ষের দু'বার হয়রানী হতো। কোন কোন স্থানে (যথা পঞ্চগড়ে) মুন্সেফ ম্যাজিষ্ট্রেট অবশ্য সি–আর কেস ও জি–আর কেস উভয়টাই বিচার করার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হন।

বর্তমানে উপজেলা ব্যবস্থায় অবশ্য ঐ সব অসুবিধা দূরীকরণ করা হয়েছে। উপজেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সি-আর কেস ও জি-আর কেস উভয় ধরনেরই মামলা গ্রহণে এখতিয়ার প্রাপ্ত। তদুপরি একজন অভিজ্ঞ ম্যাজিষ্ট্রেট অর্থাৎ উপজেলা নির্বাহী অফিসার প্রতি উপজেলাতেই বিদ্যমান। সরকার সে জন্য ফৌজদারী কার্যবিধির ১৪৪ ধারা জারী ইত্যাদির ক্ষমতা উপজেলা নির্বাহী অফিসারের উপরই ন্যস্ত করেছেন। কিন্তু উপজেলা বিচার ব্যবস্থা আরও সুষ্ঠুভাবে গড়ে তোলার জন্য অধিক প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত ম্যাজিষ্ট্রেট ও বেঞ্চ ক্লার্ক এবং অভিজ্ঞ আইনজীবির প্রয়োজন রয়েছে।

বিচার বিভাগের স্বাধীনতা এবং শাসন বিভাগ থেকে বিচার বিভাগকে পৃথকীকরণ বাংলাদেশের সংবিধানের মূলনীতিতে রয়েছে।[৪১] এ মূলনীতি পাকিস্তানের ১৯৫৬ সনের সংবিধানেও ছিল।[৪২] কেবল ১৯৬২ সনের আইউব খান রচিত পাকিস্তানের সংবিধানে তার উল্লেখ ছিল না। ইদানীং বিচার বিভাগকে শাসন বিভাগ থেকে পৃথকীকরণ সম্পর্কে জাতীয় সংসদে আলোচনা হয়েছে। কিন্তু চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি। আমাদের সুপিরিয়র কোর্ট অবশ্যই শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রণাধীন নয়। এমনকি জেলা ও দায়রা জজ থেকে শুরু করে সাব জজ/সহকারী সেশন জজও শাসন বিভাগের নিয়ন্ত্রনাধীন নন। কেবল ম্যাজিষ্ট্রেসীর বেলায়ই শাসন বিভাগ বিচার বিভাগের সংমিশ্রণ দেখা যায়। স্পষ্টতঃ মূল সমস্যা হচ্ছে যে, ম্যাজিষ্ট্রেসী না থাকলে নিবারণমূলক ধারাসমূহ (Preventive sections) যথা : ফৌজদারী কার্যবিধির ১০৬–১১০ (মন্দ জীবন যাপন সম্পর্কে ব্যবস্থা), ১৩৩ (জনগণের বাধা দূরীকরণ), ১৪৪ (শান্তি ভংগের আশংকা দূরীকরণ), ১৪৫ (জমি–জমা সংক্রান্ত শান্তিভংগের আশংকা দূরীকরণ), ইত্যাদির দায়িত্ব কে গ্রহণ করবেন। বিচার বিভাগকে এসব দায়িত্ব

---

৪০ M. Safiur Rahman and Abdus Salam, A Study of the Procedure for Adjudication of Grievances of Public Employees (Dhaka : BPATC, 1989), pp. 46-48 (Mimeo).

৪১ Constitution of the People's Republic of Bangladesh.

৪২ Constitution of the Islamic Republic of Pakistan, 1956, Art. 30.

দিতে গেলে বিচারকরা প্রশাসনের সাথে জড়িত হয়ে পড়বেন, পক্ষান্তরে পুলিশকে এসব দায়িত্ব দিলে অনেকেই এর বিরোধিতা করবেন বলে আশংকা করা হয়।

আমাদের দেশের সাধারণ মানুষ বিভিন্ন আইন সম্পর্কে বিশেষতঃ নিজের অধিকার সম্পর্কে তেমন সচেতন নন। লেখক একটি ফৌজদারী আদালতে মামলায় লক্ষ্য করেছিলেন যে, বিবাদী আইনজীবি নিয়োগ করতে পারেননি এবং কয়েকটি অতি প্রয়োজনীয় কাগজপত্র সাক্ষ্য সাবুদ হওয়ার পর রায়ের পূর্বে দাখিল করেছিলেন, যা পদ্ধতিগত কারণে গৃহীত হয়নি। এ ছাড়া মামলার মূল খরচ কম হলেও আনুষঙ্গিক খরচাদি অনেক বেশী। অনেক ক্ষেত্রে শহুরে ও গ্রাম্য টাউটরা বাদী বিবাদী উভয়কেই ভুল পথে পরিচালিত করে। অন্য দিকে দেখা যায় যে, সহকারী জজরা দীর্ঘ দিন কেবল দেওয়ানী মামলা করার পর ^ সেশনস জজ পদে পদোন্নতির পর ফৌজদারী মামলা করতে গিয়ে বেশ একটু অসুবিধায় পড়েন। যাহোক, প্রশিক্ষণ ব্যবস্থার প্রসার এবং আইন চর্চার অভিজ্ঞতা বিনিময়ের মধ্যে আমাদের আইন ও বিচার কাঠামো পরিবর্তিত হতে পারে। হাদিসে আছে—'যে পেট পুরে খায় এবং তার প্রতিবেশী উপোষ যায় সে ঈমানদার নয়'। অথচ আমাদের আইন ব্যবস্থায় প্রতিবেশী না খেয়ে মারা গেলে তার পড়শীর শাস্তি হওয়ার কথা নয়, কিন্তু ক্ষুধার জ্বালায় সে যদি পড়শীর পাকশালায় ভাত চুরি করে ধরা পড়ে সে জন্য তার চৌর্যবৃত্তির অপরাধে ৩৭৯ ধারায় শাস্তি হতে পারে। বিচারালয়ে সর্বকালে এবং সর্বদেশেই Justice according to law হয়ে থাকে। সক্রেটিস, গ্যালিলিও, কোপার্নিকাস প্রমুখরা সকলেই প্রচলিত আইনের কারণে বিচারালয়ে শাস্তিপ্রাপ্ত হয়েছিলেন—এটা ইতিহাস স্বীকৃত। কাজেই আমাদের বিচার কাঠামোর পূর্ণাঙ্গ সাফল্যের সাথে আইন ব্যবস্থার যথাযথ সংশোধন ওতপ্রোতভাবে জড়িত।[৪৩]

---

৪৩ বাংলাদেশের বিচার ব্যবস্থা সম্পর্কে আরো দেখুন—Azizul Hoque, <u>The Legal System of Bangladesh</u> (Dhaka : Bangladesh Institute of Law and International Affairs, 1980), pp. 19-64. Also Z. A. Shamsul Huq, M. Safiur Rahman and others, <u>Handbook for the Magistrates</u> (Dhaka : BPATC, 1985), pp. 1-17.

^ সহকারী

উপজেলা প্রশাসনে কর্ম পরিবীক্ষণ পদ্ধতি

(Job Monitoring System in Upazila Administration)

— সিরাজুল ইসলাম

উপজেলা প্রশাসনে কর্ম পরিবীক্ষণ পদ্ধতির প্রয়োজনীয়তা যথাযথভাবে উপলব্ধি করতে হলে প্রথমে উপজেলা প্রশাসন সম্পর্কে সামগ্রীক ধারণা থাকা বাঞ্ছনীয়। তাই এ প্রবন্ধের প্রথম পর্বে উপজেলা প্রশাসনের ইতিবৃত্তি, ভূমিকা এবং উন্নয়ন বিনিয়োগ বরাদ্দ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। দ্বিতীয় পর্বে উদ্ভাবিত কর্ম পরিবীক্ষণ পদ্ধতি সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। ফলে কর্ম পরিবীক্ষণ পদ্ধতির উদ্ভাবনের প্রয়োজনীয়তা সহজেই অনুধাবন করা সম্ভব হবে।

পটভূমি

উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত বৃটিশ ঔপনিবেশিক আমলের প্রশাসনে গতি সঞ্চালনের জন্য বর্তমান সরকার শুরু থেকেই গুরুত্ব আরোপ করে আসছেন। এ লক্ষ্যে সরকার ১৯৮২ সালে বিভিন্ন প্রশাসনিক সংস্কারমূলক কার্যক্রম গ্রহণ করেন। প্রথমে এ সংস্কারমূলক কার্যক্রমের সম্ভাব্যতা পরীক্ষা নিরীক্ষার জন্য সরকার ১৯৮২ সালের ২৮শে এপ্রিল একটি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন প্রশাসনিক পুনর্গঠন/সংস্কার কমিটি গঠন করেন। উক্ত কমিটির দায়িত্ব ছিল :

(ক) জনগণের কার্যকর সেবা প্রদানের জন্য বর্তমান সুশীল প্রশাসনের (Civil Administration) সংগঠন ও কাঠামো পর্যালোচনা করে দুর্বলতা চিহ্নিতকরণ, এবং

(খ) প্রশাসনকে জনগণের দোর গোড়ায় নিয়ে যাওয়ার জন্য একটি যুগোপযোগী কার্যকর প্রশাসন ব্যবস্থার প্রবর্তনের জন্য সুপারিশমালা প্রদান।

উক্ত কমিটি মাত্র দু'মাসের (১৯৮২ সালের জুন) মধ্যেই সরকারের কাছে তাঁদের সুপারিশমালা পেশ করেন। উক্ত সুপারিশের ভিত্তিতে মূলতঃ বর্তমান উপজেলা প্রশাসনের উদ্ভব। সংগঠন হিসাবে উপজেলা প্রশাসন নতুন নয়। বিগত কয়েকশত বছর ধরেই বিভিন্ন ধরনের বিকেন্দ্রীকৃত স্থানীয় প্রশাসনের নজীর পাওয়া যায়। ১৮৭০ সালের চৌকিদারী পঞ্চায়েত আইন, ১৯৮৫ সালের বংগীয় স্থানীয় শাসন আইন, ১৯১৯ সালের বংগীয় পল্লী স্বায়ত্তশাসন আইন, ১৯৫৯ সালের মৌলিক গণতন্ত্র আদেশ, ১৯৭২ এবং ১৯৭৩ সালের রাষ্ট্রপতির আদেশ, ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ, ১৯৮০ সালের (১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশ) সংশোধনী উল্ল্যেখযোগ্য। বর্তমান প্রশাসনিক পদ্ধতি ১৯৮২ সালের স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ এবং উপজেলা পুনর্গঠন) অধ্যাদেশের বলে জারী করা হয়। পূর্বের সকল প্রশাসনিক ব্যবস্থা অপেক্ষা বর্তমান প্রশাসনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য, ক্ষমতা ও কার্যাবলী, বিনিয়োগ বরাদ্দ এবং লোকবল ব্যাপক ও প্রচুর। কামাল সিদ্দিকী এবং সৈয়দ নুরুজ্জামান সম্পাদিত উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়েলে এ সম্পর্কে

উল্লেখ রয়েছে যে ১৯৭৬ সালের স্থানীয় সরকার অধ্যাদেশে থানা পরিষদের সাতটি কাজ উল্লেখ ছিল, কিন্তু বর্তমানে উপজেলা পরিষদের কার্যাবলীর পরিধি ব্যাপকভাবে বৃদ্ধি করা হয়েছে,' বর্তমান উপজেলা পরিষদের সকল কার্যাবলীকে দুভাগে বিভক্ত করা হয়েছে ঃ ১। সংরক্ষিত ও ২। হস্তান্তরিত। জাতীয় দৃষ্টিকোণ থেকে গুরুত্বপূর্ণ উন্নয়নমূলক এবং আইন শৃংখলা ও নিয়ন্ত্রণমূলক কার্যক্রম সংরক্ষিত বিষয়ের আওতাধীন। অপর দিকে স্থানীয় পর্যায়ের উন্নয়নমূলক কার্যক্রম হস্তান্তরিত বিষয়ের এখতিয়ারাধীন।

উপজেলা পরিষদের সকল কার্যাবলীর (সংরক্ষিত ও হস্তান্তরিত) একটি বিবরণী নিম্নে প্রদর্শিত হ'ল ঃ

সংরক্ষিত বিষয়

১। দেওয়ানী ও ফৌজদারী বিচার ;

২। আয়কর, আবগারী ও আমদানী রফতানী শুল্ক, ভূমিকর, ভূমি রাজস্ব প্রভৃতি কেন্দ্রীয় রাজস্ব সমূহের প্রশাসন ও ব্যবস্থাপনা ;

৩। আইন শৃংখলা রক্ষা ;

৪। রেজিস্ট্রেশন ;

৫। খাদ্যশস্যের মত জরুরী দ্রব্যাদির সরবরাহ ব্যবস্থা ;

৬। বিদ্যুৎ শক্তির উৎপাদন ও বিতরণ ;

৭। আন্তঃজেলার সংযোগকারী সেচ প্রকল্প ;

৮। কারিগরি শিক্ষা, প্রাথমিক শিক্ষা এবং উচ্চ পর্যায়ের শিক্ষা, যেমন — কৃষি, কারিগরি, মেডিক্যাল শিক্ষা, উচ্চ বিদ্যালয়, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষা ;

৯। আধুনিক জেলা হাসপাতাল এবং মেডিক্যাল কলেজ সংলগ্ন হাসপাতাল ;

১০। বিজ্ঞান ও শিল্প গবেষণা পরিষদের ন্যায় জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ গবেষণা প্রতিষ্ঠান ;

১১। বৃহদায়তন বীজ প্রক্রিয়াজাতকরণ ও দুগ্ধখামার ;

১২। বৃহদাকার শিল্প প্রতিষ্ঠান ;

১৩। আন্তঃজেলা এবং আন্তঃ-উপজেলা যোগাযোগ মাধ্যমসমূহ ; যেমন ডাক, তার, টেলিফোন, রেলওয়ে, যন্ত্রচালিত স্থল ও জলযান ; মহাসড়ক, বেসরকারী বিমান চলাচল, বন্দর ও নৌচলাচল ;

১৪। বন্যা নিয়ন্ত্রণ এবং পানি সম্পদ উন্নয়ন ;

১৫। সামুদ্রিক মৎস্য আহরণ ;

১৬। খনিজ সম্পদ উত্তোলন ও উন্নয়ন ; এবং

১৭। জাতীয় পরিসংখ্যান সংগ্রহ ;

হস্তান্তরিত বিষয়

১। কৃষি – (সম্প্রসারণ, সেবা, উপকরণ সরবরাহ, সেচ সহ) ;
২। প্রাথমিক শিক্ষা ;
৩। স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা – (উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স, এম, সি, এইচ, সকল ধরনের জনসংখ্যা নিয়ন্ত্রণমূলক সেবা সহ) ;
৪। পল্লী পানি সরবরাহ এবং স্বাস্থ্য ব্যবস্থা কর্মসূচী ;
৫। পল্লী পূর্ত কর্মসূচী ;
৬। কাজের বিনিময়ে খাদ্য কর্মসূচী ;
৭। প্রাকৃতিক দুর্যোগে ত্রাণ কর্মসূচী ;
৮। সমবায় এবং সমবায়ভিত্তিক–পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম ;
৯। মৎস্য উন্নয়ন ;
১০। গবাদি পশু উন্নয়ন।

২। সংগঠন ও বিনিয়োগ

উপরোক্ত কার্যাবলী সুষ্ঠুভাবে সম্পাদনের জন্য সরকার সংগঠন কাঠামোতে মোট ১৮টি শাখা (Unit) ৯টি হস্তান্তরিত এবং ৯টি সংরক্ষিত) এবং ২৪৪টি পদ (নির্বাচিত প্রতিনিধিসহ) সৃষ্টি করেছেন। সংগঠন কাঠামো পরিশিষ্ট –ক তে উপস্থাপিত হল। এতদভিন্ন সরকার প্রতি বছর প্রতি উপজেলায় "৩০ থেকে ৭০ লক্ষ টাকা"[২] উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী বরাদ্দ করছেন। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায় যে, সরকার বিগত পাঁচ বছরে (১৯৮২–৮৩ থেকে ১৯৮৬–৮৭ অর্থ বছর পর্যন্ত) উপজেলা পরিষদের উন্নয়ন কার্যক্রম পরিচালনার জন্য মোট ৯০০.৯৫ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছেন। বছর ওয়ারী এর খতিয়ান সারণী –১ এ প্রদর্শিত হল ঃ

সারণী - ১
বছর ওয়ারী উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী

অর্থ বছর	কোটি টাকা
১৯৮২–৮৩	১৩০.০০
১৯৮৩–৮৪	১৭০.৯৫
১৯৮৪–৮৫	২০০.০০
১৯৮৫–৮৬	২০০.০০
১৯৮৬–৮৭	২০০.০০
মোট ঃ	৯০০.৯৫

Source : Faizullah, Mohammad, Development of Local Government in Bangladesh, Dhaka , National Institute of Local Government, 1987. p.75.

উপরোক্ত উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী ছাড়াও সরকার উপজেলার ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে বিগত পাঁচ বছরে (১৯৮২-৮৩ থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছর পর্যন্ত) মোট ৯২৫.০০ কোটি টাকা ব্যয় বরাদ্দ করেছেন। বছর ওয়ারী এর খতিয়ান সারণী-২ এ দেখানো হ'ল ঃ

সারণী -২
বছর ওয়ারী উপজেলা ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দ

অর্থ বছর	কোটি টাকা
১৯৮২-৮৩	১৩০.০০
১৯৮৩-৮৪	১৭২.৩০
১৯৮৪-৮৫	২২৩.০০
১৯৮৫-৮৬	২২৫.০০
১৯৮৬-৮৭	১৭৫.০০
মোট ঃ	৯২৫.৩০

Source : Faizullah, Mohammad, Development of Local Government in Bangladesh, Dhaka , National Institute of Local Government, 1987. p.76.

উপজেলা সৃষ্টির পর থেকে ১৯৮৬-৮৭ অর্থ বছর পর্যন্ত উপজেলা পরিষদে উন্নয়ন সহায়তা মঞ্জুরী এবং ভৌত অবকাঠামো নির্মাণে সর্বমোট ১৮২৬.২৫ কোটি টাকা (৯০০.৯৫ + ৯২৫.৩০) বরাদ্দ করা হয়েছে। ইতিমধ্যেই এ বরাদ্দ ২০০০ কোটি টাকা ছাড়িয়ে গেছে। এছাড়াও সরকার স্থানীয় সম্পদ আহরণের মাধ্যমে অর্থ যোগানের জন্য উপজেলা পরিষদকে ব্যাপক ক্ষমতা দান করেছেন। ১৯৮২ সালের স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা পুনর্গঠন) অধ্যাদেশের ৩২(২) ধারা অনুযায়ী প্রত্যেক উপজেলা পরিষদের অধীনে একটি তহবিল থাকবে যা উপজেলা পরিষদ তহবিল নামে আখ্যায়িত হবে। নিম্নোক্ত উৎস থেকে প্রাপ্ত টাকা উক্ত তহবিলের এখতিয়ারে থাকবে ঃ

(ক) বর্তমান অর্ডিন্যান্সের অধীনে পরিষদ কর্তৃক আরোপিত সকল কর, খাজনা, তোলা, ফি ও অন্যান্য চার্জ,

(খ) পরিষদের কাছে অর্পিত বা পরিষদ কর্তৃক পরিচালিত সকল সম্পত্তির খাজনা বা লাভ,

(গ) বর্তমান অর্ডিন্যান্সে বা সাময়িকভাবে বলবৎ অন্য কোন আইনের অধীনে সম্পাদিত কাজের মাধ্যমে পরিষদের প্রাপ্ত অর্থ,

(ঘ) কোন ব্যক্তি বা প্রতিষ্ঠান বা স্থানীয় কর্তৃপক্ষ কর্তৃক সাহায্য হিসাবে প্রদত্ত অর্থ,

(ঙ) পরিষদের ব্যবস্থাপনায় প্রদত্ত ট্রাষ্ট থেকে প্রাপ্ত অর্থ,

(চ) সরকার বা অন্যান্য কর্তৃপক্ষ প্রদত্ত অনুদান,

(ছ) বিনিয়োগ থেকে প্রাপ্ত সকল লাভ, এবং

(জ) সরকার কর্তৃক পরিষদের অধীনে অর্জিত হতে পারে এমন সকল সূত্র থেকে প্রাপ্ত অর্থ।[৩]

৩। তত্ত্বাবধান ও পরিবীক্ষন

বাংলাদেশের মত উন্নয়নশীল দরিদ্র দেশে স্থানীয় উন্নয়নে উল্লেখিত বিনিয়োগ খানিকটা অপ্রতুল মনে হলেও সরকার গড়ে প্রতি বছর বার্ষিক উন্নয়ন বরাদ্দের (ADP) ১৮.৩৫% তহবিল প্রদান করছেন। ইতিপূর্বে এ পরিমাণ অর্থ বরাদ্দ করা হয়নি। সুতরাং এ প্রয়াস নিঃসন্দেহে প্রশংসার দাবীদার। কিন্তু এ সহায়তা তহবিলের সুষ্ঠু ও সর্বাত্মক ব্যবহার নিশ্চিত করে উন্নয়ন প্রক্রিয়াকে ত্বরান্বিত করতে হলে ব্যবস্থাপনা প্রযুক্তির উন্নয়ন ও সৃজনশীল প্রয়োগ অপরিহার্য। প্রশাসনিক বিকেন্দ্রীকরনের ফলে উপজেলা এবং কেন্দ্রের মধ্যে সম্পর্কের খানিকটা ব্যবধান বা দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে। এ ব্যবধান কমানোর জন্য উপজেলা প্রশাসনের সকল কার্যক্রমের সুষ্ঠু তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ প্রয়োজন।

নিরবচ্ছিন্ন ও নিবিড় পদ্ধতির মাধ্যমে এ নিয়ন্ত্রন সুষ্ঠুভাবে বজায় রাখা সম্ভব। বর্তমান তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণ ব্যবস্থায় দৃঢ় আইনগত ভিত্তি থাকলেও পদ্ধতিগত দিক থেকে অপ্রতুল। স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনিক পূনর্গঠন) অধ্যাদেশ, ১৯৮২ তে এ মর্মে উল্লেখ রয়েছে যে "The authority of government to interfere in the matters of the upazila parishad is almost unlimited as it can cause suomoto enquiries generally or on any particular issue (S-51) and on the results of such enquiry may supersede the parishad (S-52)".[4] এছাড়াও বর্তমান পরিবীক্ষণ কার্যক্রম সীমাবদ্ধ আঙ্গিকে পরিচালিত হচ্ছে। এ কার্যক্রমের আওতায় শুধুমাত্র প্রকল্পসমূহ পরিবীক্ষিত হচ্ছে। উপজেলার অন্যান্য কার্যাবলী নিবিড় ও নিরবচ্ছিন্নভাবে পরিবীক্ষিত হচ্ছে না। উপজেলায় নিয়োজিত প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী, বিশেষ করে, প্রতিটি ইউনিট বা শাখায় কতটুকু কাজ সম্পাদিত হচ্ছে, আরো কাজ সম্পাদন করা সম্ভব কিনা, নিয়োজিত অর্থ ও লোকবল কি ভাবে এবং কতটুকু সদ্ব্যবহৃত হচ্ছে তাও পরিবীক্ষন করা প্রয়োজন। অন্যভাবে বলতে গেলে বলা যায় যে উপজেলায় প্রকল্পসমূহের পরিবীক্ষণ ছাড়াও অন্যান্য মৌলিক কার্যাবলীর পরিবীক্ষণ প্রয়োজন। এ ব্যবস্থাকে কর্মপরিবীক্ষণ পদ্ধতি (Job Monitoring System) হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। এ লক্ষ্যে হস্তান্তরিত বিষয়সমূহের জন্য একটি পরিবীক্ষণ পদ্ধতির (পরিশিষ্ট–খ) উদ্ভাবন করা হয়েছে। এর ফলে হস্তান্তরিত বিষয়ের সকল ইউনিট বা শাখার সকল অর্পিত কার্যাবলী অব্যাহত ও নিবিড়ভাবে পরিবীক্ষণ করা সম্ভব হবে।

এ পদ্ধতির উদ্ভাবনে ইউনিটসমূহের কার্যাবলী, ইউনিটের কর্মকর্তাদের কর্ম বিবরণী (Job Description) বিশ্লেষণ করা হয়েছে। এর মাধ্যমে প্রতিটি কর্মের মৌলিক উপাদানসমূহ বিশ্লেষণ

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

ও চিহ্নিত করে তা পরিবীক্ষণ ছকে সন্নিবেশ করা হয়েছে। সর্বমোট নিম্নলিখিত ৯টি কার্যক্রমের জন্য এ ছক ব্যবহার করা যেতে পারে ঃ

১। প্রকৌশল ;
২। কৃষি ;
৩। মৎস্য ;
৪। পশুপালন ও পশু চিকিৎসা ;
৫। স্বাস্থ্য ও পরিবার পকিল্পনা ;
৬। পল্লী উন্নয়ন ;
৭। সমবায় ;
৮। শিক্ষা ;
৯। সমাজ কল্যাণ

শুধুমাত্র প্রকৌশল কার্যক্রমের জন্য উদাহরণ সম্বলিত পূর্ণাংগ পরিবীক্ষণ ছক পরিশিষ্ট 'খ'তে সন্নিবেশিত হল। অপর ৮টি কার্যক্রমের জন্য একই ছক ব্যবহার করা যেতে পারে। তাই ঐ সকল কার্যক্রম পরিবীক্ষণের জন্য কোন ছক এ প্রবন্ধে সংযোজিত হ'ল না। তবে প্রতিটি কার্যক্রমের মৌলিক কাজের উপাদান সমূহের মধ্যে পার্থক্য রয়েছে। তাই ঐ সকল কার্যক্রমের মৌলিক কাজের উপাদানসমূহ পরিশিষ্ট 'গ'তে বিবৃত হ'ল। এ কাজের উপাদানসমূহ উক্ত পরিবীক্ষণ ছক ব্যবহার করে ঐ সকল কার্যক্রমের পরিবীক্ষণ করা সম্ভব।

প্রাথমিকভাবে এ পদ্ধতি উপজেলায় পরীক্ষামূলকভাবে প্রয়োগ করা যেতে পারে এবং প্রয়োজনবোধে সংশোধন ও পরিমার্জনের পর চূড়ান্তভাবে গৃহীত হতে পারে। আশা করা যায় যে এ পদ্ধতির প্রয়োগে প্রশাসনে উল্লেখযোগ্য সুফল পাওয়া যাবে। ১৯৭৫ সালে বাস্তবায়ন পরিবীক্ষণ ও মূল্যায়ন বিভাগ (পূর্ববর্তী নাম প্রকল্প বাস্তবায়ন ব্যুরো) সৃষ্টি হওয়ার পর প্রকল্প বরাদ্দ বিশোষন (absorption) দক্ষতা বহুগুণে বৃদ্ধি পায়। পরিকল্পনা কমিশনের নির্দেশমালায় এ প্রসংগে উল্লেখ রয়েছে যে "...... উন্নয়ন সংস্থাসমূহের উন্নয়ন বরাদ্দ সদ্ব্যবহারের ক্ষমতা ১৯৭৫ সালের তুলনায় ৫০০% বৃদ্ধি পাইয়াছে এবং বাস্তব কাজের অগ্রগতিতেও উল্লেখযোগ্য উন্নতি সাধিত হইয়াছে"।[৫] ঠিক তেমনিভাবে এ কর্ম পরিবীক্ষণ পদ্ধতিও স্থানীয় সম্পদ আহরণ এবং সম্পদের বিশোষণ ক্ষমতা বৃদ্ধি করবে। প্রত্যেক কর্মকর্তা ও কর্মচারী তাঁদের সকল দায়িত্ব সম্পর্কে অব্যাহতভাবে সচেতন থাকবেন এবং তা প্রতিপালনে তৎপর হবেন। ফলে সার্বিকভাবে সুষম উন্নয়ন ত্বরান্বিত হবে। অপরদিকে শীর্ষ পর্যায়ের কর্মকর্তাবৃন্দ নিরবচ্ছিন্নভাবে উপজেলায় সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তা ও তাঁর ইউনিটের কাজের অগ্রগতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল থাকবেন। পরিবীক্ষণ ছকে উপস্থাপিত তথ্য ও উপাত্ত কর্মকর্তা ও কর্মচারীদের বস্তুনিষ্ঠ সম্পাদিত কার্য মূল্যায়নে (performance evaluation) সহায়ক হবে।

পরিবীক্ষণ ছকে বিবৃত মৌলিক কর্ম উপাদান এবং পরিকল্পিত ও প্রকৃত কাজের তারতম্য বিশ্লেষণ (Variance Analysis) উন্নয়ন পরিকল্পনা প্রণয়ন, বাস্তবায়ন, নিয়ন্ত্রণ ও মূল্যায়নের গুণগত মান উন্নয়নে সহায়ক হবে। তথ্য ব্যবস্থাপনা ও পরিসংখ্যান কার্যক্রমকেও সুদৃঢ় করবে।

৪। পরিবীক্ষণ ছকের ব্যাখ্যা

পরিবীক্ষণ ছকটি পূরণের জন্য প্রতিটি কলামের ব্যাখ্যা নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

কলাম (Column) – ১ ঃ প্রতিটি কর্ম উপাদানের ক্রমিক নম্বর দিতে হবে।

কলাম (Column) – ২ ঃ প্রতিটি ইউনিট এবং/অথবা ইউনিটে নিয়োজিত কর্মকর্তাদের কর্ম বিবরণী বিশ্লেষণ করে কাজের মৌলিক উপাদানগুলো সন্নিবেশ করা হয়েছে।

কলাম (Column) – ৩ ঃ কলাম-২ এ বিবৃত কাজগুলো পরিমাণগত এককে (Quantitative Unit) প্রকাশ করা হয়েছে। সংশ্লিষ্ট কাজের ধরণ অনুযায়ী এ একক প্রকাশ করতে হবে। কোন কোন কাজ সংখ্যায়, কোন কাজ বর্গকিলোমিটারে, কোন কাজ বর্গফুটে ইত্যাদি পরিমাণগত এককে প্রকাশ করতে হবে।

কলাম (Column) –৪ ঃ কোন নির্দিষ্ট সময়ের জন্য কতটুকু কাজ সম্পাদন করতে হবে তা পূর্বেই নির্ধারণ করা প্রয়োজন। উক্ত পূর্ব নির্ধারিত কাজের পরিমাণগত একক উল্লেখ করতে হবে।

কলাম (Column) – ৫ ঃ প্রকৃত সম্পাদিত কাজ পরিমাণগত এককে প্রকাশ করতে হবে।

কলাম (Column) – ৬ ঃ কলাম ৪ এবং কলাম ৫ এর মধ্যে পার্থক্য নির্ণয় করতে হবে (অর্থাৎ পরিকল্পিত কাজ এবং প্রকৃত সম্পাদিত কাজের মধ্যে পার্থক্য)। প্রকৃত সম্পাদিত কাজ পরিকল্পিত কাজের চেয়ে বেশী হলে পজিটিভ তারতম্য (Positive Variance) এবং কম হলে নেগেটিভ তারতম্য (Negative Variance) হবে। পজিটিভ হলে যোগ চিহ্ন এবং নেগেটিভ হলে বিয়োগ চিহ্ন দিতে হবে।

কলাম (Column) – ৭ ঃ প্রকৃত সম্পাদিত কাজ পরিকল্পিত কাজের শতকরা হারে কতটুকু তা প্রকাশ করতে হবে। এর মাধ্যমে শতকরা হারে প্রকৃত কাজের অগ্রগতি জানা যাবে।

কলাম (Column) – ৮ ঃ কলাম ২ এ বিবৃত সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদনে ব্যয় পূর্বেই নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। এ পূর্বনির্ধারিত ব্যয়ই (estimated expense) এ কলামে উল্লেখ করতে হবে।

কলাম (Column) – ৯ ঃ কলাম – ২ এ বিবৃত সংশ্লিষ্ট কাজ সম্পাদনে কত ব্যয় হয়েছে অর্থাৎ প্রকৃত কত খরচ হয়েছে তা উল্লেখ করতে হবে।

কলাম (Column) – ১০ ঃ কলাম ৮ এবং ৯ এর মধ্যে পার্থক্য। কলাম ৯ অর্থাৎ প্রকৃত ব্যয় অধিক হলে নেগেটিভ এবং কলাম ৯ কম হলে পজিটিভ তারতম্য হবে এবং পজিটিভ নেগেটিভ যোগ বা বিয়োগ চিহ্ন দিয়ে প্রকাশ করতে হবে।

কলাম (Column) – ১১ ঃ কলাম ৬ এবং কলাম ১০ এ কোন তারতম্য হয়ে থাকলে তার কারণ উল্লেখ করতে হবে। যেমন ঃ লোকবল বা অর্থের অভাবে কাজ সম্পন্ন করা যায়নি ইত্যাদি যৌক্তিকতার বিবরণ দিতে হবে।

কলাম (Clumn) ১২–১৩ঃ বর্তমান প্রতিবেদনাধীন সময়ের অব্যবহিত পূর্বের সময়ের কাজের অগ্রগতির সাথে বর্তমান কাজের তুলনা করার জন্য এ দুটি কলামের ব্যবস্থা করা হয়েছে যাতে বোঝা যায় যে কোন্ সময় কাজ বেশী বা কম হয়েছিল। সুতরাং পূর্ববর্তী প্রতিবেদনের প্রকৃত কাজ ও ব্যয়ের পরিমাণ এখানে উল্লেখ করতে হবে।

কলাম (Column) – ১৪ – ১৫ ঃ পদ্ধতি চালু হওয়ার শুরু থেকে অথবা অর্থ বছরের শুরু থেকে বর্তমান প্রতিবেদনাধীন সময় পর্যন্ত সকল প্রকৃত ব্যয়ের যোগফল এখানে উল্লেখ করতে হবে। যাতে মোট অগ্রগতি সম্পর্কে এক নজরে ধারণা করা সম্ভব হয়।

কলাম (Column) – ১৬ ঃ প্রতিবেদক যদি মনে করেন তাহলে তিনি অতিরিক্ত মতামত প্রদান করতে পারেন। এখানে তাঁর কাজ সম্পাদনে প্রতিবন্ধকতা বা সুবিধা বা অন্য যে কোন পরামর্শ বা মতামত তিনি পোষণ করতে পারেন।

৫। উপসংহার

উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনায় এ পরিবীক্ষণ পদ্ধতি উল্লেখযোগ্য অবদান রাখবে সে বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই। তবে এ পদ্ধতি কোন চিরন্তন পদ্ধতি নয় বা এর মাধ্যমে উন্নয়ন ও ব্যবস্থাপনার সকল সমস্যা সমাধান করাও সম্ভব হবে না। এর সুফল শুধু মাত্র এর পরিধির মধ্যেই সীমাবদ্ধ। তাছাড়া পরিস্থিতি, পরিবেশ ও সময়ের বিবর্তনের সাথে সাথে এ ব্যবস্থারও সংশোধন ও পরিমার্জন প্রয়োজন হতে পারে। তবে এখানে হস্তান্তরিত বিষয়ের মৌলিক কাজের পরিমাণগত রূপ দেয়ার চেষ্টা করা হয়েছে। ফলে প্রশাসনে কার্যকর জবাবদিহিতা নিশ্চিত করা সম্ভব হবে এবং শীর্ষস্থানীয় কর্মকর্তাবৃন্দ উপজেলার কাজ সুষ্ঠু ও নিরবচ্ছিন্নভাবে তদারকী ও পরিবীক্ষণ করতে সক্ষম হবেন।

পাদটিকা ও তথ্যপঞ্জী

১। সিদ্দিকী, কামাল এবং নুরুজ্জামান,সৈয়দ (সম্পাদিত), উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়েল, ঢাকা, ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, ১৯৮৬। পৃঃ ২৬।

২। স্থানীয় সরকার বিভাগ, উপজেলা কর্তৃক গৃহীত উন্নয়ন প্রকল্পসমূহের মূল্যায়ন প্রতিবেদন ১৯৮৩-৮৪ ও ১৯৮৪-৮৫ অর্থ বৎসর, ঢাকা, আগষ্ট ১৯৮৬। পৃঃ (ক)

৩। স্থানীয় সরকার (উপজেলা পরিষদ ও উপজেলা প্রশাসনিক পুনর্বাসন) অধ্যাদেশ ১৯৮২, সিদ্দিকী, কামাল এবং নুরুজ্জামান, সৈয়দ সম্পাদিত উপজেলা পরিষদ ম্যানুয়েল, ঢাকা, ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব লোকাল গভর্ণমেন্ট, ১৯৮৬, ১৯৮৬, পৃঃ ৬৩৩-৩৪ এ সন্নিবেশিত।

4. Planning Commission, Instructions and guidelines on processing and implementation of Development Project, Dhaka, April, 1984. p-191.

5. Faizullah, Mohammad, Development of Local Government in Bangladesh, Dhaka : National Institute of Local Government, 1987. p-45.

6. Islam, Md.Shirajul, An Opinion Survey on the Personnel Transfer System in Upazila Administration, Savar. Banslaadesh Public Administration Training Centre, 1989.

7. Sultan, K.M. Tipu (ed.), Administrative Decentralization in SAARC Countries, Comilla : Bangladesh Academy for Rural Development, 1987.

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

পরিশিষ্ট -- ক

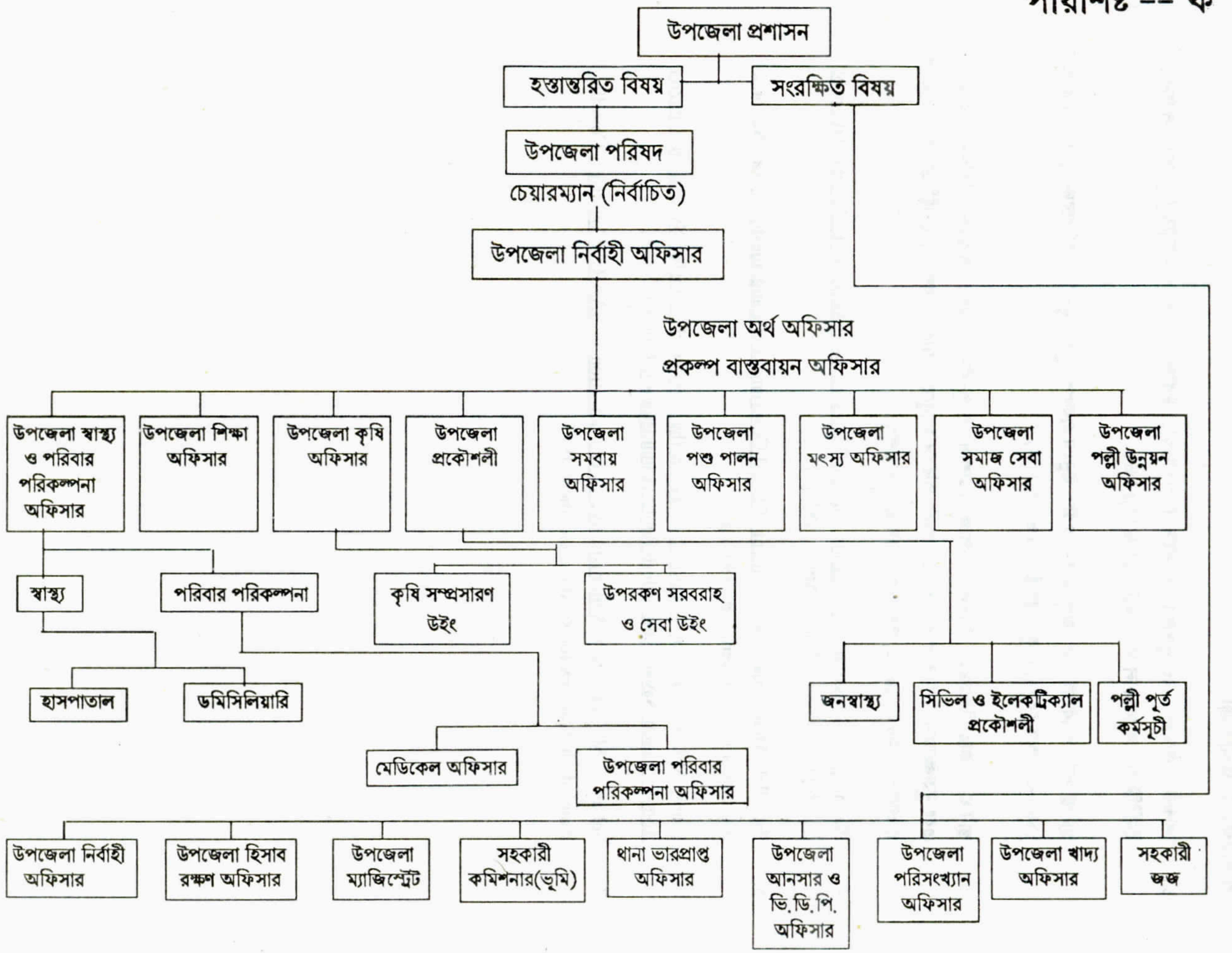
উপজেলা প্রশাসন
হস্তান্তরিত বিষয়
সংরক্ষিত বিষয়
উপজেলা পরিষদ
চেয়ারম্যান (নির্বাচিত)
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উপজেলা অর্থ অফিসার
প্রকল্প বাস্তবায়ন অফিসার
উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা অফিসার
উপজেলা শিক্ষা অফিসার
উপজেলা কৃষি অফিসার
উপজেলা প্রকৌশলী
উপজেলা সমবায় অফিসার
উপজেলা পশু পালন অফিসার
উপজেলা মৎস্য অফিসার
উপজেলা সমাজ সেবা অফিসার
উপজেলা পল্লী উন্নয়ন অফিসার
স্বাস্থ্য
পরিবার পরিকল্পনা
কৃষি সম্প্রসারণ উইং
উপরকণ সরবরাহ ও সেবা উইং
হাসপাতাল
ডমিসিলিয়ারি
জনস্বাস্থ্য
সিভিল ও ইলেকট্রিক্যাল প্রকৌশলী
পল্লী পূর্ত কর্মসূচী
মেডিকেল অফিসার
উপজেলা পরিবার পরিকল্পনা অফিসার
উপজেলা নির্বাহী অফিসার
উপজেলা হিসাব রক্ষণ অফিসার
উপজেলা ম্যাজিস্ট্রেট
সহকারী কমিশনার(ভূমি)
থানা ভারপ্রাপ্ত অফিসার
উপজেলা আনসার ও ভি.ডি.পি. অফিসার
উপজেলা পরিসংখ্যান অফিসার
উপজেলা খাদ্য অফিসার
সহকারী জজ

পরিশিষ্ট – খ

প্রকৌশল কার্যক্রম পরিবীক্ষন

তারিখ ঃ ————————

(মেয়াদ ঃ ———————————— তারিখ থেকে ———————————— তারিখ পর্যন্ত

ইউনিট/শাখা প্রধানের নাম ঃ ———————————————— পদবী ———————————— উপজেলা ————————————

ক্রমিক নং	অর্পিত দায়িত্ব/ কাজের উপাদান	কাজের একক(unit) (সংখ্যা/মিটার/ টাকা বা অন্য যে কোন নিয়ামকে উল্লেখ করুন)	কাজের অগ্রগতি সংশ্লিষ্ট এককে			কাজের অগ্রগতি শতকরায়	আর্থিক অগ্রগতি (টাকায়)				পূর্ববর্তী সময়ের প্রকৃত (Actual) অগ্রগতি		কিউমুলেটিভ (Cumulative) অগ্রগতি		অন্যান্য মন্তব্য (যদি থাকে)
			পরিকল্পিত (Planned)	প্রকৃত (Actual)	তারতম্য (+ –) (Variance)	প্রকৃত কাজ	বাজেট	প্রকৃত ব্যয়	তারতম্য (+ –)	তারতম্যের কারণ	কাজ (এককে)	আর্থিক (টাকায়)	কাজ (এককে)	আর্থিক (টাকায়)	
১	২	৩	৪	৫	৬= (৪–৫)	৭	৮	৯	১০= (৮–৯)	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
১।	**টিউব ওয়েল স্থাপন ঃ**														
	ক) গভীর	সংখ্যা	২টি	১টি	১টি	৫০%	২ লাখ	১ লাখ	–১ লাখ	–লোক বলের অভাব – বিলম্বে অর্থ অবমুক্তি	১টি	১লাখ	৫টি	৪ লাখ	
	খ) অগভীর	,,													
	গ) ডিপ সেট	,,													
	ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)														
২।	**টিউব ওয়েল মেরামত ঃ**														
	ক) গভীর	,,													
	খ) অগভীর	,,													

১	২	৩	৪	৫	৬= (৪–৫)	৭	৮	৯	১০= (৮–৯)	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
	গ) ডিপসেট	,,													
	ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)														
৩।	সেচ ঃ														
	ক) যন্ত্রপাতি ক্রয়	,,													
	খ) যন্ত্রপাতি বিতরণ	,,													
	গ) যন্ত্রপাতি মেরামত	,,													
	ঘ) খাল খনন	বঃ কিঃ মিঃ													
	ঙ) খাল পুনর্খনন	,,													
	চ) নালা নির্মাণ	বর্গফুট/ মিটার													
	ছ) নালা পুনঃনির্মাণ	,,													
	জ) বাঁধ নির্মাণ	,,													
	ঝ) বাঁধ মেরামত	,,													
	ঞ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)														

১	২	৩	৪	৫	৬= (৪-৫)	৭	৮	৯	১০= (৮-৯)	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৪।	**সেতু /কালভার্ট নির্মাণ ঃ**														
	ক) পাকা	সংখ্যা													
	খ) আধা পাকা	,,													
	গ) কাঠের/ বাঁশের	,,													
	ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)														
৫।	**সেতু/কালভার্ট মেরামত /সংস্কার ঃ**														
	ক) পাকা	,,													
	খ) আধা পাকা	,,													
	গ) কাঠের/ বাঁশের	,,													
	ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)														
৬।	**রাস্তা নির্মাণ ঃ**														
	ক) পাকা	বঃ কিঃ মিঃ													
	খ) আধা পাকা	,,													

১	২	৩	৪	৫	৬= (৪–৫)	৭	৮	৯	১০= (৮–৯)	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
	গ) কাঁচা	,,													
	ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)														
৭।	**রাস্তা মেরামত /সংস্কার ঃ**														
	ক) পাকা	বঃ কিঃ মিঃ													
	খ) আধা পাকা	,,													
	গ) কাঁচা	,,													
	ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)														
৮।	**সেনিটারী পায়খানা ঃ**														
	ক) নির্মাণ	সংখ্যা													
	খ) বিক্রয় / বিতরণ	,,													
	গ) মেরামত	,,													
	ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)														

১	২	৩	৪	৫	৬= (৪–৫)	৭	৮	৯	১০= (৮–৯)	১১	১২	১৩	১৪	১৫	১৬
৯।	অন্যান্য অতিরিক্তি কাজ, যদি থাকে (উল্লেখ করুন) ঃ														
	ক) ____														
	খ) ____														
	গ) ____														

পরিশিষ্ট – গ

মৌলিক কাজের উপাদানসমূহ

কৃষি কার্যক্রম	মৎস্য কার্যক্রম	পশু পালন ও পশু চিকিৎসা কার্যক্রম
১। প্রদর্শনী খামার স্থাপন ২। নার্সারী স্থাপন ৩। সেচ : ক) যন্ত্র ক্রয় খ) যন্ত্র বিতরণ গ) যন্ত্র মেরামত/ সার্ভিসিং ঘ) খাল খনন ঙ) খাল পুনঃখনন চ) নালা নির্মাণ ছ) নালা পুনঃ খনন জ) নলকূপ স্থাপন ঝ) নলকূপ মেরামত/সার্ভিসিং ঞ) পাম্প স্থাপন ট) পাম্প মেরামত/ সার্ভিসিং ৪। সম্প্রসারণ কর্মীদের প্রশিক্ষণ ঃ ক) কোর্স খ) প্রশিক্ষণার্থী ৫। কৃষকদের প্রশিক্ষণ ঃ ক) কোর্স খ) প্রশিক্ষণার্থী ৬। কৃষি উপাদান বিতরণ ঃ ক) সার খ) বীজ গ) কীটনাশক ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ৭। কৃষকদের উপদেশনা ৮) অন্যান্য কাজ (উললেখ করুন) ক)........................ খ)........................ গ)........................	১। মৎস্যপোনা ঃ ক) মৎস্য পোনা উৎপাদন খ) মৎস্য পোনা বিতরণ ২। পুকুর/দিঘী খনন : ক) পুকুর/দিঘী খনন খ) পুকুর দিঘী পুনঃ খনন ৩। মৎস্য চাষ ঃ ক) পুকুর খ) দিঘী গ) অন্যান্য জলাধার (উল্লেখ করুন) ৪। ঋণ ঃ ক) বিতরণ খ) রিকভারী গ) কু-ঋণ ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ৫। মৎস্য প্রকল্প পরিদর্শন ৬। পরিদর্শন প্রতিবেদন : ক) প্রতিবেদন প্রণয়ন খ) সুপারিশ বাস্তবায়ন গ) পেন্ডিং সুপারিশ ৭। যুবকদের প্রশিক্ষণ : ক) কোর্স খ) প্রশিক্ষণার্থী ৮। মৎস্য চাষী/কৃষকদের প্রশিক্ষণ : ক) কোর্স খ) প্রশিক্ষণার্থী	১। পশু/ হাঁস মুরগীর চিকিৎসা : ক) হাঁস খ) মুরগী গ) গরু ঘ) ছাগল ঙ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ২। উন্নত জাতের পশু/হাঁস মুরগী বিতরণ : ক) হাঁস খ) মুরগী গ) গরু ঘ) ছাগল ঙ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ৩। পোলট্রি খামার : ক) নির্মাণ খ) সংস্কার গ) নির্মাণে উপদেশনা ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ৪। সংক্রামক ব্যাধি টিকা দান ঃ ক) হাঁস খ) মুরগী গ) গরু ঘ) ছাগল ঙ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ৫। ভেটেনারী এইড সেন্টার স্থাপন ৬। মাঠ পরিদর্শন ৭। পরিদর্শন প্রতিবেদন ঃ ক) প্রতিবেদন প্রণয়ন খ) সুপারিশ বাস্তবায়ন গ) পেন্ডিং সুপারিশ ৮। যুবকদের প্রশিক্ষণ : ক) কোর্স খ) প্রশিক্ষণার্থী

কৃষি কার্যক্রম	মৎস্য কার্যক্রম	পশু পালন ও পশু চিকিৎসা কার্যক্রম
	৯। মৎস্য রোগ ঃ ক) ঔষধ বিতরণ খ) পরামর্শ প্রদান **১০। মৎস্য আইন অমান্যকারী উদ্ঘাটন** **১১। মাঠ/পুকুর পরিদর্শন** ১২। অন্যান্য কাজ (উল্লেখ করুন) ক)...................... খ)...................... গ)......................	**৯। কর্মীদের প্রশিক্ষণ :** ক) কোর্স খ) প্রশিক্ষণার্থী **১০। কৃষকদের প্রশিক্ষণ ঃ** ক) কোর্স খ) প্রশিক্ষণার্থী ১১। অন্যান্য কাজ (উল্লেখ করুন) ক)...................... খ)...................... গ)......................

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম	পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম	সমবায় কার্যক্রম
১। রোগীর চিকিৎসা ঃ ক) ইনডোর খ) আউট ডোর গ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) **২। অপারেশন ঃ** ক) বন্ধ্যাত্বকরণ খ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) **৩। পরিবার পরিকল্পনা সামগ্রী বিতরণ ঃ** ক) পিল খ) কন্ট্রাসেপটিভ গ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) **৪। স্বাস্থ্য কর্মীদের প্রশিক্ষণ ঃ** ক) কোর্স খ) প্রশিক্ষণার্থ **৫। পরিবার পরিকল্পনা সম্পর্কে জনগণকে কাউন্সেলিং/ পরামর্শদান/ উদ্বুদ্ধকরণ কর্মসূচী** **৬। হাঁসপাতালে জন্ম মৃত্যু ঃ** ক) জন্ম খ) মৃত্যু গ) অবমুক্ত **৭। মাঠ পরিদর্শন** **৮। পরিদর্শন প্রতিবেদন** ক) প্রতিবেদন প্রণয়ন খ) সুপারিশমালা বাস্তবায়ন গ) পেণ্ডিং সুপারিশমালা	**১। সমিতি গঠন/রেজিষ্ট্রিকরণ ঃ** ক) ইউ সি সি এ খ) কে এস এস গ) বি ম স ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) **২। সমিতির সদস্য ঃ** ক) ইউ সি সি এ খ) কে এস এস গ) বি ম স ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) **৩। সমিতি বিলোপ সাধন ঃ** ক) ইউ সি সি এ খ) কে এস এস গ) বি ম স ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) **৪। ঋণ ঃ** ক) বিতরণ খ) রিকভারী গ) কুঋণ ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) **৫। মামলা ঃ** ক) নিস্পত্তিকৃত খ) পেণ্ডিং গ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) **৬। সমিতির সভা/বৈঠক আহ্বান ঃ** ক) ইউ সি সি এ খ) কে এস এস গ) বি ম স ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন)	**১। সমবায় গঠন ঃ** ক) রেজিষ্ট্রিকরণ খ) সদস্য **২। সমবায় বিলোপ সাধন** **৩। মামলা বিরোধ ঃ** ক) নিস্পত্তিকরণ খ) পেণ্ডিং গ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) **৪। ঋণ** ক) বিতরণ খ) রিকভারী গ)কু-ঋণ ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) **৫। সমবায় চাষীদের মধ্যে দলগত আলোচনার ব্যবস্থা গ্রহণ** **৬। সমবায় পরিদর্শন/তদারকী** **৭। পরিদর্শন প্রতিবেদন ঃ** ক) প্রতিবেদন প্রণয়ন খ) সুপারিশ বাস্তবায়ন গ) পেণ্ডিং সুপারিশ **৮। সমবায়ী নিরীক্ষণ** **৯। সমবায়ীদের কাউন্সেলিং / উপদেশনা/ উদ্বুদ্ধকরণ** **১০। কর্মীদের প্রশিক্ষণ ঃ** ক) কোর্স খ) প্রশিক্ষণার্থী **১১। কৃষকদের প্রশিক্ষণ** ক) কোর্স খ) প্রশিক্ষণার্থী

স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কার্যক্রম	পল্লী উন্নয়ন কার্যক্রম	সমবায় কার্যক্রম
৯। মাঠ কর্মীদের সাথে বৈঠক ১০। প্রাথমিক স্বাস্থ্য শিক্ষাকার্যক্রম গ্রহণ ও বাস্তবায়ন ১১। বিশুদ্ধ পানীয় সম্প্রসারণ ১২। পয়ঃপ্রণালী সম্প্রসারণ ১৩। পুষ্টি উন্নয়ন ঃ ক) কর্মসূচী গ্রহণ খ) কর্মসূচী বাস্তবায়ন ১৪। সংক্রামক রোগ নিয়ন্ত্রণ ঃ ক) কর্মসূচী গ্রহণ খ) কর্মসূচী বাস্তবায়ন ১৫। অন্যান্য কাজ (উল্লেখ করুন) ক)............... খ)................ গ)...............	৭। সমিতি পরিদর্শন ৮। পরিদর্শন প্রতিবেদন ঃ ক) প্রতিবেদন প্রণয়ন খ) বাস্তবায়িত সুপারিশ গ) পেন্ডিং সুপারিশমালা ৯। কাউন্সেলিং/উপদেশনা ১০। উন্নত পদ্ধতির উদ্ভাবন ১১। সমিতি কর্মকর্তা/কর্মচারী/ কর্মীদের প্রশিক্ষণ ঃ ক) কোর্স খ) প্রশিক্ষণার্থী ১২। আদর্শ কৃষকদের প্রশিক্ষণ ক) কোর্স খ) প্রশিক্ষণার্থী ১৩। সমিতি নিরীক্ষণ ১৪। সমবায় সমিতির কার্যকলাপ তদন্তকরণ ১৫। সমবায়ীদের মধ্যে দলগত আলোচনা অনুষ্ঠান ১৬। অন্যান্য কাজ (উল্লেখ করুন) ক)......................... খ).......................... গ)..........................	১২। অন্যান্য কাজ (উল্লেখ করুন) ক)....................... খ)........................ গ)........................

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

শিক্ষা কার্যক্রম	সমাজ কল্যাণ কার্যক্রম
১। স্কুল প্রতিষ্ঠা ২। স্কুল সংস্কার ৩। স্কুল পরিদর্শন/তদারকী ৪। পরিদর্শন প্রতিবেদন ঃ ক) প্রতিবেদন প্রণয়ন খ) সুপারিশ বাস্তবায়ন গ) পেণ্ডিং সুপারিশ ৫। শিক্ষক নিয়োগ ৬। শিক্ষক বদলী ৭। স্কুলের জন্য উন্নয়নমূলক কার্যক্রম (কার্যক্রমের নাম উল্লেখ করুন) ক)..................................... খ)..................................... গ)..................................... ৮। স্কুলের জন্য আর্থিক সহায়তা মঞ্জুরী ৯। স্কুল ছাত্র/ছাত্রীদের ড্রপ-আউট ১০। আচরণ ও শৃংখলামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ ঃ ক) শিক্ষক খ) ছাত্র-ছাত্রী গ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ১১। অন্যান্য কাজ (উল্লেখ করুন) ক) .... খ)......................... গ).........................	১। অবহেলিতদের জন্য দক্ষতা ও উন্নয়নমূলক প্রশিক্ষণ কোর্স ঃ ক) যুবক খ) মহিলা গ) শিশু ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ২। প্রশিক্ষণ প্রাপ্ত প্রশিক্ষণার্থীর সংখ্যা ঃ ক) যুবক খ) মহিলা গ) শিশু ঘ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ৩। অবহেলিতদের জন্য উপার্জনশীল কার্যক্রম গ্রহণ ঃ ক) যুবক খ) মহিলা গ) অন্যান্য (উল্লেখ করুন) ৪। অবহেলিতদের জন্য উপার্জনশীল কার্যক্রম বিবরণ (উল্লেখ করুন) ক).................................... খ).................................... গ).................................... ৫। সমাজ সেবামূলক সংগঠনের রেজিষ্ট্রিকরণ ৬। সমাজসেবামূলক সংগঠনের বিলোপ সাধন ৭। কমিউনিটি কার্যক্রম (উল্লেখ করুন) ক)............................ খ)............................ গ)............................ ৮। সেবামূলক সংগঠন / কার্যক্রম/ তদারক/ পরিদর্শন ৯। পরিদর্শন প্রতিবেদন ঃ ক) প্রতিবেদন প্রণয়ন খ) সুপারিশ বাস্তবায়ন গ) পেণ্ডিং সুপারিশ ১০। অন্যান্য কাজ (উল্লেখ করুন) ক)........................ খ)........................ গ)........................

বাংলাদেশের বাণিজ্য কাঠামো ও বাণিজ্যনীতি ঃ সামগ্রিক পর্যালোচনা

—এস, এম, আলী আব্বাস

বাংলাদেশের বাণিজ্যনীতির সফলতা বা বিফলতা দেশের সামগ্রিক অর্থনীতির গতিপ্রকৃতি তথা অর্থনীতির ভবিষ্যতের উপর গভীর প্রভাব রাখে। দেশের দ্রুত স্ফীতমান বাণিজ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে যখন বিভিন্ন আন্তর্জাতিক সংস্থার পক্ষ থেকে পুনঃ পুনঃ কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের পরামর্শ সোচ্চার হচ্ছে তখন বাংলাদেশের ব্যবসা-বাণিজ্যের ভিতরের অবস্থা খতিয়ে দেখার এবং অনুসৃত নীতির ফলাফল কাঙ্খিত উদ্দেশ্যের অনুবর্তী কতটা হচ্ছে তা পরীক্ষা করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

প্রথমেই একথা বলে রাখা দরকার যে, অর্থনীতির কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসের যে পরামর্শ বাংলাদেশ পেয়ে আসছে সেটাকে দেখার ভিন্ন ভিন্ন দৃষ্টিকোন থাকলেও একটা ব্যাপারে মতানৈক্যের অবকাশ থাকা উচিত নয়, তাহলো ''দক্ষতার'' প্রশ্ন। দক্ষতা বলতে এক্ষেত্রে যা বুঝা হয় তাহলো, ''আমদানি-রপ্তানি ফাঁক'' কমিয়ে আনার প্রক্রিয়ায় প্রাপ্ত বৈদেশিক সাহায্যের সদ্ব্যবহার এবং আমদানি ও রপ্তানির কাঠামোগত পরিবর্তন সাধন যাতে দেশ পর্যায়ক্রমে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমাতে পারে এবং রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা ব্যাপকতর করার মাধ্যমে আন্তর্জাতিক বাজারে চাহিদা ও পণ্য মূল্যের হ্রাস-বৃদ্ধিজনিত ঝুঁকি কমানো এবং আমদানি কাঠামো পরিবর্তনের মাধ্যমে অতি প্রয়োজনীয় পণ্যের সরবরাহ নিশ্চিতকরণ এবং শিল্পসহ অন্যান্য খাতের উৎপাদন উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করা সম্ভব হয়। তাই বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতি আলোচনায় ''দক্ষতা''র প্রশ্নটিকে অবশ্যই একটা প্রেক্ষিত হিসেবে গুরুত্ব সহকারে সামনে আনা দরকার। যা হোক, প্রথম অধ্যায়ে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির গতি প্রকৃতি আলোচনা করা হবে। দ্বিতীয় অধ্যায়ে রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্যের অবস্থা ও কাঠামো নিয়ে আলোচনা করা হবে। সেইসংগে অতীতে অনুসৃত নীতির সংগে তার প্রাসঙ্গিকতা নিয়ে আলোচনা থাকবে। সর্বশেষে দক্ষতা বিবেচনায় গত এক দশকে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অগ্রগতির প্রতি দৃষ্টিপাত করতে প্রয়াস নেয়া হবে।

১. *বাণিজ্য ঘাটতি*

১.১ গত নয় বছরে বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি দ্বিগুণ হয়েছে। অর্থাৎ ১৯৮০-৮১ সালে যখন এ বাণিজ্য ঘাটতি ২৯৭৯·১ কোটি টাকা ছিল ১৯৮৮-৮৯ তে তা বেড়ে ৬২৭০ কোটি টাকা হয়েছে (সারণী-১ দ্রষ্টব্য)।

সারণী–১

রপ্তানি, আমদানি ও বাণিজ্য ঘাটতি

বছর	রপ্তানি	আমদানি	ঘাটতি	ঘাটতির হার (%)
১৯৭৯–৮০	১১২৪·২	৩৬৭৬·০	–২৫৫১·৮	
১৯৮০–৮১	১১৫৯·৯	৪১৩৯·০	–২৯৭৯·১	১৬·৭
১৯৮১–৮২	১২৫৫·৫	৫১৫৫·০	–৩৮৯৯·৫	৩৭·০
১৯৮২–৮৩	১৬১৬·৩	৫৪৮৮·৯	–৩৮৭২·৭	–০০·০১
১৯৮৩–৮৪	১৯৯০·২	৫৮৬৯·৩	–৩৮৭৯·১	০০·২
১৯৮৪–৮৫	২৪১৫·৫	৬৮৭৭·০	–৪৪৬১·৫	১৫·০
১৯৮৫–৮৬	২৪৩১·৪	৭০৬৫·০	–৪৬৩৩·৬	৩·৯
১৯৮৬–৮৭	৩২৬৩·২	৮০২৬·১	–৪৭৬২·৯	২·৬
১৯৮৭–৮৮	৩৮০৮·১	৯২১৯·০	–৫৪১০·৯	১৩·৬
১৯৮৮–৮৯	৪০৫০·০	১০৩২০·০	–৬২৭০·০	১৫·৯

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও পরিকল্পনা কমিশন। বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ, ১৯৮৮–৮৯ থেকে গৃহীত।

একই সময়ে রপ্তানি বেড়েছে প্রায় সাড়ে তিনগুণের কাছাকাছি। ১৯৮০–৮১ সালে রপ্তানি আয় ছিল ১১৬০ কোটি টাকা। ১৯৮৮–৮৯ সালে তা বেড়ে হয়েছে ৪০৫০ কোটি টাকার মত (প্রাক্কলিত)। অপরপক্ষে একই সময়ের আমদানি ৪১৩৯ কোটি টাকা থেকে বেড়ে ১০৩২০ কোটি টাকা হবে। সামগ্রিক বিশ্লেষণে দেখা যায় বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি মোট হিসেবে বাড়লেও আপেক্ষিক অর্থে কমছে। এটা একটা শুভ লক্ষণ। বিষয়টার একটু ব্যাখা প্রয়োজন।

একটা অর্থনীতির অর্থনৈতিক সুকৃতি মাপার অন্যতম মাপকাঠি হলো ঐ দেশ তার আমদানি ব্যয়ের কত অংশ তার রপ্তানি আয় দিয়ে পূরণ করতে পারছে। যদি কোন দেশ তার আমদানি ব্যয়ের পুরোটাই রপ্তানি আয় দ্বারা মিটাতে পারে তাহলে ঐ দেশকে ভারসাম্যপূর্ণ অর্থনীতির দেশ বলা যায়। সে বিবেচনায় বাংলাদেশ তার বহির্বাণিজ্যে তেমন ভাল ফল দেখাতে পারছে না। তবে অবস্থার আপেক্ষিক উন্নতি ঘটেছে এই অর্থে যে ১৯৭৯–৮০ সালে বাংলাদেশ যেখানে তার আমদানি ব্যয়ের শতকরা ৩১ ভাগ তার রপ্তানি আয় থকে মিটাতে পারতো ১৯৮৮–৮৯ অর্থ বছরে ঐ হার ৩৯ ভাগ–এ উন্নীত হয়েছে। অর্থাৎ গড়ে প্রতিবছর ১% হারে বৈদেশিক বাণিজ্যের ক্ষেত্রে আপেক্ষিক উন্নতি হচ্ছে (সারণী–২ দ্রষ্টব্য)। তবে এই উন্নতির উল্লেখযোগ্যতা নিয়ে প্রশ্ন আছে। প্রশ্নটা এ কারণে যে, বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি বরাবরই তার রপ্তানি আয়ের চাইতে বেশী। ১৯৭৯–৮০ সালে দ্বিগুণেরও বেশী ছিল। ১৯৮৭–৮৮ সালে তা দ্বিগুণের নীচে অবস্থান করছিল। তাই

বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ যখন তার রপ্তানি আয়ের নিজস্ব পরিসীমা অতিক্রম করে প্রায় দ্বিগুনের কাছাকাছি তখনও বাৎসরিক মাত্র ১% হারের এর আপেক্ষিক উন্নতি তেমন কোন গুরুত্ব বহণ করে না। বাণিজ্য ঘাটতি জনিত সমস্যার মৌলিক কোন উন্নতি সাধন করতে হলে প্রথমেই যে পদক্ষেপ নেয়া দরকার তা হলো বাণিজ্য ঘাটতির প্রবৃদ্ধির হার ঠেকানো অর্থাৎ সিদ্ধান্ত নেয়ার বছরে কমপক্ষে বাণিজ্য ঘাটতি পূর্বের তুলনায় না বাড়ানো এবং পরবর্তী বছরগুলোতে একটা গ্রহণযোগ্য হারে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনতে আনতে শূন্যের কাছাকাছি নিয়ে আসা।

বাণিজ্য ঘাটতি প্রবৃদ্ধির হার শূন্যের কোটায় রাখার একটা তুলনামূলকভাবে সার্থক প্রচেষ্টা ছিল ১৯৮২-৮৩ ও ১৯৮৩-৮৪ অর্থ বছরে। ১৯৮৪-৮৫ তে হঠাৎ করে এ হার ১৫% হলেও পরবর্তী দু'বছরে তিন বা চার ভাগের মধ্যে সীমিত ছিল। কিন্তু বিস্ময়ের ব্যাপার যে, গত দু'বছরে (১৯৮৭-৮৮ ও ১৯৮৮-৮৯) বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধির হার আবার বৃদ্ধি পেয়ে যথাক্রমে ১৩·৬% ও ১৫·৯% এ দাড়ায়।

সারণী-২

বাংলাদেশের আমদানি মূল্য পরিশোধ ক্ষমতা

বছর	রপ্তানি (১)	আমদানি (২)	আমদানি-রপ্তানি অনুপাত (৩)=(২)÷(১)	রপ্তানি-আমদানি অনুপাত (৪)=(১)÷(২)×১০০
১৯৭৯-৮০	১১২৪·২	৩৬৭৬·০	৩·৩	৩১
১৯৮০-৮১	১১৫৯·৯	৪১৩৯·০	৩·৬	২৮
১৯৮১-৮২	১২৫৫·৫	৫১৫৫·০	৪·১	২৪
১৯৮২-৮৩	১৬১৬·৩	৫৪৮৮·৯	৩·৪	২৯
১৯৮৩-৮৪	১৯৯০·২	৫৮৬৯·৩	২·৯	৩৪
১৯৮৪-৮৫	২৪১৫·৫	৬৮৭৭·০	২·৮	৩৫
১৯৮৫-৮৬	২৪৩১·৪	৭০৬৫·০	২·৯	৩৪
১৯৮৬-৮৭	৩২৬৩·২	৮০২৬·১	২·৫	৪১
১৯৮৭-৮৮	৩৮০৮·১	৯২১৯·০	২·৪	৪১
১৯৮৮-৮৯	৪০৫০·০	১০৩২০·০	২·৫	৩৯

উৎস : রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো ও পরিকল্পনা কমিশন পরিবেশিত এবং বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৮-৮৯ তে উদ্ধৃত উপাত্তের পরিবর্ধিত রূপ

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

তাই বাণিজ্য ঘাটতি নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে ইতোপূর্বে যে খানিকটা নিয়ন্ত্রণ বা প্রচেষ্টা ছিল গত দু'বছরে তাও যেন অপসারিত হয়েছে। অবশ্য গত দু'বছরের বাণিজ্য ঘটতির চরম স্ফীতির অন্যতম কারণ এই যে, উক্ত সময়ে দেশের খরা ও বন্যা জনিত খাদ্য ঘাটতির কারণে বর্ধিত পরিমাণে খাদ্য আমদানি করতে হয়।

২. বাংলাদেশের রপ্তানি ও আমদানি বাণিজ্য

২.১ *রপ্তানি বাণিজ্য*

গত দশ বছরে রপ্তানি আয় প্রকৃত অর্থে গড়ে শতকরা ৭·৩ ভাগ হারে বেড়েছে। (সারণী–৩)। আমদানির ক্ষেত্রে এ বৃদ্ধি হার ছিল শতকরা ১·৪ ভাগ (সারণী–৪), রপ্তানি বৃদ্ধির গড় হার ৭·৩ ভাগ হলেও ১৯৮০–৮১ সালে রপ্তানি প্রবৃদ্ধির হার ধনাত্মক ছিল। ১৯৮২–৮৩–তে তা ২২% ছিল। ১৯৮৩–৮৪ ও ১৯৮৪–৮৫ সালে এ প্রবৃদ্ধি হার কমে গড়ে দাড়ায় ৫% এ। অবশ্য এর পরবর্তী বছরে আবার রপ্তানি বৃদ্ধি হার ঋণাত্মক হয়। ১৯৮৬–৮৭ ও ১৯৮৭–৮৮ অর্থ বছরে এ হার ছিল যথাক্রমে ১৯·৬ ভাগ ও ৬·১ ভাগ। রপ্তানি বাণিজ্যের প্রবৃদ্ধি হারের উত্থান–পতনের তিনটি কারণ উল্লেখ করা যেতে পারে। এক, দ্বিতীয় তেল অস্ত্র প্রয়োগোত্তর উন্নত বিশ্বের মন্দা কাটিয়ে উঠা এবং ব্যবসা বাণিজ্য পরিস্থিতির পুনরুদ্ধার ; দুই, তৃতীয় বিশ্বের প্রাথমিক পণ্যের মূল্যের হ্রাস–বৃদ্ধি ; তিন, বাংলাদেশের ক্ষেত্রে কয়েকটি অপ্রচলিত পণ্যের (হিমায়িত খাদ্য, পোশাক শিল্প) হঠাৎ প্রসার।

রপ্তানি বাণিজ্যের সার্বিক অগ্রগতি আশাব্যঞ্জক হলেও কয়েকটি প্রচলিত পণ্যের (যেমন পাট, পাটজাত দ্রব্য ও চা) রপ্তানি আয় ১৯৮৪–৮৫–র পর থেকে বেশ কমে গেছে (সারণী–৫)। এর অন্যতম প্রধান কারণ হলো এসব পণ্যের দাম গত তিন বছরে দ্রুত পড়ে গেছে (সারণী–৬)। তবে সন্তোষের ব্যাপার এই যে, ১৯৮৪–৮৫ থেকে প্রধান প্রধান দাম কমা সত্ত্বেও বাংলাদেশের সামগ্রিক রপ্তানি আয় বেশ উল্লেখযোগ্য হারে বেড়েছে। কাঁচা পাট, পাটজাত দ্রব্য ও চায়ের মূল্যের উত্থান–পতন হলেও চামড়া এবং হিমায়িত খাদ্যের দাম ও রপ্তানি আয় উভয়েই গত দশ বছরে উত্তরোত্তর বেড়েছে (সারণী–৬ দ্রষ্টব্য)। এতে আন্তর্জাতিক বাজারে এ দু'টো পণ্যের এখন উত্তরোত্তর চাহিদা যে বেড়েছে তা প্রতিয়মান হয়।

সারণী–৩
বাংলাদেশের রপ্তানি পরিস্থিতি

	রপ্তানি, বর্তমান মূল্যে	জাতীয় আয় ডিফ্লেটর	মূল্য পরিশীলিত রপ্তানি (প্রকৃত রপ্তানি)	রপ্তানি প্রবৃদ্ধি	গড় রপ্তানি হার ১৯৮০–৮৮
১৯৮০–৮১	১১৫৯·৯	১·০০০০	১১৫৯·৯		
১৯৮১–৮২	১২৫৫·৫	১·১২৭৫	১১১৩·৫	–৪·০	
১৯৮২–৮৩	১৬১৬·৩	১·১৪৩৭	১৩৬৫·৫	২২·৬	
১৯৮৩–৮৪	১৯৯০·২	১·৩৭৭৮	১৪৪৪·৫	৫·৮	
১৯৮৪–৮৫	২০১৫·৫	১·৫৮২৯	১৫২৬·০	৫·৬	৭·৩
১৯৮৫–৮৬	২৪৩১·৪	১·৬৭৫২	১৪৫১·৪	–৪·৯	
১৯৮৬–৮৭	৩২৬৩·২	১·৮৮০০	১৭৩৫·৭	১৯·৬	
১৯৮৭–৮৮	৩৮০৮·১	২·০৬৭৮	১৮৪১·৬	৬·১	
১৯৮৮–৮৯	৪০৫০·০				

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৮–৮৯ পরিবেশিত উপাত্তের ভিত্তিতে

সারণী – ৪
বাংলাদেশের আমদানি পরিস্থিতি

	আমদানি, বর্তমান মূল্যে	জাতীয় আয় ডিফ্লেটর	মূল্য পরিশীলিত আমদানি (প্রকৃত আমদানি)	আমদানি প্রবৃদ্ধি	গড় আমদানি হার ১৯৮০–৮৮
১৯৮০–৮১	৪১৩৯·০	১·০০০০	৪১৩৯·০		
১৯৮১–৮২	৫১৫৫·০	১·১২৭৫	৪৫৭২·১	১০·৫	
১৯৮২–৮৩	৫৪৮৮·৯	১·১৮৩৭	৪৬৩৭·১	১·৪	
১৯৮৩–৮৪	৫৮৬৯·৩	১·৩৭৭৮	৪২৫৯·৯	–৮·৫	
১৯৮৪–৮৫	৬৮৭৭·০	১·৫৮২৯	৪৩৪৪·৬	২·৪	১·৪
১৯৮৫–৮৬	৭০৬৫·০	১·৬৭৫২	৪২১৭·৪	–২·৯	
১৯৮৬–৮৭	৮০২৬·১	১·৮৮০০	৪২৬৯·২	১·২	
১৯৮৭–৮৮	৯২১৯·০	২·০৬৭৮	৪৪৫৮·৪	৫·৯	
১৯৮৮–৮৯	১০৩২০·০				

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮৮–৮৯ পরিবেশিত উপাত্তের ভিত্তিতে

সারণী–৫

বাংলাদেশের প্রধান প্রধান রপ্তানি পণ্য

(কোটি টাকায়)

বছর	পাটজাত দ্রব্য	কাঁচা পাট	চা	চামড়া	হিমায়িত খাদ্য	পোশাক	অন্যান্য	মোট
১৯৭৯–৮০	৬০৬.৭	২২২.১	৫১.০	১০১.৫	৫৭.৩	১.০	৮৪.৬	১১২৪.২
১৯৮০–৮১	৫৯৯.০	১৯৪.৩	৬৬.৫	৯২.৬	৬৫.৩	৫.৩	১৩৭.০	১১৫৯.৯
১৯৮১–৮২	৫৮৪.০	২০৩.৮	৭৬.০	১২৬.৪	১০৫.৮	১৪.৩	১৪৫.৪	১২৫৫.৫
১৯৮২–৮৩	৭৫২.৬	২৫৮.৫	১০৯.৬	১৩৭.৬	১৬৯.৬	২৫.৫	১৬২.৮	১৬১৬.৩
১৯৮৩–৮৪	৮৭৬.০	২৮৭.৬	১৬৯.১	২০৯.২	১৮৮.৯	৭৭.৫	১৮১.৮	১৯৯০.২
১৯৮৪–৮৫	১০০৭.৬	৩৮৯.৮	১৫৭.৭	১৮০.৪	২২৪.৫	৩০০.৪	১৫৫.০	২৪১৫.৫
১৯৮৫–৮৬	৮৭০.০	৩৬৭.৭	৯৭.৩	১৮০.২	৩৩৫.৯	৩৯০.২	১৯০.০	২৪৩১.৪
১৯৮৬–৮৭	৯১৬.৪	৩১৬.১	৯০.১	৪০৯.৭	৪০৭.৭	৯০৭.৭	২১৫.৫	৩২৬৩.২
১৯৮৭–৮৮	৯৩৫.৪	২৪৯.১	১২০.৫	৪৫৫.২	৪৩১.৯	১৩৪২.১	২৭২.৯	৩৮০৮.১
১৯৮৮–৮৯	৯৩০.০	২৯৫.০	১৪৩.০	৪২৯.০	৫১৮.০	১৩৮১.০	৩৫৪.০	৪০৫০.০

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো

সারণী–৬

রপ্তানি মূল্য সূচক

(ভিত্তি ঃ ১৯৭৬–৭৭ =১০০)

	১৯৮১–৮২	১৯৮২–৮৩	১৯৮৩–৮৪	১৯৮৪–৮৫	১৯৮৫–৮৬	১৯৮৬–৮৭	১৯৮৭–৮৮
সাধারণ	১৫১	১৭৩	২০৮	৩০১	২৫৭	২৩২	২৫৯
কাঁচা পাট	১৪২	১৪৯	১৭৭	৩২২	২৪২	২০১	২৩১
পাটজাত দ্রব্য	১৭৮	২১১	২৩৭	৩৩৪	২৯৬	২৭৩	২৮৯
চামড়া	৯৭	১০৫	১৪২	১৫৩	১৫৩	১৬৯	২৩৯
চা	১২০	১৭৭	২৭৬	৩৪৩	২৮৯	২২৪	২১৫
হিমায়িত খাদ্য	১৪৬	১৭৭	২০১	২১৮	২২৬	২৪২	২৮৬

উৎস ঃ বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো

তৈরী পোশাকের রপ্তানি আয় গত নয় বছরে অতি দ্রুতগতিতে বেড়েছে। ১৯৭৯–৮০ এর মাত্র এক কোটি টাকা থেকে এর আয় বেড়ে ১৯৮৪–৮৫ তে তিনশত কোটি এবং গত বছরে (১৯৮৭-৮৮সালে) ১২৯৬ কোটি টাকা হয়েছে। এ থেকে বোঝা যায়, বাংলাদেশের রপ্তানি কাঠামোর বেশ একটা পরিবর্তন ঘটেছে। তবে এ পরিবর্তন কতটা সন্তোষজনক এ ব্যাপারে প্রশ্ন থাকলেও পরিবর্তন যে হয়েছে তাতে কোন সন্দেহ নেই। এ পরিবর্তনের গুণগত মান অবশ্যই বিশ্লেষণ করে দেখার প্রয়োজন রয়েছে।

১৯৭৯–৮০ সালে ৮টি প্রধান রপ্তানি পণ্যসহ অন্যান্য পণ্যের কাঠামো নিম্নরূপ ছিল। পাটজাত দ্রব্য ৫৪%, কাঁচা পাট ২০%, চা ৫%, চামড়া ৯%, হিমায়িত খাদ্য ৫% ও অন্যান্য পণ্য ৮% (সারণী–৭)। এ বছরে তৈরী পোশাকের অস্তিত্ব রপ্তানি কাঠামোয় প্রায় অস্তিত্বহীন (০·১%)। গত নয় বছরে এ কাঠামোর ব্যাপক পরিবর্তন সাধিত হয়েছে। অর্থাৎ রপ্তানি আয়ে প্রচলিত পণ্যগুলোর বিশেষ করে কাঁচা পাট ও পাটজাত দ্রব্যের অবদান ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। চা এবং চামড়ার অবস্থানের তেমন একটা পরিবর্তন হয়নি। ১৯৮৭–৮৮ সালে রপ্তানি কাঠামোর নতুন রূপান্তরিত অবস্থা নিম্নরূপ ঃ পাটজাত দ্রব্য ২৪%, কাঁচা পাট ৮%, চা ৩%, চামড়া ১১%, হিমায়িত খাদ্য ১০%, তৈরী পোশাক ৩৫% এবং অন্যান্য ৮%। ১৯৭৯–৮০ এবং ১৯৮৭–৮৮ এর মধ্যে তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যায়, পাটজাত দ্রব্য ও কাঁচা পাটের অবদান যথাক্রমে ৫৪% ও ২০% থেকে হ্রাস পেয়ে ২৪% ও ৮% এ এসে দাঁড়িয়েছে। চায়ের অবদান ৫% থেকে হ্রাস পেয়ে ৩% হয়েছে। চামড়ার অবদান ১৯৭৯–৮০ এর ৯% থেকে ১৯৮৭–৮৮ তে ১১% এ উন্নীত হয়েছে। উক্ত সময়ে হিমায়িত খাদ্য ও তৈরী পোশাকের অবদান উল্লেখযোগ্যভাবে বেড়ে যথাক্রমে ৫% ও ০·১% থেকে বেড়ে ১০% ও ৩৫% হয়েছে। বাদ বাকী পণ্যসমূহের অবদান পরিবর্তিত না হয়ে ৮%–এই অবস্থান করছে। (চিত্র–১ দ্রষ্টব্য)

উপরোক্ত কাঠামোগত পরিবর্তন বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় প্রচলিত ৪টি পণ্যের (পাটজাত দ্রব্য, কাঁচা পাট, চা ও চামড়া) মধ্যে প্রথম তিনটির অবদান রপ্তানি আয় কাঠামোয় ব্যাপকভাবে হ্রাস পেয়েছে। আর এই হ্রাসের স্থানান্তর ঘটেছে তৈরী পোশাক ও হিমায়িত পণ্যের অবদানের ব্যাপক বৃদ্ধির মাধ্যমে। আরও সংক্ষেপে বলা যায় যে, প্রচলিত রপ্তানি পণ্য পাটজাত দ্রব্য, কাঁচা পাট ও চায়ের অবদান রপ্তানি কাঠামোতে যতটা কমেছে তার প্রায় পুরোটাই স্থানান্তর ঘটেছে তৈরী পোশাকের অবদান বৃদ্ধির মাধ্যমে।

সারণী–৭
বাংলাদেশের রপ্তানি কাঠামো

(শতকরা হারে)

	পাটজাত দ্রব্য	কাঁচা পাট	চা	চামড়া	হিমায়িত খাদ্য	তৈরী পোশাক	অন্যান্য	মোট
১৯৭৯–৮০	৫৪	২০	৫	৯	৫	০	৮	১০০
১৯৮০–৮১	৫২	১৭	৬	৮	৬	০	১২	১০০
১৯৮১–৮২	৪৭	১৬	৬	১০	৮	১	১২	১০০
১৯৮২–৮৩	৪৭	১৬	৭	৯	১০	২	১০	১০০
১৯৮৩–৮৪	৪৪	১৪	৮	১১	৯	৪	৯	১০০
১৯৮৪–৮৫	৪২	১৬	৭	৭	৯	১২	৬	১০০
১৯৮৫–৮৬	৩৬	১৫	৪	৭	১৪	১৬	৪	১০০
১৯৮৬–৮৭	২৮	১০	৩	১৩	১২	২৮	৭	১০০
১৯৮৭–৮৮	২৫	৭	৩	১২	১১	৩৫	৭	১০০
১৯৮৮–৮৯	২৩	৭	৪	১১	১৩	৩৪	৯	১০০

উৎস ঃ রপ্তানি উন্নয়ন ব্যুরো, রূপান্তরিত।

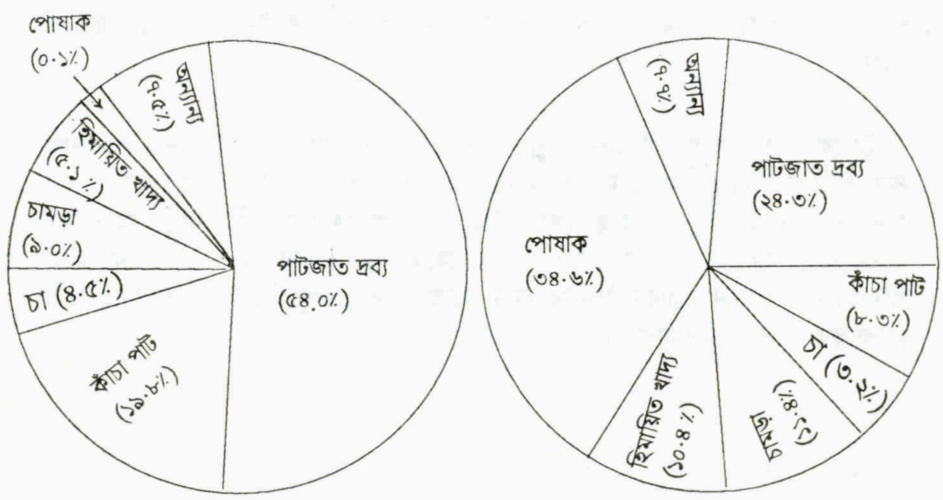

(ক) ১৯৭৯–৮০ (খ) ১৯৮৭–৮৮

চিত্র–১ ঃ বাংলাদেশের রপ্তানি কাঠামো

বাংলাদেশের রপ্তানি বাণিজ্যের কাঠামোগত পরিবর্তনের আর একটা বিশেষ দিক হলো সরকার ও রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্প খাতের রপ্তানি মোট রপ্তানির তুলনায় হ্রাস পেয়ে আসছে বর্ষ পরম্পরায়। অপরপক্ষে বেসরকারী খাত রপ্তানি বাণিজ্যের সিংহ ভাগ দখল করছে উত্তরোত্তর।

১৯৮২–৮৩ সালে সরকার মোট রপ্তানির ৫% রপ্তানি করেছে। অথচ ১৯৮৭–৮৮ সালে এ হার মাত্র ১%। রাষ্ট্রায়াত্ত শিল্পের রপ্তানি একই সময়ে ৪৩% থেকে ১০% এ নেমে এসেছে। অপরপক্ষে বেসরকারী খাত ১৯৮২–৮৩ সালে মোট রপ্তানি আয়ের যেখানে মাত্র ৫২% রপ্তানি করতো, ১৯৮৭–৮৮ সালের শেষভাগে এসে তা দাঁড়ায় ৮৯% এ। (সারণী–৮ দ্রষ্টব্য)।

সারণী—৮

প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে বাংলাদেশের রপ্তানি

(শতকরা হারে)

	১৯৮২–৮৩	১৯৮৩–৮৪	১৯৮৪–৮৫	১৯৮৫–৮৬	১৯৮৬–৮৭	১৯৮৭–৮৮
সরকার	৫	২	৩	১	১	১
রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প	৪৩	২৪	২৫	২০	১৩	১০
টি, সি, বি	০	০	০	০	০	০
বেসরকারী	৫২	৭৪	৭২	৭৮	৮৫	৮৯
অন্যান্য	০	০	০	০	০	০
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো প্রদত্ত উপাত্ত থেকে রূপান্তরিত।

এখন প্রশ্ন হতে পারে, রপ্তানি কাঠামোর রূপান্তর বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য সুখকর কিনা। প্রায়শঃই শোনা যায়, আমরা প্রচলিত পণ্যের উপর নির্ভরতা কমাতে পেরেছি। এটা সুখের বিষয়। কিন্তু একটু তলিয়ে দেখলেই বুঝা যাবে রপ্তানি বাণিজ্যে প্রচলিত পণ্যসমূহের উপর আমরা নির্ভরতা যতটা কমাতে পেরেছি তার প্রায় সমপরিমাণ নির্ভরতা স্থাপিত হয়েছে মাত্র কতিপয় দেশের কোটার উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠা ঝুঁকিপূর্ণ তৈরী পোশাক রপ্তানির উপর। বলা হয়, আমাদের অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের সংখ্যা এখন শতাধিক এবং এরূপ বলার মধ্যে আত্মতুষ্টির ভাব লক্ষ্য করা যায়। কিন্তু রূঢ় হলেও বাস্তব যে, রপ্তানি কাঠামোয় হিমায়িত খাদ্য ও তৈরী পোশাক ছাড়া অন্যান্য অপ্রচলিত পণ্যের অবদান সেই নয় বছরের আগের অবস্থায়ই রয়ে গেছে (৮%) (সারণী–৬)। এমতাবস্থায় রপ্তানি পণ্য থেকে আয় বহুমুখীকরণের মাধ্যমে ঝুঁকি কমানোর প্রচেষ্টা আরও জোরদার করার যথেষ্ট প্রয়োজন রয়েছে।

LIBRARY
... Administration
...
Savar, Dhaka

তৈরী পোশাক একটি বিকাশমুখী শিল্প নিঃসন্দেহে। এর নাটকীয় উত্থানে খুশী হওয়ার যথেষ্ট কারণ রয়েছে। এর অগ্রগতি অব্যাহতও রাখতে হবে। তবে ঝুঁকি কমানোর জন্য এ পণ্যটির আমদানিকারক দেশের সংখ্যা ব্যাপকভাবে বাড়াতে হবে এবং এভাবেই মুখ থুবড়ে পড়ার আশংকা থেকে রেহাই পাওয়া সম্ভব।

২.২ *আমদানি বাণিজ্য*

এ কথা ইতোপূর্বেই বলা হয়েছে যে, বাংলাদেশে রপ্তানি বৃদ্ধির হার আমদানি বৃদ্ধি হারের চাইতে বেশী। কিন্তু আমদানির পরিমাণ রপ্তানি আয়ের তিন গুণ বিধায় বাণিজ্য ঘাটতির পরিমাণ স্ফীত হচ্ছে প্রতিবারই। ফলে বর্ধিত রপ্তানি আয় চলতি লেনদেন হিসেবের উন্নয়নে ভূমিকা রাখতে পারছে না। ১৯৮০–৮১ অর্থ বছরে ৪১৩৯কোটি টাকার পণ্য আমদানি হয়। ঐ বছরের মূল্যে ১৯৮৭–৮৮ অর্থ বছরে আমদানি বেড়ে হয় ৪৪৫৮ কোটি টাকা। গড় প্রবৃদ্ধির হার ১·৪%। গত আট বছরের মধ্যে ১৯৮১–৮২ সালে আমদানি বৃদ্ধির হার পরিমাণগত দিক দিয়ে সর্বাধিক ছিল (১০·৫%)। পরবর্তী পাঁচ বছরে এই হার গড় পড়তা ২% এর কম ছিল। কিন্তু ১৯৮৭–৮৮ তে বাড়ে ৫·৯%।

বাংলাদেশের অবনতিশীল বাণিজ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে আমদানি প্রবৃদ্ধির এই হার দু'টি অবস্থা নির্দেশ করে। এক, রপ্তানি বৃদ্ধি হারের তুলনায় আমদানি বৃদ্ধি হারের এই মৃদুতা কেন? এটা কি পরিকল্পিত আমদানি নিয়ন্ত্রনের ফল অথবা আমদানির জন্য বৈদেশিক মুদ্রার অভাবজনিত কারণে। দুই, এটা দেশের অভ্যন্তরীণ উৎপাদন বিশেষ করে রপ্তানির জন্য উৎপাদনকে বাধাগ্রস্থ করছে কিনা? কারণ বাংলাদেশের উৎপাদন কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির উপর বহুলাংশে নির্ভরশীল। বিষয়টিকে একটু গভীরভাবে দেখতে হলে আমদানি কাঠামো পর্যালোচনা করে দেখতে হবে।

পর্যালোচনার সুবিধার্থে আমদানিকৃত সব পণ্যকে চার শ্রেণীতে বিভক্ত করা যায় ঃ ভোগ্যপণ্য, ভোগ্যপণ্য তৈরীর উপকরণ, মূলধনী যন্ত্রপাতি ও মূলধনী যন্ত্রপাতিতে ব্যবহারের জন্য উপকরণাদি (খুচরা যন্ত্রাংশসহ)। ১৯৮২–৮৩ অর্থ বছরে বাংলাদেশের আমদানি কাঠামোয় উপরোক্ত চার শ্রেণীর পণ্যের অবস্থান নিম্নরূপ ঃ ভোগ্যপণ্য ২৬·৩%, ভোগ্যপণ্য তৈরীর উপকরণ ৩৪·৬%, মূলধনী যন্ত্রপাতি ২৯·৩% এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি ব্যবহার উপকরণ ৯·৮% (সারণী–৯)। এ কাঠামোর একটা গুণগত পরিবর্তন এসেছে বর্ষ পরম্পরায়। ১৯৮৭–৮৮ সালে এ কাঠামোর পরিবর্তিত রূপ হলো নিম্নরূপ ঃ ভোগ্যপণ্য ৩৭·২%, ভোগ্যপণ্য তৈরী উপকরণ ৩৫%, মূলধনী যন্ত্রপাতি ১০·৬% এবং মূলধনী যন্ত্রপাতি ব্যবহার উপকরণ ১৭·২%। উপরোক্ত পরিসংখ্যান থেকে এটা স্পষ্ট বুঝা যায় যে, ভোগ্যপণ্যের অবস্থান গত ৫ বছরে প্রায় ১১% বৃদ্ধি পেয়ে ৩৭·২% –এ উন্নীত হয়েছে, ভোগ্যপণ্য তৈরীর উপকরণাদিও কিঞ্চিৎ বেড়েছে (০·৪%)। মূলধনী যন্ত্রপাতির অবস্থান আমদানি কাঠামোয় ২৯·৩% থেকে প্রায় ১৯ ভাগ কমে ১০·৬ –এ দাড়িয়েছে। কিন্তু অসঙ্গতিপূর্ণ মনে হলেও মূলধনী যন্ত্রপাতি ব্যবহার সামগ্রী অবদান উত্তরোত্তর বেড়ে ১৯৮৬–৮৭ সালে ২১·৫% উঠেছিল, সেটা কমে

১৯৮৭–৮৮ সালে ১৭·২% হয়েছে। উপরোক্ত কাঠামোগত পরিবর্তনের সারসংক্ষেপ করলে দাঁড়ায় এই যে, ভোগ্যপণ্য ও ভোগ্যপণ্য তৈরীর উপাদান এই দু'য়েরই হার আমদানি কাঠামোয় বেড়েছে। অপর দিকে মূলধন যন্ত্রপাতির আমদানির হার পড়ে এসেছে উত্তরোত্তর, কিন্তু মূলধনী যন্ত্রপাতির উপকরণাদির স্থান উন্নীত হয়েছে উল্লেখযোগ্য হারে।

এমতাবস্থায় এরূপ উপসংহার টানা কি সঙ্গত যে, আমদানি প্রক্রিয়ায় গত পাঁচ–ছয় বছরে বাংলাদেশের অর্থনীতিতে দেশজ উৎপাদন প্রক্রিয়া চাঙ্গা করার চাইতে ভোগ প্রবণতা শক্তিশালী হয়েছে? বিষয়টির বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনার জন্য আমদানি কাঠামোধীনে বর্ণিত বিভক্তিকরণ আরো সম্প্রসারিত করে অর্থনৈতিক শ্রেণীভিত্তিতে শ্রেণীকরণ করা যেতে পারে। এ উদ্দেশ্যে আমরা আমদানিকৃত সমুদয় পণ্যকে নিম্নোক্তভাবে ছয় শ্রেণীতে বিভক্ত করে নামকরণ করতে পারি ঃ

সারণী —৯

বাংলাদেশের আমদানি কাঠামো

(শতকরা হারে)

	১৯৮২–৮৩	১৯৮৩–৮৪	১৯৮৪–৮৫	১৯৮৫–৮৬	১৯৮৬–৮৭	১৯৮৭–৮৮
ভোগ্যপণ্য	২৬·৩	২৬·৮	৩২·৫	৩২·৮	৩২·৩	৩৭·২
ভোগ্যপণ্য তৈরীর উপকরণ	৩৪·৬	৩৬·৬	৩৮·৪	৩৬·১	৩২·৮	৩৫
মূলধনী যন্ত্রপাতি	২৯·৩	২৬·৬	১২·৫	১২·৩	১৩·৪	১০·৬
মূলধনী যন্ত্রপাতি উপকরণ	৯·৮	১০	১৬·৬	১৮·৮	২১·৫	১৭·২
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিবেশিত উপাও থেকে রূপান্তরিত।

(১) খাদ্য ও পানীয়, (২) শিল্পজাত সরবরাহ (সুতা, কাপড়, সার, সিমেন্ট), (৩) জ্বালানী ও লুব্রিকান্ট (৪) কলকব্জা ও মূলধন যন্ত্রপাতি (৫) পরিবহণ সরঞ্জামাদি এবং (৬) ভোগ্যপণ্য। (সারণী–১০ দ্রষ্টব্য)।

আলোচ্য সময়ে (১৯৮২–৮৩ থেকে ১৯৮৮–৮৯) খাদ্য ও পানীয় সংক্রান্ত আমদানির বেশ উত্থান–পতন হয়েছে, বিশেষতঃ খাদ্যশস্য আমদানির বেলায়। এটা আমদানি কাঠামোস্থ অন্যান্য পণ্য শ্রেণীর স্বাভাবিক বিবর্তন প্রভাবিত করে। এ অসুবিধাটি মেনে নেয়ার পর সার্বিক আমদানি কাঠামোর উপর নিম্নোক্ত মন্তব্য করা যায়। গত ছয় বছরের বিবর্তনে আমদানি কাঠামোয় খাদ্য ও পানীয়ের এবং বিশেষ করে শিল্পজাত দ্রব্য ও কাঁচামাল (সুতা, কাপড়, সিমেন্ট, সার)–এর প্রাধান্য বেড়েছে। ভোগ্যপণ্যের (কেবলমাত্র টেকসই, আধা–টেকসই ও অস্থায়ী প্রকৃতির) অবস্থান মোটামুটি স্থিতিশীল। যন্ত্রপাতি, জ্বালানী ও লুব্রিকান্ট এবং পরিবহণ সরঞ্জামাদির বিবর্তনের ধারা নিম্নমুখী।

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre

আমদানি কাঠামোর এরূপ বিবর্তনের কারণ বহুবিধ। খরা, দুর্যোগসহ বহুবিধ কারণে খাদ্যশস্যের আমদানি মাঝে মাঝে বেশ বেড়ে যায়। যার ফলে আমদানি কাঠামোয় খাদ্য ও পানীয়ের একটা অনিয়মিত উত্থান-পতন পরিলক্ষিত হয়। তবে সূতা, কাপড়সহ অন্যান্য শিল্পজাত দ্রব্য ও কাঁচামাল আমদানি, আমদানি কাঠামোয় ইদানিং প্রভাব বিস্তারের কারণ তৈরী পোশাক শিল্পের উপর থেকে কোটা প্রথা অপসারনোত্তর এর পুনঃ বিকাশ। মূলধনী যন্ত্রপাতির অবদান কিছুটা কমে যাওয়ার একটা ব্যাখ্যা এই হতে পারে যে, শুরুতে তৈরী পোশাক শিল্পের জন্য যে সব কলকব্জা ও যন্ত্রপাতি আনা হয়েছিল পরবর্তীকালে ঐগুলোর পূর্ণ কর্মক্ষমতা ব্যবহার জনিত কারণে পরবর্তীতে সরঞ্জাম ক্রয় কমে যায়। দ্বিতীয়তঃ ৮০-র দশকের শুরুর বছরগুলোতে কৃষিখাতে যেভাবে কৃষি যন্ত্রপাতি (পাম্প ইত্যাদি) সরবরাহ করা হয়েছিলো পরবর্তীতে তার হার কমে আসে। আমদানি কাঠামোয় মূলধনী যন্ত্রপাতি ব্যবহার উপকরণ (কাঁচামাল, খুচরা যন্ত্রাংশ ইত্যাদি)-এর অবদান উত্তরোত্তর বাড়ার কারণ লৌহ ও ইস্পাত, কাগজ ও কাগজ জাত দ্রব্য এবং রসায়ন শিল্পসহ অন্যান্য প্রধান প্রধান শিল্প পণ্যের উৎপাদন বৃদ্ধিতে এগুলো ব্যবহৃত হয়েছে। উল্লেখ্য, গত চার বছর থেকে এসব শিল্পজাত দ্রব্যের উৎপাদন বাংলাদেশে বৃদ্ধি পেয়ে আসছে।

সারণী -১০

বাংলাদেশের আমদানি কাঠামো (পরিবর্ধিত)

(শতকরা হারে)

	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮
খাদ্য ও পানীয়	২৩	২৩	২৯	২০	২৪	২৮
শিল্পজাত	৩০	৩৮	৩৬	৩৯	৩৮	৩৮
জ্বালানী ও লুব্রিকান্ট	২৩	২০	১৬	১৯	১৫	১৪
কলকব্জা ও মূলধনী যন্ত্রপাতি	১৫	১৩	১১	১৩	১৪	১২
পরিবহণ যন্ত্রাংশ	৭	৪	৫	৫	৬	৫
ভোগ্যপণ্য	২	৩	৩	৩	৩	৩
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ বৈদেশিক বাণিজ্য বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিবেশিত উপাত্তের রূপান্তরিত রূপ, ১৯৮৮-৮৯।

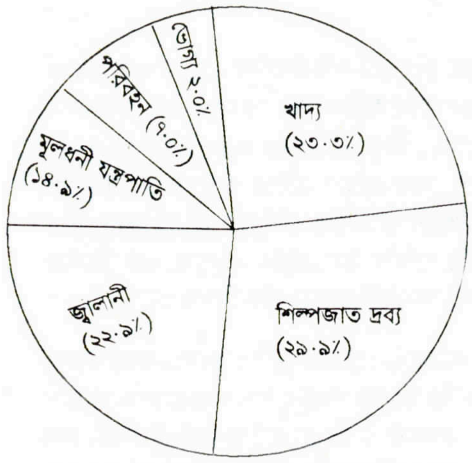

(গ) ১৯৭৯–৮০

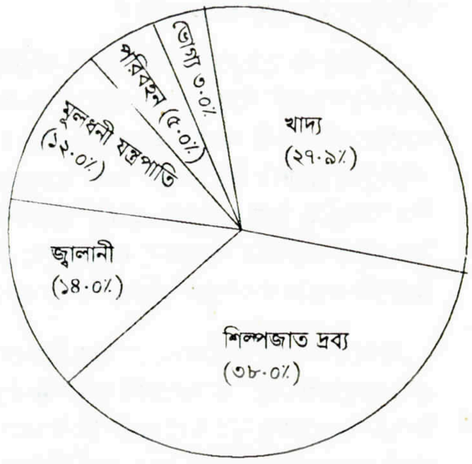

(ঘ) ১৯৮৭–৮৮

চিত্র–২ ঃ বাংলাদেশের আমদানি কাঠামো

রপ্তানি বাণিজ্যের ন্যায় আমদানি বাণিজ্যেও বেসরকারী খাত মূখ্য ভূমিকায় চলে আস্ছে ক্রমাগত। ১৯৮২–৮৩ সালে সরকার দেশের মোট আমদানির ৩৭% নিয়ন্ত্রন করতো। ১৯৮৭–৮৮ অর্থ বছরে এই হার ১৩ ভাগে নেমে এসেছে। রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্প প্রতিষ্ঠানের আমদানিও একই সময়ে ২৯% থেকে হ্রাস পেয়ে ৭% –এ এসে দাঁড়ায়। অপরদিকে বেসরকারী খাতের আমদানি ১৯৮২–৮৩ সালের ৩২% থেকে ১৯৮৭–৮৮ সালে মোট আমদানি ব্যয়ের ৭৯%–এ এসে দাঁড়িয়েছে। (সারণী–১১ দ্রষ্টব্য)।

সারণী–১১

প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তিতে আমদানি

(শতকরা হার)

	১৯৮২–৮৩	১৯৮৩–৮৪	১৯৮৪–৮৫	১৯৮৫–৮৬	১৯৮৬–৮৭	১৯৮৭–৮৮
সরকার	৩৭	২৬	৩৬	৯	১৪	১৩
জাতীয় শিল্প	২৯	২৫	১০	১৫	১৩	৭
টি, সি, বি	১	১	০	১	০	০
ব্যক্তিগত	৩২	৪৮	৫৩	৭৫	৭২	৭৯
অন্যান্য	০	০	০	০	০	০
মোট	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০	১০০

উৎস ঃ বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো পরিবেশিত উপাত্ত থেকে রূপান্তরিত, ১৯৮৮–৮৯।

বাণিজ্যের সামগ্রিক গতিপ্রকৃতি ঃ

এ পর্যন্ত বাংলাদেশের বাণিজ্য ঘাটতি পরিস্থিতি এবং আমদানি রপ্তানির ধারা ও কাঠামোগত পরিবর্তন সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে। আলোচনাকালে বাণিজ্য ঘাটতির প্রবৃদ্ধি হার, আমদানি রপ্তানির গতিপ্রকৃতি সম্বন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু এ ধরণের আলোচনায় কেবলমাত্র পরিস্থিতির আংশিক চিত্রই প্রকাশ পায়। বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের আরও একটা বিশেষ দিক উন্মোচিত হতে পারে যদি আমরা আমদানি–রপ্তানি ও বাণিজ্য ঘাটতিকে অভ্যন্তরীন জাতীয় উৎপাদনের প্রেক্ষিতে আলোচনা করি। অভ্যন্তরীন জাতীয় উৎপাদনের অনুপাত/হার হিসেবে আমদানি–রপ্তানি ও বাণিজ্য ঘাটতির বিবর্তন বাণিজ্য পরিস্থিতির নতুন দিক নির্দেশ করে।

অভ্যন্তরীন জাতীয় উৎপাদনের অংশ হিসেবে আমদানি–রপ্তানিকে দু'ভাবে দেখা যেতে পারে। এক, অভ্যন্তরীন জাতীয় উৎপাদনে আমদানি–রপ্তানির অবদান কতটুকু অর্থাৎ অভ্যন্তরীন জাতীয় উৎপাদনের শতকরা কত ভাগ আমদানি ও রপ্তানি দখল করে আছে। এটা স্বভাবতঃই একটা দেশ কতটা শিল্পোন্নয়নের পথে অগ্রসর তার নির্ণায়ক। পার্শ্ববর্তী অনেক দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অভ্যন্তরীন জাতীয় উৎপাদনে তার আমদানি–রপ্তানি অবদান খুবই সামান্য। ১৯৮৭–৮৮ সালে আমদানি ও রপ্তানির অবদান যথাক্রমে মোট অভ্যন্তরীন উৎপাদনের মাত্র ১৪·৯% ও ৬·৯% ছিল। পাকিস্তানে এ হার ১৮·৪% ও ১৩·২% এবং ভারতে ৮·৬% ও ৫·৭%। অবশ্য ভারত স্বয়ংসম্পূর্ণ অর্থনীতি বিকাশের পক্ষপাতি কিন্তু অন্যান্য দেশ বৈদেশিক বাজারের উপর অধিকতর নির্ভরশীল।

গত দশকে রপ্তানি জিডিপি অনুপাত যেমন হ্রাস পেয়েছে তেমনি হ্রাস পেয়েছে আমদানি জিডিপি অনুপাত। রপ্তানি ক্ষেত্রে ১৯৮০–৮১ অর্থ বছরে রপ্তানি জিডিপি অনুপাত ছিল ৬·৬%। গত ৮ বছরে তা কমে ১৯৮৭–৮৮ অর্থ বছরে হয়েছে ৬·১%। একই সময়ে আমদানি জিডিপি অনুপাত ২১·৯% থেকে কমে ১৪·৯% হয়েছে। (সারণী –১২ দ্রষ্টব্য)।

সারণী —১২

দক্ষিন এশিয়ার দেশগুলোতে বৈদেশিক বাণিজ্যের কাঠামোগত পরিবর্তন

	অনুপাত ১৯৮১		অনুপাত ১৯৮৭	
	রপ্তানি জিডিপি (%)	আমদানি জিডিপি (%)	রপ্তানি জিডিপি (%)	আমদানি জিডিপি (%)
বাংলাদেশ	৬·৬	২১·৮	৬·১	১৪·৯
ভারত	৫·৭	১০·৬	৫·৭	৮·৬
পাকিস্তান	১১·৪	২১·২	১৩·২	১৮·৪
শ্রীলংকা	২৫·১	৪৩·৮	২৩·১	৩৪·৫
ইন্দোনেশিয়া	২৬·২	১৫·৬	২৪·৭	২০·৭

উৎস ঃ *ওয়ার্ল্ড ডেভেলপমেন্ট রিপোর্ট* ১৯৮৩ ও ১৯৮৯–এর ভিত্তিতে রূপান্তরিত

উপরোক্ত বিশ্লেষণে এটা পরিস্কার যে, গত দশকে জিডিপি–তে অবদান বিচারে বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্য পরিস্থিতির কোন অনুকুল পরিবর্তন সাধিত হয় নাই, বরং জিডিপি–তে রপ্তানি ও আমদানি অবদানের হ্রাস দেশের উন্নয়ন বিচারে নিরুৎসাহ ব্যঞ্জক। তবে বাংলাদেশের ভারসাম্যহীন বাণিজ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে রপ্তানির তুলনায় আমদানির অবদান হ্রাস কিছুটা অর্থবহ। অন্ততঃ অর্থনীতির বৈদেশিক খাতের কাঠামোগত পুনর্বিন্যাসে। বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতির একটা বিশেষ দিক হলো রপ্তানির তুলনায় আমদানি প্রবৃদ্ধির হার কমিয়ে বাণিজ্য ঘাটতি কমিয়ে আনা, যাতে দেশের চলতি হিসেবের ঘাটতি পরিস্থিতির উন্নতি হয়। এ প্রচেষ্টায় বাংলাদেশ অনেকটাই সফল হয়েছে যা বাংলাদেশের চলতি হিসেবের ঘাটতি–জিডিপি অনুপাত থেকে বুঝা যায় (সারণী – ১৫ দ্রষ্টব্য)। উক্ত অনুপাত ১৯৮০–৮১ এর –১০.০% থেকে হ্রাস ১৯৮৭–৮৮ অর্থবছরে –৫.৭% হয়েছে।[১]

কিন্তু এই উন্নতি মূলতঃ রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হার জোরদার এবং আমদানি প্রবৃদ্ধি হার শ্লথতর করার মাধ্যমে সম্ভব হয়েছে তা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে। আমদানি প্রবৃদ্ধি হার হ্রাস পাওয়া সব সময়ই যে আকাঙ্খিত এমন নয়, বিশেষ করে তা যদি উৎপাদনের সাথে সংশ্লিষ্ট পণ্য আমদানির বেলায় হয়।

আমদানি কাঠামো বিশ্লেষণের সময় আমরা দেখেছি আমদানি কাঠামোয় ভোগ্যপণ্যের প্রভাব বেড়েছে। অপরপক্ষে মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির অংশ কমে গেছে। এটা অর্থনীতির ভবিষ্যতের জন্য সুখকর নয়।

সুতরাং বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতির ফলপ্রসূতা তখনই প্রমানিত হবে যদি বর্তমান বাণিজ্য ঘাটতির প্রেক্ষাপটে রপ্তানি বৃদ্ধির পাশাপাশি আমদানির প্রবৃদ্ধি হার শ্লথতর করা হয় এবং তা উৎপাদনের জন্য আবশ্যকীয় পণ্য আমদানি কমানোর মাধ্যমে নয় বরং ভোগ্যপণ্য আমদানি নিয়ন্ত্রণের মাধ্যমে। তাই এ প্রসঙ্গে সুপারিশ হলো ; এক, রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হার আরও ত্বরান্বিত করতে হবে এবং এ জন্য প্রয়োজনীয় সহায়তা দিতে হবে। সেটা কিভাবে সম্ভব এজন্য অবশ্য ভিন্ন একটা গবেষণা কর্ম হাতে নেয়ার প্রয়োজন পড়বে। দ্বিতীয়ত ঃ আমদানিকে অত্যন্ত ফলপ্রসূভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে ভোগ্য পণ্য আমদানির পরিমান কমানো যায় এবং আমদানি কাঠামোতে এর প্রভাব একটা যুক্তিসঙ্গত সময় পর্যন্ত কমানো যায়। তৃতীয়তঃ পাশাপাশি উৎপাদন সচল ও গতিশীল রাখার জন্য প্রয়োজনীয় কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানির উপর যাতে কোন চাপ না পড়ে সেদিকে নজর রাখা আমদানি নীতির অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হিসেবে গণ্য করতে হবে।

---

[১] বিশ্ব ব্যাংক ঃ বাংলাদেশ রিসেন্ট ইকনমিক ডেভেলপমেন্টস্ এণ্ড সর্ট টার্ম প্রস্পেক্ট্স, মার্চ ১৩,১৯৮৯।

বাণিজ্য কাঠামো ও বাণিজ্য নীতি

৮০–র দশকে বাংলাদেশের বাণিজ্য কাঠামোতে কি পরিবর্তন এসেছে? এ সময়ে অনুসৃত বাণিজ্য নীতির সাথে উক্ত পরিবর্তনের সাযুজ্য কি? এ প্রশ্নগুলোর আলোচনা এ পর্যায়ে যুক্তিসঙ্গত। এর আলোচনা প্রয়োজন। ১৯৮০–৮১ থেকে বাংলাদেশের বাণিজ্য কাঠামো দশকের শেষ পাদে নিম্নরূপ পরিগ্রহ করেছে ঃ

(ক) রপ্তানি কাঠামোতে প্রচলিত পণ্যের অবদান বিপুলভাবে হ্রাস পেয়েছে, পক্ষান্তরে পোশাক, হিমায়িত খাদ্যের ন্যায় অপ্রচলিত পণ্যের অবদান বেড়েছে। তবে পোশাক শিল্প রপ্তানির অগ্রগতির সিংহভাগই বিদেশী কাপড় আমদানি নির্ভর। (খ) রপ্তানি বাণিজ্যের কাঠামোগত পরিবর্তনের দ্বিতীয় দিক হলো রপ্তানিকারকদের শ্রেণীগত অবস্থানের পরিবর্তন। আগে সরকার ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পই বাংলাদেশের রপ্তানি সিংহভাগ নিয়ন্ত্রণ করতো, এখন সেটা করছে বেসরকারী খাত। (গ) বাংলাদেশের আমদানি কাঠামোতে ভোগ্যপণ্যের প্রাধান্য বেড়েছে আর মূলধনী যন্ত্রপাতির অবদান হ্রাস পেয়েছে। অবশ্য মূলধন যন্ত্রপাতি ব্যবহার উপকরণের আমদানি বেড়েছে। (ঘ) আমদানির বেলায়ও সরকার ও রাষ্ট্রায়ত্ত শিল্পের প্রাধান্য বিপুলভাবে হ্রাস পেয়ে বর্তমানে বেসরকারী খাতের ভূমিকা নেতৃস্থানীয় হয়েছে। (ঙ) আর একটা গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন হয়েছে আন্তর্জাতিক লেনদেনের চলতি হিসেবে, যেখানে বৈদেশিক বাণিজ্য গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। আমদানি বৃদ্ধির হার থেকে রপ্তানি বৃদ্ধির হার দ্রুততর হওয়ার কারণে বাণিজ্য ঘাটতি বৃদ্ধির হার শ্লথ হয়েছে। যার ফলে বাণিজ্য ঘাটতি জিডিপি অনুপাত দর্শনীয়ভাবে হ্রাস পেয়েছে। অন্যভাবে বলা যায়, বাণিজ্য ঘাটতি পরিস্থিতির কিঞ্চিৎ উন্নতি হয়েছে আশির দশকের শেষ প্রান্তে।

এখন বিবেচনার বিষয়, উপরোক্ত কাঠামোগত পরিবর্তন কতটা ৮০–এর দশকে অনুসৃত নীতিমালার অনুবর্তী হয়েছে।

রপ্তানি নীতি

৮০–র দশকে রপ্তানি নীতির (সারণী–১৩) অন্যতম প্রধান উদ্দেশ্য ছিল আমদানি আয় বৃদ্ধির হার অধিককরণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভারসাম্য আনয়ণ। দ্বিতীয় আর একটা লক্ষ্য সাধারনভাবে সব বছরের নীতিতে অন্তর্ভূক্ত ছিল সেটা হলো, রপ্তানি বৃদ্ধির লক্ষ্যে রপ্তানি সুযোগ সুবিধার উন্নয়ন, সরলীকরন ও রপ্তানি পদ্ধতি সহজীকরন। বাণিজ্য নীতির এ দু'টো সাধারন লক্ষ্য ছাড়াও দশকের প্রথমার্ধে যে ক'টা আনুষাঙ্গিক নীতি গ্রহণ করা হয় তার লক্ষ্য ছিল বহির্বিশ্বে, নতুন নতুন বাজার সৃষ্টি, পণ্য সরবরাহ উন্নয়ন ও পণ্য বাজার বহুমুখীকরণ এবং রপ্তানির অবকাঠামো সৃষ্টি। পক্ষান্তরে দশকের দ্বিতীয়ার্ধে যে সব নীতিগুলো অন্যতম প্রধান আনুষাঙ্গিক লক্ষ্য হিসেবে রপ্তানি নীতিতে আসে তাহলো, নতুন নতুন পণ্য রপ্তানি তালিকায় অন্তর্ভূক্তি ও রপ্তানি ভিত্তি সুদৃঢ় ও বহুমুখীকরণ, প্রচলিত পণ্যের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে অধিকতর রপ্তানি উদ্বৃত্ত সৃষ্টি এবং অধিক মূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনকল্পে পশ্চাৎ সংযোগ স্থাপনে উৎসাহ প্রদান।

সারণী - ১৩

রপ্তানি নীতি ১৯৮০-৮৯

	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯
১। আমদানি ব্যয় অপেক্ষা রপ্তানি আয় বৃদ্ধির হার অধিককরণের মাধ্যমে বাণিজ্যিক ভারসাম্য আনয়ন	√			√	√		√	√	√
২। নুতন নুতন পণ্য রপ্তানি তালিকায় অন্তর্ভূক্তি ও রপ্তানি ভিত্তি সুদৃঢ় ও বহুমুখী করণ			√				√	√	√
৩। অধিকমূল্য সংযোজিত পণ্য উৎপাদনকল্পে পশ্চাৎ সংযোগ স্থাপনে উৎসাহ প্রদান							√	√	√
৪। নতুন বাজার সৃষ্টির উদ্যোগ গ্রহণ	√	√						√	√
৫। রপ্তানি সুযোগ-সুবিধার উন্নয়ন সরলীকরণ ও রপ্তানি পদ্ধতি সহজীকরণ	√	√	√	√	√		√	√	√
৬। সম্ভাবনাময় পণ্যের উন্নয়নের জন্য ৪ বৎসর মেয়াদী ক্রাস প্রগ্রাম									
৭। সার্বিক রপ্তানি আয়ে অপ্রচলিত ও পাটজাত দ্রব্য ব্যতীত অন্যান্য শিল্পজাত পণ্য রপ্তানি আয়ের অংশ যথাযথভাবে বৃদ্ধি				√	√				
৮। পণ্য সরবরাহ উন্নয়ন ও পণ্য বাজার বহুমুখীকরণ		√	√	√					
৯। রপ্তানির অবকাঠামো সৃষ্টি		√	√						
১০। প্রচলিত পণ্যের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে অধিকতর রপ্তানি উদ্বৃত্ত সৃষ্টি	√						√	√	√

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত।

আমদানি নীতি

অপরপক্ষে, আমদানি নীতির (সারণী -১৪) লক্ষ্য হিসেবে যেটি প্রায় প্রতি বছরই বাণিজ্য নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত ছিল তাহলো নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা ও কল-কারখানার কাঁচামাল যোগান দেয়া। আরো একটা অতি জোরালোভাবে উচ্চারিত লক্ষ্য যা ১৯৮৩-৮৪ সাল থেকে আমদানি নীতিমালার অন্তর্ভূক্ত হয় তাহলো, আমদানি নীতিকে রপ্তানি উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ। তাছাড়া দেশীয় কারখানার উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার, পণ্যের মানোন্নয়ন এবং আমদানি নিয়ম নীতি সহজ ও নিয়ন্ত্রনমুক্ত করা ইত্যাদি লক্ষ্যও একই সময়ে গৃহীত হয়। স্থানীয় শিল্প সংরক্ষণকল্পে আমদানি নিষেধাজ্ঞা আরোপিত হয়েছে কোন কোন পণ্যের উপর।

সারণী - ১৪

আমদানি নীতি ১৯৮০-৮৯

		১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮	১৯৮৮-৮৯
১।	নিত্য প্রয়োজনীয় পণ্য দ্রব্যের পর্যাপ্ত সরবরাহ নিশ্চিত করা ও কলকারখানার কাঁচামাল যোগান দেয়া	√	√	√	√		√	√	√	√
২।	ও জিএল বা লাইসেন্সের আওতায় আমদানি পণ্যের সংখ্যা বৃদ্ধি	√								
৩।	নতুন আমদানিকারক অন্তর্ভূক্তি	√	√				√	√	√	
৪।	বেসরকারীখাতে সিমেন্ট আমদানি	√								
৫।	ওয়েজ আর্নার স্কীম এবং এজন্য তালিকা সম্প্রসারিত করণ	√	√	√						
৬।	নতুন বিদেশী প্রযুক্তির আমদানি									√
৭।	রপ্তানি মুখী শিল্পস্থাপনের জন্য অর্থ বরাদ্দ	√								
৮।	রপ্তানি কাঁচামালের উদার আমদানি	√								
৯।	স্থানীয় শিল্প সংরক্ষণকল্পে আমদানি নিষেধাজ্ঞা		√	√		√				
১০।	রপ্তানি উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে আমদানি নীতি				√	√	√	√	√	√
১১।	রপ্তানি বৃদ্ধি ও দেশে প্রস্তুত পণ্যের আমদানি হ্রাস			√						
১২।	লাইসেন্স অব্যবহারকারীদের লাইসেন্স বাতিল		√	√						
১৩।	শিল্প ও অন্যান্য উন্নয়ন কর্মসূচীর সহিত আমদানি নীতির সমন্বয় সাধন									√
১৪।	আমদানি কর্মসূচীর জন্য প্রধানত: নগদ অর্থ ও ওয়েজ আর্নার স্কীমের উপর নির্ভরতা					√				
১৫।	বরাদ্দকৃত অর্থের কাঠামো সরকারী/বেসরকারী									
১৬।	দেশীয় কারখানার উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ সদ্ব্যবহার				√	√	√	√	√	√
১৭।	দেশীয় কারখানার দক্ষতা বৃদ্ধি ও পণ্যের মানোন্নয়ন					√	√	√	√	
১৮।	আমদানির নিয়ম পদ্ধতি সহজ ও নিয়ন্ত্রণমুক্ত করা/ উদার আমদানি				√	√	√	√	√	√

উৎস : বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ ১৯৮০-৮১ থেকে ১৯৮৮-৮৯ পর্যন্ত।

আমদানি ও রপ্তানি নীতির লক্ষ্যসমূহ পর্যালোচনা করলে বাংলাদেশের বাণিজ্যনীতির কয়েকটা সাধারণ বৈশিষ্ট্য স্পষ্ট হয়ে উঠে। এক, বাণিজ্য ঘাটতি তথা বাণিজ্যিক ভারসাম্যের উন্নয়নের জন্য কেবল রপ্তানি প্রবৃদ্ধি হার জোরদার করার উপর গুরুত্ব প্রদান করা হয়েছে। আমদানি নীতির কোন লক্ষ্যই দেশের লেনদেন পরিস্থিতির উন্নয়নের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত নয়। অর্থাৎ আমদানি বৃদ্ধি হারের চাইতে রপ্তানি বৃদ্ধি হার জোরদার হলে বাণিজ্যিক ভারসাম্যের উপর অনুকুল প্রভাব পড়বে এটাই ধরে নেয়া হয়েছে। তা সত্বেও বাণিজ্য ঘাটতির কিছুটা উন্নতি পরিলক্ষিত হয়েছে গত চার বছরে এবং সেটা অর্জিত হয়েছে রপ্তানি বৃদ্ধি হার দ্রুততর এবং আমদানি বৃদ্ধি হার শ্লথতর হওয়ার মাধ্যমে। জাতীয় আয়ের অংশ হিসেবে বাণিজ্য ঘাটতির হার কিছুটা হ্রাসের দ্বারা উক্ত প্রবনতা সুস্পষ্ট (সারণী -১৫)। এই আমদানি বৃদ্ধি হার শ্লথতর হওয়া ঘোষিত বাণিজ্য নীতির বহির্ভূত কোন নীতি, বিশেষত মুদ্রার অবমূল্যায়ন নীতির ফল।

সারণী- ১৫

বাণিজ্য ঘাটতি জিডিপি অনুপাত

	১৯৮০-৮১	১৯৮১-৮২	১৯৮২-৮৩	১৯৮৩-৮৪	১৯৮৪-৮৫	১৯৮৫-৮৬	১৯৮৬-৮৭	১৯৮৭-৮৮
বাণিজ্য ঘাটতি/ জিডিপি	৯	৯	৯	৯	১০	৮	৬	৯

উৎস : বাণিজ্য বিভাগ, বাংলাদেশ পরিসংখ্যান ব্যুরো।

দুই, আমদানি নীতিকে রপ্তানি উন্নয়নের হাতিয়ার হিসেবে গ্রহণ করা হয়েছে। রপ্তানিমুখী শিল্পের জন্য কাঁচামাল ও যন্ত্রাংশ আমদানির প্রভাব আমদানি কাঠামোয় সুস্পষ্ট। এমতাবস্থায় আমদানি নীতি পরোক্ষভাবে হলেও রপ্তানি উন্নয়নে অবদান রেখে বাণিজ্য ঘাটতি সীমিতকরনে সহায়তা করেছে।

তিন, স্থানীয়, শিল্পের সংরক্ষণকল্পে আমদানি নিষেধাজ্ঞা, দেশীয় কারখানার উৎপাদন ক্ষমতার পূর্ণ ব্যবহার, দেশীয় কারখানা কর্তৃক উৎপাদিত পণ্যের মানোন্নয়ন ইত্যাদি লক্ষ্যসমূহ আমদানি নীতিতে যে দেশীয় শিল্পের পরিপোষণের পরিচায়ক তাতে সন্দেহ নেই। কিন্তু বাস্তবে এ সব নীতির বাস্তবায়ন ফলপ্রসূভাবে হয়নি বিধায় ঐতিহ্যবাহী তাঁত শিল্প ও বস্ত্র শিল্প বিদেশী পণ্যের প্রতিযোগিতায় মারাত্মক হুমকি ও বিপর্যয়ের সম্মুখীন। ৮০-র দশকের শেষার্ধে শিল্পোৎপাদন পরিস্থিতির অবনতি এর প্রমান। * আমদানি কাঠামোতে মূলধনী যন্ত্রপাতির প্রভাব হ্রাস এবং ভোগ্যপণ্যের উত্তরোত্তর বর্ধিত প্রভাব তাই ৮০-র দশকে অনুসৃত আমদানি নীতির অনুবর্তী নয়।

* বিশ্বব্যাংক : বাংলাদেশ রিসেন্ট ইকনমিক ডেভেলপমেন্টস এণ্ড সর্টটার্ম প্রসপেক্টস, মার্চ ১৩, ১৯৮৯।

চার, রপ্তানি কাঠামোতে অপ্রচলিত রপ্তানি পণ্যের প্রভাব বৃদ্ধি রপ্তানি নীতির অনুবর্তীর পরিচায়ক। তবে প্রচলিত পণ্যের সার্বিক উন্নয়নের মাধ্যমে রপ্তানি উদ্বৃত্ত সৃষ্টি সংক্রান্ত রপ্তানি নীতির লক্ষ্য বাস্তবায়িত হয়নি যা রপ্তানি কাঠামোয় সুস্পষ্ট।

পাঁচ, গত দশকে রপ্তানি কাঠামোয় অপ্রচলিত পণ্যের অবদান বৃদ্ধি ও অপ্রচলিত পণ্যের সংখ্যাবৃদ্ধির ব্যাপারটি রপ্তানি লক্ষ্যের অনুবর্তী। তবে রপ্তানি কাঠামোতে অপ্রচলিত পণ্যের প্রাধান্য বৃদ্ধি মূলত ঃ পোশাক শিল্পের একক প্রাধান্যের কারণে। পোশাক শিল্প ও হিমায়িত খাদ্য বাদে অপ্রচলিত অন্যান্য পণ্যের প্রভাব রপ্তানি কাঠামোতে দশকের প্রথমার্ধের তুলনায় দ্বিতীয়ার্ধে ম্রিয়মান (সারণী–৭)।

ছয়, আমদানি ও রপ্তানি উভয় ক্ষেত্রেই বেসরকারী খাতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠা সরকারের পর্যায়ক্রমে মুক্ত বাণিজ্যনীতি অনুসরণের ফলশ্রুতি। এ নীতি রপ্তানি উন্নয়নের ক্ষেত্রে যথেষ্ট সহায়ক হয়েছে।

৩. *দক্ষতা বিবেচনায় বাংলাদেশের আন্তর্জাতিক বাণিজ্যের অগ্রগতি*

আন্তর্জাতিক বাণিজ্যে বাংলাদেশের দক্ষতার প্রশ্নটি তার বাণিজ্য ঘাটতি পরিস্থিতির উন্নয়ন এবং এ প্রক্রিয়ায় দেশের বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমিয়ে আনার সাথে যেমন জড়িত তেমনি আমদানি রপ্তানির মাধ্যমে দেশের জন্য শিল্পায়ন সহায়ক বাণিজ্য নীতির সাথে সম্পর্কিত। এ পর্যায়ে বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতি বাণিজ্য–ঘাটতি নিরসনের মাধ্যমে কতটা বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা কমানোর পথে অবদান রাখতে পেরেছে সেটা যেমন বিবেচ্য, তেমনি তা প্রকৃতপক্ষে দেশের শিল্পায়ন প্রক্রিয়ায় কতটা অবদান রাখতে পেরেছে সেটাও মূল্যায়ন করে দেখার ব্যাপার।

ইতোপূর্বে আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতি বাণিজ্য ঘাটতি পরিস্থিতির মৌলিক কোন উন্নতি সাধন করতে পারেনি। এক্ষেত্রে যেটা হয়েছে তা হলো বাণিজ্যিক ভারসাম্যের উত্তরোত্তর নাজুকতার গতি কিছুটা স্তিমিত হয়েছে। ফলে বৈদেশিক সাহায্য নির্ভরতা হ্রাস পায়নি। মাথাপিছু বৈদেশিক সাহায্য বৃদ্ধির হার থেকে তা স্পষ্ট (সারণী–১৬ দ্রষ্টব্য)।

বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতিতে দেশীয় শিল্পের বিকাশের কথা বলা হলেও বাস্তবে তা কার্যকরী হয়নি গত দশকে। ৭০–এর দশকের তুলনায় ৮০–র দশকের গড় শিল্পোৎপাদন প্রবৃদ্ধি হার হ্রাস পেয়েছে। ৮০–র দশকের শেষ পাদে ম্যানুফ্যাকচারিং শিল্পের উৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হার ঋণাত্মক। (সারণী–১৭ দ্রষ্টব্য)।

ঐতিহ্যবাহী পাট শিল্পের সম্ভাবনা অপসৃয়মান। বয়ন শিল্পের অবস্থাও তথৈবচ। ৭ লক্ষ ২ হাজারের মধ্যে এ শিল্পের ৭৫% তাঁত অচল বর্তমানে। *

উপরোক্ত বিশ্লেষণে এটাই দাঁড়ায় যে, দক্ষতা বিবেচনায় বাংলাদেশের বাণিজ্যনীতি তেমন একটা ফলপ্রসূ বলে বিবেচিত নয়, না বাণিজ্যিক ভারসাম্য উন্নয়নে, না শিল্পায়ন প্রচেষ্টায়।

* সম্পাদকীয়, *বাংলাদেশ অবজার্ভার*, ৬ই এপ্রিল, ১৯৯০।

সারণী – ১৬

বৈদেশিক ঋণ পরিস্থিতি

বছর	বকেয়া ঋণ (মিলিয়ন ডলার)	জনপ্রতি বকেয়া ঋণ (ডলার)
১৯৮৫	৫৯৭৮	৬০·২৬
১৯৮৬	৭২৯২	৭১·৫০
১৯৮৭	৮৮৫১	৮৫·০২
১৯৮৮	৯৫৬৪	৮৯·৭১

উৎস ঃ বিশ্বব্যাংক : বাংলাদেশ রিসেন্ট ইকনমিক ডেভেলপমেন্টস এণ্ড শর্ট টার্ম প্রসপেকটস, মার্চ ১৩, ১৯৮৯।

সারণী–১৭

খাতওয়ারী জিডিপি-র প্রবৃদ্ধি (১৯৭৩-৮৮)

(বার্ষিক প্রবৃদ্ধির হার, ১৯৭৩–এর স্থিরমূল্যে)

						জিডিপির অংশ হিসেবে	
	১৯৭৩–৮০	১৯৮১–৮৬	১৯৮৫–৮৬	১৯৮৬–৮৭	১৯৮৭–৮৮	১৯৮০–৮১	১৯৮৭–৮৮
কৃষি	৩·৫	২·৯	৪·০	০·১	–১·১	৪৮·৭	৪৩·৪
ম্যানুফ্যাকচারিং	১৩·৯	৩·০	১·৮	৬·৪	–০·৭	১০·১	৯·৮
নির্মাণ ও উপযোগ	৭·৪	৯·৮	৩·০	৮·৬	১৪·৩	৪·৩	৬·৬
সেবা	৭·৬	৫·১	৬·৬	৭·৪	৩·৭	৩৬·৪	৪০·২

উৎস্য ঃ বিশ্বব্যাংক ঃ বাংলাদেশ রিসেন্ট ইকনমিক ডেভেলপমেন্টস্ এণ্ড শর্ট টার্ম প্রসপেক্টস্, মার্চ ১৩, ১৯৮৯।

উপসংহার

বাংলাদেশের বাণিজ্যিক খাত অর্থনীতির সামগ্রিক বিকাশ প্রক্রিয়ায় তার নিজস্ব অবস্থান ধরে রাখতে পারেনি। অভ্যন্তরীণ জাতীয় উৎপাদনের নীরিখে আমাদানি ও রপ্তানির অনুপাত হ্রাসের মধ্য দিয়ে এ সত্য প্রতিভাত। তাই আমদানির চাইতে রপ্তানির প্রবৃদ্ধি হার জোরদার–এরূপ কথা বলে আত্মতুষ্টি লাভের কোন অবকাশ নেই। তবে যেভাবেই হোক বাণিজ্য ঘাটতির প্রবৃদ্ধি হার শ্লথতর হয়ে আসা বাংলাদেশের অর্থনীতির জন্য একটা তাৎপর্যবহ অবস্থা নির্দেশ করে। এটা কতটা সুনির্দিষ্ট নীতি গ্রহণ ও তার বাস্তবায়নের ফলশ্রুতি–সে ব্যাপারে জোর করে কিছু বলা না গেলেও অন্ততঃ এতটুকু বলা যায় যে, বাংলাদেশের অর্থনৈতিক স্বাস্থ্য খুব একটা সুখকর নয়।

বাংলাদেশের আমদানি ও রাপ্তানি কাঠামোয় পরিবর্তন এসেছে। রপ্তানি কাঠামোর অপ্রচলিত পণ্যের অবদান বৃদ্ধি পেয়েছে এবং সেটা মূলতঃ বিদেশী কোটা ও ১০০% কাঁচামাল ও মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি–নির্ভর। ফলে এতে মূল্য সংযোজন যৎসামান্য। আমদানি কাঠামোয় ভোগ্যপণ্যের প্রাধান্য সুস্পষ্ট, মূলধনী যন্ত্রপাতি আমদানি হ্রাস পেয়েছে আমদানির বিকল্প শিল্প প্রতিষ্ঠা ছাড়াই। অপরদিকে শিল্পোৎপাদনের প্রবৃদ্ধি হার শ্লথতর এবং দশকের শেষের দিকে ঋণাত্মক। সার্বিক বিবেচনায় বাংলাদেশের বাণিজ্য নীতি কেবলমাত্র রপ্তানি হার বৃদ্ধি ছাড়া অর্থনীতির সামগ্রিক বিকাশে তেমন কোন ফলপ্রসূ ভূমিকা রাখতে পারেনি।

গ্রন্থ নির্দেশিকা

১। বিশ্বব্যাংক ঃ *বাংলাদেশ রিসেন্ট ইকনমিক ডেভেলপমেন্টস্ এণ্ড শর্ট টার্ম প্রস্‌পেক্টস,* মার্চ ১৩, ১৯৮৯, এশিয়া কান্ট্রি ডিপার্টমেন্ট-১।

২। *বাংলাদেশ অর্থনৈতিক জরীপ,* ১৯৮৮-৮৯, অর্থ মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার।

৩। এ, রব ঃ "এক্সপোর্ট পারফরমেন্স এণ্ড প্রসপেক্টস্ এণ্ড গভর্ণমেন্ট পলিসি টু প্রমোট এক্সপোর্টস ইন বাংলাদেশ" শীর্ষক প্রবন্ধ, বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকনমি ১৯৮৮-তে প্রকাশিত।

৪। এ, আর, ভূঁইয়া ঃ *"এন এক্সপোর্ট পলিসি ফর বাংলাদেশ"* শীর্ষক প্রবন্ধ, বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকনমি-১৯৮৮-তে প্রকাশিত।

৫। রিচার্ড ডি, ম্যালন ঃ *"ইমপোর্ট প্রবলেমস্ এণ্ড পলিসি ফর বাংলাদেশ"* শীর্ষক প্রবন্ধ, বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকনমি-১৯৮৮ -তে প্রকাশিত।

৬। আবুল কালাম আজাদ ঃ *"সেকটরাল লিংকেজ, ডেভেলপমেন্ট ষ্ট্রেটেজি এণ্ড ট্রেড প্যার্টান অব বাংলাদেশ"* শীর্ষক প্রবন্ধ, বাংলাদেশ জার্নাল অব পলিটিক্যাল ইকনমি ১৯৮৮-তে প্রকাশিত।

পুস্তক সমালোচনা

প্রশাসনের অন্দরমহল বাংলাদেশ। মুনতাসীর মামুন, জয়ন্ত কুমার রায়।
প্রথম বাংলাদেশী সংস্করন। ঢাকা ঃ পল্লব পাবলিশার্স, ১৯৮৮।
মূল্য ঃ একশ পঞ্চাশ টাকা। পৃ ঃ ২৯৯ ।

বাংলাদেশের লোক প্রশাসনের অন্দরমহলের খবর তাঁরাই দিতে পারেন যারা অন্দরমহলে বাস করেন অর্থাৎ সরকারী কর্মকর্তাগণ। অন্দর মহলের বাইরে অবস্থানকারী গবেষক, শিক্ষক, ছাত্র, পর্যবেক্ষক, নিরীক্ষকগণ কেবল অন্দরমহলীদের সংগে কথাবার্তা বলে, তাঁদের লেখা বই পড়ে, তাঁদের প্রশ্নোত্তর নিয়ে বড়জোর ক্ষেত্র বিশেষে দু'চার দিন তাঁদের দপ্তরে নিত্যনৈমিত্তিক কাজ পর্যবেক্ষণ করে লোক প্রশাসন সম্বন্ধে যে ধারণা লাভ করেন, তার ভিত্তিতেই লোক প্রশাসন সম্বন্ধে বই-পুস্তক রচনা করেন। আলোচ্য বইটি এদিক থেকে সম্পূর্ণ ভিন্নধর্মী, বলতে গেলে নতুন পথের প্রদর্শক। যে পথে লেখকদ্বয় তাঁদের তথ্য সংগ্রহ করেছেন-তাকে তাঁরা নামকরণ করেছেন 'নকশা'। বাছাইকৃত কর্মকর্তা কর্তৃক বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাকে তাঁরা 'নকশা' বলে চিহ্নিত করেছেন। ১৯৪৭-১৯৮৫ কাল সীমায় বাংলাদেশের চল্লিশজন উচ্চপদস্থ আমলা কর্তৃক প্রদত্ত 'নকশার' ভিত্তিতে রচিত হয়েছে 'প্রশাসনের অন্দরমহল'।

পুস্তকটির আদর্শ জয়ন্ত কুমার রায়ের একটি গ্রন্থ ''অ্যাডমিনিস্ট্রেটরস ইন এ মিক্সড পলিটি'' (দিল্লী, ম্যাকমিলান, ১৯৮১)। ঐ গ্রন্থে ষাটজন প্রশাসকের অভিজ্ঞতার ভিত্তিতে ভারতীয় শাসন ব্যবস্থায় প্রশাসকদের অবস্থান নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। পরবর্তীতে একই পন্থায় জয়ন্ত রায় ও মুনতাসীর মামুন বাংলাদেশের লোক প্রশাসনের উপর আলোচ্য গ্রন্থটি রচনা করেন যার বাংলাদেশী সংস্করণ এক বছর পরে প্রকাশিত হয়।

বইটি সম্বন্ধে প্রথম প্রশ্ন, কোন্ ভিত্তিতে চল্লিশজন প্রশাসক নির্বাচিত হলেন? উত্তরে লেখকদ্বয় বলেন, ''অবসর গ্রহণের পর যখন কোন প্রশাসক তাঁর স্মৃতিকথায় বিভিন্ন স্থান, ঘটনা, তারিখের উল্লেখ করেন, সাধারণতঃ তা নির্ভরযোগ্য বলেই ধরে নেওয়া হয়। বর্তমান নকশাগুলোর বেলায়ও এ কথা প্রযোজ্য''। পাঠক হিসাবে আমার মনে হয়েছে, যুক্তি হিসাবে এটি দুর্বল। অবসর গ্রহণ করে চাকরি জীবনের অভিজ্ঞতা বর্ণনায় সত্যনিষ্ঠ হবেন, এটুকু আশা করতে কোন দোষ নাই, তবে বর্ণনাকারী যে নিজকে একটু বেশী গুরুত্ব দেন না, কোন কর্তৃত্বের দাবী বেশী করেন না, অথবা তুলনামূলকভাবে অন্যান্য সংশ্লিষ্ট কর্মকর্তাদের ভূমিকার হেরফের করেন না এ নিশ্চয়তা কে দেবে? প্রথমতঃ চল্লিশজনের নির্বাচনেই লেখকদ্বয়ের পক্ষপাতিত্ব যে ছিল না তাও বলা যায় না। অপর যে কোন তুলনীয় চল্লিশজন কর্মকর্তার নকশা আলোচ্য নকশা থেকে মৌলিকভাবে আলাদা চিত্র তুলে ধরতে পারে। মূলতঃ লেখকদ্বয় মাত্র ছ'জন কর্মকর্তার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেন যাঁদের তাঁরা ঘনিষ্ঠভাবে চিনতেন, লক্ষ্য করেছেন তাঁদের কাজকর্ম এবং সব মিলে এঁদের মনে হয়েছে তারা

সম্পূর্ণভাবে নির্ভরযোগ্য। এ ছ'জন আবার তাঁদের আরো কয়েকজন অবসরপ্রাপ্ত সহকর্মীর নাম উল্লেখ করে সাক্ষাতের সুযোগ করে দিয়েছেন যাঁরা তাঁদের মধ্যে আরো নির্ভরযোগ্য এভাবে গবেষকদ্বয় ক্রমান্বয়ে চল্লিশজনের সংস্পর্শে এসেছেন এবং পরস্পর পরস্পরের আস্থা অর্জন করেছেন। অতএব প্রথম ছ'জন সরাসরি সূত্র, পরের চৌত্রিশ জন পরোক্ষ। সূত্র নকশার গ্রহণযোগ্যতা তাই প্রশ্নাতীত নয়। প্রদত্ত নকশাগুলোর সত্যতা যাচাই করার জন্য আরো অন্ততঃ চল্লিশজন কর্মকর্তা (যারা মোটামুটি ভাবে সমসাময়িক এবং বর্ণিত ঘটনার সংগে সরাসরি/পরোক্ষভাবে জড়িত)-কে একই প্রশ্ন করে তাঁদের উত্তরের পরিপ্রেক্ষিতে নকশাগুলোর গ্রহণযোগ্যতা আরোও বাড়ান যেতো। তথাপি পথিকৃত হিসাবে আমরা নকশাগুলোকে প্রাথমিকভাবে বিবেচনা করতে পারি।

শুরুতেই আশি পৃষ্ঠা , অর্থাৎ পুস্তকের প্রায় এক তৃতীয়াংশব্যাপী একটি ভূমিকা দেওয়া হয়েছে যা অত্যন্ত উপযোগী প্রেক্ষিত রচনা করেছে। একাশি পৃষ্ঠা হতে একশ একাশি পর্যন্ত তৎকালীন পূর্ব পাকিস্তানে পার্লামেন্টারী শাসন ও সামরিক শাসন আমলে আমলাদের অবস্থান নকশার আকারে বর্ণিত হয়েছে। বাংলাদেশের স্বাধীনতার পর অর্থাৎ ১৯৭১-১৯৮৫ এই পনের বৎসরের আমলাতন্ত্রের অভ্যন্তরে কি হচ্ছে তার একটি চমৎকার বর্ণনা দেওয়া হয়েছে। কিছু উদাহরণ দিলে পুস্তকটির বক্তব্য আরো স্পষ্ট হবে। নকশা ঃ ১২১ ঃ প্রধান মন্ত্রী হিসাবে শেখ মুজিব চট্টগ্রাম সফরে এসেছেন। 'ক'-তখন চট্টগ্রামের ডি সি। কথা ছিল, পঞ্চাশজন সহযাত্রী সহ প্রধানমন্ত্রী সার্কিট হাউসে দুপুরে খাবেন। ডি সি দেখলেন, সফরসংগীদের সংখ্যা প্রায় আড়াইশো। ডি সি মহাচিন্তায় পড়লেন, তবে তিনি শেষ পর্যন্ত সকল সংগীর খাবার বন্দোবস্ত করলেন। ক্ষমতাসীন দলের স্থানীয় নেতাদের সংগে 'ক' -এর কথাবার্তায় সমসাময়িক রাজনৈতিক-আমলাতান্ত্রিক সম্পর্ক ফুটে উঠেছে।

নকশা ঃ ২১৯ ঃ জিয়াউর রহমান তখন প্রেসিডেন্ট। 'ক' একটি মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী। 'খ' সে মন্ত্রণালয়ের একটি কর্পোরেশনের মহাব্যবস্থাপক। কর্পোরেশনের জন্য কিছু বাহন কেনা দরকার। মন্ত্রী চান '১০১' ধরনের বাহন নিতে। কারণ, তাহলে দশ লক্ষ টাকা পাবেন তিনি কমিশন হিসাবে। 'খ' চান না ঐ ধরনের বাহন কিনতে। কারণ, তা'হলে দেশের আর্থিক ক্ষতি হবে। 'ক' প্রেসিডেন্টকে পরামর্শ দিলেন ১০১ ধরনের বাহন কিনতে।........এ ধরনের নকশা থেকে প্রেসিডেন্ট, মন্ত্রী, সচিব, মহাপরিচালক প্রমুখের পারস্পরিক সম্পর্ক সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্ট হয়।

নকশা ঃ ২২৯ ঃ আশির দশকে 'ক' ছিলেন পল্লী উন্নয়ন কর্মসূচীর একজন পদস্থ কর্মকর্তা। ঐ সময় গ্রামীণ গরীবদের সহায়তাদানের জন্য তিনি একটি পরিকল্পনা প্রণয়ন করেন। পরিকল্পনায় তিনি যুক্তি দেন, সরকার অবশ্যই গ্রামীণ ধনীদের জন্য কিছু ব্যবস্থা নিতে পারেন। কিন্তু গরীবদের সাহায্য করার অজুহাতে গ্রামীণ ধনীদের আরো ধনী করে তোলার কোন মানে হয় না। সুতরাং এমন ব্যবস্থা নেয়া হোক যাতে গরীবরা উপকৃত হয়। কিন্তু তাঁর প্রস্তাবসমূহ বিশ্বব্যাংক, তার সহকর্মী বন্ধুরা সবাই প্রত্যাখ্যান করল।.........এ ধরনের নকশা থেকে বাংলাদেশে উন্নয়ন প্রশাসনের নামে বিভিন্ন প্রকল্প বাস্তবায়ন সম্বন্ধে কিছু ''অন্দরমহলী'' অবস্থার আভাষ পাওয়া যায়। সংখ্যা বাড়িয়ে লাভ নেই। মোটামুটিভাবে নকশাগুলো বেশ সুলিখিত। এ গুলো না পেলে লোক প্রশাসনের অনেক খবরই আমাদের জানা হতো না। এখনও অনেক জানা বাকী,

তথাপি একটি নতুন পথের দিগন্ত উন্মোচিত করেছেন লেখকদ্বয়। তাঁরা কৃতিত্বের দাবীদার। অবশ্য সাথে সাথে মনে রাখতে হবে যদি তাঁদের বর্ণনা নির্ভুল হয়। কেননা তাঁদের নির্ভর করতে হয়েছে বর্ণনাকারীর বর্ণনার সত্যতাকে ধরে নেওয়ার উপরে।

আমরা আশা করব মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত রায়ের পথ ধরে আরো গবেষক এগিয়ে আসবেন এবং সংগৃহীত তথ্যের সত্যতা যাচাই-এর নব নব পন্থা উদ্ভাবন করবেন ও লোক প্রশাসনের গভীরতর বিশ্লেষণ উপস্থাপিত করবেন। বিশেষ করে যারা প্রশাসনের সংগে নীতিনির্ধারণে সম্পৃক্ত তাঁরা অর্থাৎ উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাগণ যদি তাঁদের অভিজ্ঞতাকে পুস্তক আকারে প্রকাশ করেন, তাহলে প্রশাসক যেমন উপকৃত হবেন অভিজ্ঞতার রিনিময়ে, তেমনি মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত রায়ের প্রদর্শিত নতুন তথ্য সংগ্রহ পন্থার মূল্যায়নের সুযোগ পাওয়া যাবে। বস্তুতঃ বর্তমানে এই পুস্তকের সংগে তুলনা করা যায়–এমন কোন বই বাজারে নাই। লেখকদ্বয় আশা ব্যক্ত করেছেন, "..... এ ধরনের সিদ্ধান্ত যা এই গবেষণার নকশাগুলোর ভিত্তি তা তুলে ধরে সাধারণ প্রশাসন, উন্নয়ন প্রশাসন সংকটকালে প্রশাসনিক ব্যবস্থায় এবং বেসামরিক প্রশাসনে সামরিক বাহিনীর হস্তক্ষেপের দরুণ যে অবস্থার সৃষ্টি হয় তাতে একজন আমলার সীমাবদ্ধতা ও কর্মদক্ষতা এসব সিদ্ধান্তের পর্যালোচনা, পাবলিক পলিসি এবং প্রশাসনিক ব্যাপারে অ্যাকাডেমিকদের ধারণা হয়তো আরো স্পষ্ট করবে। বাংলাদেশে ভবিষ্যতে যাঁরা সিভিল সার্ভিসে আসবেন তাদেরও এসব পর্যালোচনা সাহায্য করবে জনস্বার্থ রক্ষা ও পেশাগত দক্ষতা বৃদ্ধিতে। শেষোক্ত কারণে যদি এ গ্রন্থ সামান্য ভূমিকা পালন করতে পারে তাহলেই আমরা মনে করব আমাদের শ্রম সার্থক..........."(পৃ ঃ ৫)। আমার মনে হয় এখানেই গ্রন্থটির সার্থকতা, লেখকদ্বয় যে কাজ শুরু করেছেন তাকে আরো সম্মৃদ্ধ করা প্রয়োজন। কারণ প্রশাসনের অন্দরমহলে অনেকেই প্রবেশ করতে পারবেন না তাঁদের জন্য এ ধরনের নকশা, প্রশাসকদের আত্মজীবনী, স্মৃতিকথা, অপ্রকাশিত চিঠিপত্র প্রভৃতির প্রকাশই অন্দর মহলে অন্ততঃ উঁকি দেয়ার সুযোগ লাভের এক বিকল্প।

আরো কিছু কৃতিত্বের দাবীদার এই লেখকদ্বয়। তাঁদের লেখাতেই আমরা প্রশাসনের একটি পূর্ণ–দীর্ঘ চিত্র পাচ্ছি। স্বার্থপরতা ও পরার্থপরতা উভয় চিত্রই তুলে ধরা হয়েছে, তাতে লেখকদ্বয়ের পক্ষপাতিত্ব অপসারিত হয়েছে। এই পুস্তকে আমরা পাচ্ছি একজন আমলা জনস্বার্থ ও পেশাগত দক্ষতার উদাহরণ দেখিয়েছেন সাহস ও আন্তরিকতার সাথে। অলোচ্য বইটিতে বিভিন্ন নকশায় আমরা দেখেছি কি ভাবে প্রতিকূল অবস্থায় ব্যক্তি নেতৃত্ব দিতে পারে। সংবেদনশীল মন দিয়ে জনসাধারণের দুর্ভোগ মোচনে সহায়তা করতে পারে। অন্য দিকে আমরা দেখেছি অনেক আমলা নিজেরাই স্বীকার করেছেন, দেশের বর্তমান অবস্থার জন্য তাঁরাই দায়ী (পৃঃ ২৯১)। গ্রন্থকারদ্বয়ের কোন কোন মন্তব্য অতিরঞ্জিত মনে হতে পারে। যেমন, "বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের স্বপ্ন গুড়িয়ে যাওয়ার পেছনে আছে অনেক কারণ। এর মধ্যে অন্যতম হচ্ছে শাসন ব্যবস্থায় সামরিক বেসামরিক আমলাতন্ত্রের আধিপত্য।.........সাধারণ মানুষ.........রুখে দাঁড়িয়েছেন আমলা আধিপত্যের বিরুদ্ধে।..........(প্রথম পাতা, দ্বিতীয় অনুচ্ছেদ)। রাজনৈতিকভাবে বাংলাদেশের সাধারণ মানুষের স্বপ্ন অনেক খানি ভেংগে গেছে–একথা সত্য। তবে

LIBRARY
Bangladesh Public Administration
Training Centre
Savar, Dhaka

সাধারণ মানুষ আমলা আধিপত্যের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়িয়েছেন, এ কথা কতখানি সত্য একটু পুনর্বিবেচনার অপেক্ষা রাখে। কারণ, সাধারণ মানুষের এ ধরনের সচেতনতার সুযোগ কোথায়? সাধারণ মানুষ ও প্রশাসন একসাথে কাজ করে পরস্পর পরস্পরের প্রতি আস্থাভাজন হবেন–এটাই সংগত প্রত্যাশা। মুনতাসীর মামুন ও জয়ন্ত রায় তাঁদের গবেষণার 'নকশা' গুলোর মাধ্যমে সেই প্রত্যাশাটিকে যেন প্রবল করে তুলেছেন।

—মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান

বিপিএটিসি : প্রকাশা : ৪২/৯০ (৭২৫)

লেখক পরিচিতি

এম, সি, বর্ম্মন ঃ বর্তমানে কক্সবাজারের জেলা প্রশাসক। ইতিপূর্বে ভূমি আপীল বোর্ডের সচিব পদে নিয়োজিত থাকা কালীন সাভারস্থ বাংলাদেশ লোক প্রশাসন প্রশিক্ষণ কেন্দ্রে (বিপিএটিসি) অনুষ্ঠিত দশম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সে প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে অংশ গ্রহণ করেন। লেখক সে সময় এই প্রবন্ধটি রচনা করেন ও উক্ত কোর্সের সেমিনারে তা উপস্থাপন করেন। তিনি মূলতঃ বাংলাদেশ সিভিল সার্ভিসের (প্রশাসন ক্যাডার) একজন সদস্য।

মোঃ বদিউজ্জামান ঃ স্থানীয় সরকার বিভাগের উপ-সচিব (পৌর সভা) হিসেবে কর্মরত। বিপিএটিসি-তে অনুষ্ঠিত সপ্তম উচ্চতর প্রশাসন ও উন্নয়ন কোর্সে অংশগ্রহণকালীন সময়ে প্রনীত সেমিনার পেপারটি সংক্ষিপ্তাকারে এই সংখ্যায় প্রকাশিত হলো। প্রশিক্ষণ কোর্সে অংশগ্রহণকালীন সময়ে লেখক রেলওয়ে বিভাগে কর্মরত ছিলেন। তিনি মূলতঃ বিসিএস (প্রশাসন) ক্যাডারের সদস্য।

মোহাম্মদ ইয়াহ্ইয়া আখতার ঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে রাজনীতি বিজ্ঞান বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত।

মুহাম্মদ সফিউর রহমান ঃ বিপিএটিসি-তে সদস্য, পরিচালন পর্ষদ হিসেবে কর্মরত। লেখক ন্যাশনাল ইনষ্টিটিউট অব পাবলিক এডমিনিষ্ট্রেশন (নিপা)- এ সিনিয়র ইনস্ট্রাক্টর ও বিপিএটিসি-তে পরিচালক হিসেবে ইতিপূর্বে কাজ করেছেন।

সিরাজুল ইসলাম ঃ বিপিএটিসি-তে ব্যবস্থাপনা অনুবিভাগের উপ-পরিচালক হিসেবে কর্মরত।

এস. এম. আলী আব্বাস ঃ বর্তমানে বিপিএটিসি-তে উন্নয়ন অর্থনীতি বিভাগে সহকারী পরিচালক হিসেবে কর্মরত। তার বেশ কিছু গবেষণামূলক নিবন্ধ বিভিন্ন জাতীয় সাময়িকীতে প্রকাশিত হয়েছে।

ডঃ মোহাম্মদ আনিসুজ্জামান ঃ বিপিএটিসি-তে সদস্য, পরিচালন পর্ষদ হিসেবে প্রেষণে নিয়োজিত। তিনি মূলতঃ চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের লোক প্রশাসন বিভাগের অধ্যাপক। লেখকের একাধিক বই ও আন্তর্জাতিক সাময়িকীতে বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে।

লেখকের জ্ঞাতব্য

প্রশাসন সমীক্ষায় প্রশাসন এবং উন্নয়ন প্রশাসন সম্বন্ধে জ্ঞান ও দক্ষতা বৃদ্ধির লক্ষ্যে মৌলিক নিবন্ধ, গবেষণা টীকা ও পুস্তক সমালোচনা মুদ্রিত হয়। এতদুদ্দেশ্যে সংশ্লিষ্ট লেখককে পাণ্ডুলিপির ৪ প্রস্থ অনুলিপি সম্পাদকের নিকট জমা দিতে হবে। লেখা $১১\frac{১}{২}' \times ৮\frac{১}{২}'$ আকারের কাগজে যথাক্রমে ৪০, ২০ ও ১০ পৃষ্ঠার বেশী হওয়া বাঞ্ছনীয় নয়। লেখা কাগজের এক পৃষ্ঠায় নির্ভুলভাবে মুদ্রাক্ষরিত হতে হবে। প্রাসঙ্গিক সূত্রসমূহ প্রবন্ধের শেষে পাদটীকা ও প্রয়োজনে গ্রন্থপঞ্জী হিসেবে উল্লিখিত থাকতে হবে।

লেখা অবশ্য অপ্রকাশিত হতে হবে।